

Bengali
1999



মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

* Branch Ashrams *

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 33208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009
U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road,
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel: 416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ — ৩

জানুয়ারী, ১৯৯৯

সংখ্যা — ১



সম্পাদক মণ্ডল

- ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
- স্বামী নির্মলানন্দ
- ড: শুকদেব সিংহ
- ড: বীথিকা মুখার্জী
- কুমারী চিত্রা ঘোষ
- কুমারী গীতা ব্যানার্জী
- ব্রহ্মচারিণী গুণীতা

কার্য্যকারী সম্পাদক

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী



বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা

বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

- ★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতি ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয়।
- ★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।
- ★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যিক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।
- ★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম :
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c
- ★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—

Managing Editor,
Ma Anandamayee—Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221001



পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম :-

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা—২০০০/- বাৎসরিক।

অর্ধেক পৃষ্ঠা --- ১০০০-বাৎসরিক।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক-শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচী পত্র

১.	মাতৃ বাণী	...		১
২.	শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	...	শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	৩
৩.	মা আনন্দময়ী	...	ম০ ম০ স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী	৭
৪.	মা ছেলেকে কখন ধরেন	...	মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ	৯
৫.	শেষ প্রণাম	...	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	১১
৬.	সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী	...	ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী	১৬
৭.	শ্রীমুখে শ্রীশ্রী মায়ের জীবন	...	শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত	২০
৮.	ড০ ত্রিগুণা সেনের চিঠি	...		২৩
৯.	শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম	...	সঞ্চিতা সেনগুপ্ত	২৪
১০.	আমার মা আনন্দময়ী	...	“বিশুদ্ধা”	২৫
১১.	শ্রীশ্রী মায়ের দাক্ষিণাত্য যাত্রা	...	শ্রী শিবানন্দ	২৮
১২.	আশা	...	শ্রীমতী মীরা রুদ্র	৩২
১৩.	ছেলেধরা মা	...	জনৈক সন্তান	৩৩
১৪.	সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীশ্রী মা	...	জয়া ভট্টাচার্য্য	৩৬
১৫.	আশ্রম সংবাদ	...		৩৮



বিশেষ সূচনা

সকল গ্রাহকদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে বর্তমান সংখ্যা ১৯৯৯ সনের প্রথম সংখ্যা। তাই যাঁরা বর্তমান বছরের চাঁদা পাঠান নি তাঁরা অবিলম্বে যেন তাঁদের চাঁদা পাঠিয়ে দেন। চাঁদার টাকা মনিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট দ্বারা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে কারণ চেক ব্যাঙ্কে জমা হতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং অন্তত: ২০/- ক্ষতি হয়।

পত্রিকার প্রকাশন ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত আবশ্যিক। সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বিশেষ সহযোগিতা প্রার্থনা করা হচ্ছে।

১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
কার্য্যকরী সম্পাদক
মা আনন্দময়ী-অমৃতবার্তা

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ — ৩

জানুয়ারী, ১৯৯৯

সংখ্যা — ১



সম্পাদক মণ্ডল

- ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
- স্বামী নির্মলানন্দ
- ড: শুকদেব সিংহ
- ড: বীথিকা মুখার্জী
- কুমারী চিত্রা ঘোষ
- কুমারী গীতা ব্যানার্জী
- ব্রহ্মচারিণী গুণীতা

কার্য্যকারী সম্পাদক

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী



বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা

বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

- ★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতি ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয়।
- ★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।
- ★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যিক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।
- ★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম :
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c
- ★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—

Managing Editor,

Ma Anandamayee—Amrit Varta

Mata Anandamayee Ashram

Bhadaini, Varanasi - 221001



পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম :-

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা—২০০০/- বাৎসরিক।

অর্ধেক পৃষ্ঠা -- ১০০০-বাৎসরিক।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাছা, বারাণসী-১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক—শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচী পত্র

১.	মাতৃ বাণী	...	১
২.	শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	... শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	৩
৩.	মা আনন্দময়ী	... ম০ ম০ স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী	৭
৪.	মা ছেলেকে কখন ধরেন	... মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ	৯
৫.	শেষ প্রণাম	... স্বামী ব্রহ্মানন্দ	১১
৬.	সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী	... ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী	১৬
৭.	শ্রীমুখে শ্রীশ্রী মায়ের জীবন	... শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত	২০
৮.	ড০ ত্রিগুণা সেনের চিঠি	...	২৩
৯.	শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম	... সঙ্কিতা সেনগুপ্ত	২৪
১০.	আমার মা আনন্দময়ী	... “বিশুদ্ধা”	২৫
১১.	শ্রীশ্রী মায়ের দাক্ষিণাত্য যাত্রা	... শ্রী শিবানন্দ	২৮
১২.	আশা	... শ্রীমতী মীরা রুদ্র	৩২
১৩.	ছেলেধরা মা	... জনৈক সন্তান	৩৩
১৪.	সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীশ্রী মা	... জয়া ভট্টাচার্য্য	৩৬
১৫.	আশ্রম সংবাদ	...	৩৮



বিশেষ সূচনা

সকল গ্রাহকদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে বর্তমান সংখ্যা ১৯৯৯ সনের প্রথম সংখ্যা। তাই যাঁরা বর্তমান বছরের চাঁদা পাঠান নি তাঁরা অবিলম্বে যেন তাঁদের চাঁদা পাঠিয়ে দেন। চাঁদার টাকা মনিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট দ্বারা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে কারণ চেক ব্যাঙ্কে জমা হতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং অন্তত: ২০/- ক্ষতি হয়।

পত্রিকার প্রকাশন ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত আবশ্যিক। সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বিশেষ সহযোগিতা প্রার্থনা করা হচ্ছে।

১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
কার্যকরী সম্পাদক
মা আনন্দময়ী-অমৃতবার্তা



মাতৃ-বাণী

সংকলন - চিত্রা ঘোষ

পরম পথের যাত্রীর লক্ষ্য পুরণের যাত্রায় ব্রতী থাকার চেষ্টা করা।



তিনি ছাড়া যে অন্য আর কিছু নেই। রান্নার জিনিষ বল, বিল্ডিংয়ের কাজ বল, যে কোনও কাজ বা যা কিছু বল তিনি ছাড়া আর যে কিছুই নেই। তিনি ছাড়া এটা, এ কথা বললে যে তাঁর সর্বব্যাপীত্বে দোষ আসে। তিনিই সব; আর কিছুই নেই। তাই কোনও কথায় কোন ব্যবহারেই বাধা আসে না। একই ভাব সর্বদা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে দিয়া তোমরা যখন যা হয় করিয়ে নেও। তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা-চলা-কাজ কর্ম।



এ শরীরের ত যা হয়ে যায় তাই। ওদিকে আর এদিক নাই। নাইও নাই; যা বল তাই। তোরা মানে তোরা, তোরা মেরা কিনা। ‘তোরা’ — ‘মেরাই’ত তোমাদের ব্যারাম।



তিনি আছেন। তিনি না থাকলে আমি কই? তিনি আমাকে ছুঁয়ে আছেন। এই ভাবটা নিতে নিতে দেখবে তিনিই, আমি যদি থাকি, সেবক সেবিকা। তাই আমি ত দূরে রইলাম না। তাই আর দুর্বুদ্ধি হল না। এই ভাবটা আসবার জন্যই নিরন্তর ভাবা। যতটা ইষ্টতে মন রাখবে ততটা নিষ্ঠা বাড়বে। বহুদিকে মন না দিয়ে একাগ্র হওয়া। ভয় ভাবনা কেন? তিনি আমার কাছে নাই এই ভাবটার জন্যই ত। তিনি ধরে আছেন, ভয় কি? অড়ুয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায়?



এই যে জিজ্ঞাসা ইহার মূলেওত সংশয়। যদি তোমার স্থির বিশ্বাস থাকিত যে ভগবানই সব করিতেছেন তবে আর জিজ্ঞাসা আসিত না। জিজ্ঞাসা যখন আসিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে স্থির বিশ্বাস নাই। সেইজন্য কাজ করা দরকার।



তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি আত্ম-স্বরূপ, এই যদি প্রত্যক্ষ না হয় অতীন্দ্রিয় লীলায় প্রবেশ কি করিয়া হয়? তাঁকে পাবে তবে ত। জল যেমন, বরফ যেমন জল। জলেতে বরফ আছে,

বরফে জল আছে। সেইরূপ প্রত্যক্ষ নির্দ্বন্দ্ব ভাবে তাঁহার লীলা, তাঁহারই খেলা প্রকাশ পাবে। নিত্যধাম, নিতালীলা এসব কোথায় প্রকাশ বল দেখি? তুমি বুঝি ভেবেছ, সেই অখণ্ড অব্যক্ত ব্রহ্ম। সে ঐ দিকের কথা। সাকারে যিনি, নিরাকারেও তিনিই। তাঁকে সর্বাকারে পেতে হবে। তিনি অখণ্ড কিনা।



যেমন এক বীজেতে অনন্ত বীজ, অনন্ত ব্রহ্ম। আবার অনন্তের ভিতরেও সেই অন্ত, একই। তাঁকে নানা দিকে পাওয়া, নানা ভাবে পাওয়া। সর্বরূপ সর্বাধিক, আবার নানাভের বাইরে যেতে হবে। বাইরে ভিতরে তাঁকে সর্বাঙ্গীন পাওয়া চাই। যা কিছু শোন, তোমাদের এই দৃষ্টি। অর্থাৎ এই চশমা দিয়ে দেখ কিনা, কাজেই দেখার ভুল থাকে। লক্ষ্য ছোট করে রেখো না। সেই পরম পদে লক্ষ্য রেখো। সেই যে সর্বাঙ্গীন, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অখণ্ড পূর্ণ তাঁকে পেতে হবে।



দেখ ত গরুত পশু, পশু কিনা পশুর বৃত্তি, সেই বৃত্তিগুলির রক্ষক রাখাল কি করে? না গরু গুলিকে রক্ষা করিয়া যাহাতে তাহাদের নিকট হইতে দুধ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করে। দুধ হইল শুভ্রবর্ণ, শুভ্রবর্ণ হইল কি না সত্ত্ব গুণ।

বৃত্তিগুলিকে সেইরকম ভাবে রক্ষা করিতে হয় যাহাতে তাহা হইতে সত্ত্বগুণ বাহির হয়। তাহার পর মন্থন করিয়া সত্ত্বের সার বস্তু মাখন উঠিল। সেই মাখনের পরিণতি কোথায়? না পরমাত্মায়, তাই মাখনচোর কৃষ্ণ। এখন পরমাত্মাকে “তুমি তুমিই” বল কি, আমি আমিই বল, একই কথা।



যাহা সকলেই চায়, তাহা পাইবার সহায়ক যে সব কর্ম, তাহাই ধর্ম। তাহাই স্বভাবের কর্ম, আর যাহা অশান্তি দুঃখ আনে, তাহাই অভাবের কর্ম, তাহাই অধর্ম।



কেন হয় না জান না? আমরা ঔষধ খাই, কিন্তু কুপথ্য করি তাই ঔষধে কাজ দেয় না। রোগও সারে না। তাই যেমন গুরু দত্ত ঔষধ পড়িয়াছে, তেমন সুপথ্যও পড়া দরকার। অর্থাৎ আহার, বিহার সবই ঠিক মত হওয়া দরকার। তোমার মধ্যেই তো সব আছে। একটু, বহুত্ব, অনন্ত, অব্যক্ত, ব্যক্ত।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

সূক্ষ্ম দেহে গিয়া মুক্তিবাবাকে রোগ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করা

দিদি। আরও একটা গল্প আপনা দিগকে বলিতেছি।

মা। এখন বুঝি তোর রাত্রি হয় না? (সকলের হাস্য)

দিদি (হাসিয়া) গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৩টার সময় মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, দিদি, আমি দেখিতেছি যে মুক্তিবাবা পায়ের যন্ত্রণায় খুব অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। এই দেহটা যেন তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া তাহার ব্যথার জায়গাটায় হাতখানা রাখিয়া দিয়াছে। কি ভাবে যে হাতটি ছিল মা তাহা আমাকে সুন্দর একটি মুদ্রা করিয়া দেখাইলেন। পরে মা বলিতে লাগিলেন, “এমন সময় দেখি যে দিদি (খুকুনী) আমাকে নিতে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আমি মুক্তিবাবার কাঁধ হইতে মাথা তুলিয়া বলিলাম, “বাবা কেমন আছ?” বাবা বলিল, “মা, দেহ শেষ হইয়া যাক্ ইহাই এখন ইচ্ছা হয়।” বাবার মনের ভাবটা এই যে সে যদি হাতের কাছে কোন বিষ পায় তবে তাহা খাইয়া জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। আমি বাবাজীর কথা শুনিয়া বলিলাম, “বাবা, এমন কথা আর মুখেও আনিও না। বল, এমন কথা আর মুখে আনিবে না?” বাবা বলিল, “তবে তুমি বল যে তুমি আমাকে ছাড়িয়া আর যাইবে না।” উহা শুনিয়া আমি জোরের সহিত বলিলাম “না, না, না। এমন প্রশ্নই হইতে পারে না। এ যে নিত্য সম্বন্ধ।” সে তিনবার ঐ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া নিল এবং ইহার পরই সে শান্তি পাইল।” মা আমাকে ডাকিয়া এই দর্শনের কথা বলিলেন। এতদিন মুক্তিবাবা সম্বন্ধে আমরা ভাল খবরই পাইতে ছিলাম। তাঁহার পা অবশ্য তখন পর্য্যন্ত প্লাস্টার করা হয় নাই। ডাক্তারেরা ইচ্ছা করিয়া দেৱী করিতেছিলেন, কারণ প্লাস্টার করিলে হাড় নাকি অনেকদিন পর্য্যন্ত নরম থাকে। মোট কথা মুক্তিবাবার খবর ভালই আসিতেছিল। এমন সময় মায়ের হঠাৎ এই দর্শন। শীঘ্রই অনারূপ সংবাদ আসিবে বলিয়া মনে হইল। ইহার দুই দিন পরে কুসুমের নিকট হইতে চিঠি পাইলাম যে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে মুক্তিবাবার পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ডাক্তারেরা প্রথমে ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারেন না যে, যে শিকটা মুক্তিবাবার হাটুর ভিতরে ঢুকাইয়া উহার সহিত টানা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল উহা ভাঙ্গিয়া পায়ের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং উহার দরুণ ভাঙ্গা হাড়ের উপরেও অন্যভাবে চাপ পড়ে। এইজন্য সেদিন অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছিল। যাহা হউক এখন মুক্তিবাবা নাকি ভালই আছেন।

এই গল্প শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, “মা, তোমার দর্শনটা না হয় একরূপ বুঝিলাম, কিন্তু তোমারও মুক্তিবাবার মধ্যে যে কথাবার্তা হইল উহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলাম না। মুক্তিবাবার

প্রশ্নের উত্তরে তুমি যাহা বলিলে উহা আমার নিকট ফাঁকি বলিয়াই মনে হয়। মুক্তিবাবা তোমাকে বলিলেন, ‘বল, তুমি আমাকে ছাড়িয়া আর যাইবে না?’ উহার উত্তরে তুমি বলিলে, “না, এরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না।” ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে তোমারই নিকট ত দুই নাই, কাজেই তোমার কাছে এরূপ প্রশ্ন অচল। কিন্তু তাহাতে মুক্তিবাবারই বা কি আর আমাদেরই বা কি? ইহাতে আমরা শান্তি পাইব কেন?

মা। মুক্তিবাবাকে ঐ কথা বলিয়া এ দেহের সহিত যে সে অভিন্ন এই জ্ঞানের সূচনা তখন করিয়া রাখা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এমন একটা স্থিতি দেওয়া হইল যাহার ফলে সে তখনই মনে শক্তি পাইল। ইহা অবশ্য সাময়িক। তোমার ক্ষুধা পাইলে যদি তোমাকে খাবার দেওয়া যায় তাহাতে যেমন তোমার ক্ষুধা তৃপ্ত হয়, ইহাও সেইরূপ। ইহার অর্থ এই নয় যে তোমার আর ক্ষুধা পাইবে না। তাহা ছাড়া তাহার ভাস্ক্রা পায়ের উপর আমার হাতখানা যে রাখিয়া দিয়াছিলাম একথাও ত বলা হইয়াছে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

হরিদ্বারে শিব রাত্রি

১০ই ফাল্গুন, শনিবার (ইং ২৩.২.৫২) আজ সোলনের রাজাসাহেব নর্মদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। গত দুই দিন হইতেই পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি শিব প্রতিষ্ঠার নানা আনুষঙ্গিক কার্য চলিতেছিল। আজ বেলা ১১টার মধ্যে শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শিব চতুদশী বলিয়া আজ আমরা সকলেই উপবাসী। রাত্রিবেলা মন্দিরে ত শিবপূজা হইলই, তাহা ছাড়া মন্দিরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এবং দক্ষিণদিকের বারান্দায় অন্যান্য মহিলারা সারারাত্রি জাগিয়া শিবপূজা করিলেন। আশ্রমের হলঘরেও প্রায় সমস্ত রাত্রি কীর্তন চলিল। প্রথম প্রহরের পূজা শেষ হইলে মা আমাকে শিব মন্দিরের বারান্দায় নিয়া আমার কপালে ভস্ম লেপিয়া দিলেন এবং আমার গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিয়া ঐ মালা জপ করিতে বলিলেন। আমি মালা জপ করিতে জানি না বলিলে কি ভাবে জপ করিতে হয় মা তাহা আমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে শুনিতে পাইলাম যে মা আজ সকলের কপালেই ভস্ম লেপিয়া দিয়াছেন এবং কাহাকেও রুদ্রাক্ষের মালা দিয়াছেন।

শেষ রাত্রির পূজার সময় মা আবার আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং আমি মন্দিরে উপস্থিত হইলে মা আমাকে পূজার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। এতক্ষণ আমি হলঘরেই ছিলাম, কারণ বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা। বাহিরে ঠাণ্ডা সহ্য হইবে না বলিয়াই আমি মন্দিরের পূজার নিকট বসি নাই, যদিও মা প্রায় সমস্ত রাত্রিই এইখানেই কাটাইয়াছেন। যাহা হউক আমি মায়ের কাছে বসিলে খুকুনী দিদি আমাকে কিছু ফল এবং বিশ্বপত্র দিয়া বলিলেন, “আজ শিবরাত্রি, মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবেন না?” আমি সানন্দে সম্মত হইয়া দিদির দত্ত ফুল ও বিশ্বপত্র দ্বারা শ্রীশ্রী মায়ের চরণে অঞ্জলি দিলাম। দিদির কৃপাতে আমার পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া দিদির প্রতি

কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণটা ভরিয়া উঠিল।

মন্দিরের মধ্যে যখন পূজা চলিতে ছিল তখন ঐখানে বহুশাখা যুক্ত একটি প্রকাণ্ড দীপাধার দেখিতে পাইলাম। শুনলাম কাশীর আশ্রমের জন্য ইহা ক্রয় করা হইয়াছে। এতদিন ইহা দিল্লীতে পড়িয়া ছিল। টিহরীর রানীকে বলিয়া এবার ইহাকে দিল্লী হইতে হরিদ্বারে আনা হইয়াছে। মন্দিরের আরতি হইয়া গেলে মা আমাদেরকে বলিতে লাগিলেন, এই যে ধূপ দীপ ইত্যাদি যাহা দেখিতেছ জানিও এগুলিরও কন্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কন্মের জন্যই জিনিষের যোগাযোগ হয়। এতদিন যে এই ঝাড়টি দিল্লীতে পড়িয়া ছিল উহাও বৃথা নয়। কারণ শিব প্রতিষ্ঠার সময় হরিদ্বারে শিবকে এইভাবে আলো দিবে বলিয়াই ইহা যেন অপেক্ষা করিতেছিল। আর শিবের তলায় যে রুদ্রাক্ষের মালা দেখিতেছ, ঐ রুদ্রাক্ষও ঢাকার আশ্রমের। কমলাকান্তের কাছে ঢাকার আশ্রমের ১০৮ রুদ্রাক্ষ ছিল। সে উহা যোগী ভাইকে দেয়। যোগীভাই ঐগুলিকে রূপার তার দিয়া মালা গাঁথিয়া শিবকে পরাইয়া দিয়াছে। এই যে সব যোগাযোগ দেখিতেছ ইহাও আকস্মিক নয়। সকল বস্তুর সহিতই কন্মের যোগাযোগ থাকে। মুখে বলিবে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, আবার জড় চেনন বলিয়া জিনিষ ভাগ করিবে, তাহা কি হইতে পারে ?

মন্দিরে পূজা শেষ হইলে শ্রীশ্রী মা ফুল ও বিশ্বপত্র সহ আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। হরিদ্বারে আসিয়া নানাভাবে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা লাভ করিয়া নিজকে কৃতকৃত্য মনে করিতেছি। অথচ কত অনিচ্ছার সহিতই হরিদ্বার রওনা হইয়া ছিলাম।

সূর্য্য গ্রহণ

১১ই ফাল্গুন, রবিবার (২৮/২/৫২) আজ শিবরাত্রির পারণ। শ্রীশ্রী মায়ের হস্ত হইতে আমরা ফল প্রসাদ পাইলাম। যাঁহারা গতকল্য উপবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মা বেশী বেশী করিয়া ফল দিলেন। আজ বিকালে আবার গ্রহণ। এইজন্য শীঘ্র শীঘ্র আমরা আহাৰাদি শেষ করিলাম। গ্রহণ বলিয়া অনেকেই আজ সূর্য্যাস্তের পূর্বেই অন্তঃগ্রহণ করিলেন।

বিকালের দিকে মা গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই ঐখানে গিয়া জড় হইলাম। কীর্তন চলিতে লাগিল। ত্রিবেণীপুরী মহারাজও গ্রহণের সময় গঙ্গায় আসিলেন। সকলেই আজ গঙ্গা স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। হরিদ্বারের গঙ্গার ঐ ঠাণ্ডা জলে আমার স্নান করিবার সাহস হইল না। তাই আমি স্নান করিব না বলিয়া ঠিক করিলাম। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গঙ্গা স্নান করিবে না ?

আমি। না।

মা। গঙ্গা স্পর্শ করিও।

আমি তাহাই করিলাম। মহাত্মা ত্রিবেণীপুরী মহারাজ স্নান করিলেন। শ্রীশ্রী মাও স্নান

করিলেন। ভক্তগণ খুব আনন্দের সহিত স্নান করিতে লাগিলেন। আমরা কয়েকজন তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতে লাগিলাম। গ্রহণান্তে আমরা সকলেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

দেৱাদুন গমন

১৩ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার (ইং ২৬/২/৫২) আজ সকালের গাড়ীতে আমরা হরিদ্বার হইতে দেৱাদুন রওনা হইলাম। রাজাসাহেব সকাল বেলাই আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আমরা আহাৰাদি করিয়া বেলা ৯টার সময় স্টেশনে আসিয়া দেৱাদুনের গাড়ী ধরলাম। আমাদের সকলকে মালপত্র সহ স্টেশনে পৌঁছাইতে রাজা সাহেব তাঁহার বাস এবং মোটর গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, বেলা ৭টা হইতে এই বাস আশ্রম এবং স্টেশনে দৌড়া দৌড়ি করিতেছিল। ইহা হইতেই আমাদের লোক সংখ্যা এবং মালের পরিমাণ অনুমান করা যাইতে পারে।

গাড়ীতেও আজ ভয়ানক ভীড়। গ্রহণের জের একেবারে মিটে নাই। যাহা হউক বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা দেৱাদুন পৌঁছিলাম। কমল দাদাও আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার হইতে দেৱাদুনে আসিয়াছেন। তিনি আজই কাশী চলিয়া যাইবেন। টিহিরীর রাজমাতা মাকে মোটর গাড়ী দিয়াছেন। তাহাতেই মা, দিদি এবং নারায়ণ স্বামী হরিদ্বার হইতে দেৱাদুনে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা। দিদি আশ্রমে পৌঁছিয়াই আবার ঐ গাড়ী লইয়া কমল দাদার সহিত দেখা করিতে স্টেশনে দৌড়াইলেন।

সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কীর্তনাদি হইল। আহাৰান্তে আমরা হল ঘরে আসিয়া মায়ের কাছে বসিলাম। এই সময় খুকুনী দিদিও উপস্থিত ছিলেন। মা আজ হলঘরেই শুইবেন।



মা আনন্দময়ী

— মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী

(আমরা একটা গান শুনি, গাই:)

মা আছেন আর আমি আছি
ভাবনা কি আর আছে আমার
আমি মা-এর হাতে খাই পড়ি
মা নিয়েছেন আমার ভার।
সংসার পাকে, ঘোর বিপাকে
যখন দেখি অন্ধকার,
সেই অন্ধকারের ভিতর হতে
আমার ব্রহ্মময়ী মা, করেন উদ্ধার।
আমি কাছেই থাকি, ভুলেই থাকি
ভোলে না মা একটিবার।
মা যে আমার স্নেহের আধার
আমি যে মা'র, মা যে আমার।

মা আনন্দময়ী সম্পর্কে বলতে গেলে, বলা যায় না। কারণ সন্ত কবীরজী একটি দৌহায়ে বলেছেন, “আত্মম্ জ্ঞান অনুভব কী যো কোই ‘পুছই বাত, গুঙ্গ গোর খাই কোই..... কোন মুখকো স্বাদ।” আত্মজ্ঞান অনুভবের কথা। কেউ যদি সেই জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করে সে বলতে পারে না — তেমনি করে এ অনুভব হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। মা ছিলেন সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূতা মূর্তি। স্নেহের আধার, দয়ার আধার, ক্ষমার আধার — মা এর সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা অনুভব করেছেন। আজও — মা তো নিত্যা, নিত্যই.... মূর্ত। মা নেই তা নয়, মা ছিলেন আছেন থাকবেন। সেই জগজ্জননী সকলের প্রতি কৃপা বর্ষণ করে চলেছেন। আজও আকুল হয়ে ব্যাকুল হয়ে যখন তারা মাকে ডাকে মা এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন।

আজ মা-এর জাতীয় স্মরণ সভায় আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কনখলেও মা-এর শতবার্ষিকী শুভারম্ভের পরিসমাপ্তিতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বড় বড় মহামণ্ডলেশ্বর জ্ঞানের সাগর বলা যায় — যাঁরা সাগরের ভিতর সাগর ভরে দিতে পারেন, আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি মা-এর কাছে গিয়ে শিশুর মতো মাথা নত করে গিয়ে মা-এর আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন। কী শক্তি কী বিভূতি কী অসীমতা থাকলে যে সব মহামহা মণ্ডলেশ্বর বড় বড় তপ:শক্তি সম্পন্ন সন্ত মহাত্মা, সমস্ত মঠ-মন্দিরের সকলেই মা-এর কাছে ছা-এর মতো সন্তানের মতো গিয়ে মাথা নত করেছেন। আর দেখেছি, আপনি আচার ধর্ম যে শিখায়,

আপনি না করিলে কর্ম শিক্ষণে না যায়। এই তো সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়। মা সমস্ত বেদ বেদান্ত গীতা ভাগবত যেন মূর্ত হয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করে এই মর্তে ধূলার ধরণীতে সকলকে উদ্ধার করতে নেমে এসেছিলেন। সেই মা-এর সান্নিধ্য লাভের, মা-এর স্নেহলাভের, আশীর্বাদ লাভের অপার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

আজ আপনাদের সামনে সকলের সঙ্গে মিশে মা-এর চরণে এই দীন সন্তানের ভক্তি বিনম্র একটি প্রণাম নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য কৃতার্থ মনে করছি। এখানে মহা মহাপণ্ডিত বিদ্বান ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা দেশের দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন — সব মায়ের আশীর্বাদ। আজ এই পুণ্য পবিত্র দিনে এই দীন সন্তান মা-এর চরণে ভূয়ো: ভূয়ো: প্রণাম নিবেদন করলাম। নমস্তস্যৈ: নমস্তস্যৈ: নমস্তস্যৈ: নমো নম:। আমি আবার প্রণাম জানিয়ে আমার বাক্য পুষ্পাঞ্জলি মা-এর চরণে অর্পণ করে বাগ্‌বাণীর এখানেই বিরাম দিলাম।*

হরি ওঁ তৎসৎ।



* ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সনে কলিকাতা স্থিত মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে প্রদত্ত উদ্বোধন ভাষণের সারাংশ।

“এক তাঁহারই তো প্রকাশ। তাঁহারই রূপ।”

— শ্রীশ্রী মা

মা ছেলেকে কখন ধরেন

— মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

(সংকলন — শ্রী জগদীশ্বর পাল)

অনাদিকাল হইতে প্রতি যুগে কত ছেলে মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া এবং তাহাকে ধরিবার আকুল চেষ্টা সত্ত্বেও ধরিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়ে — মনে করে সে বুঝি সত্যিই মাতৃহীন ‘পরিত্যাক্ত অনাথ সন্তান’, অথবা হয়তো মা তাহার পাষাণী ও বধিরা। আবার এমন ছেলেও আছে যে মাকে না ডাকিলেও তাঁহাকে ডাকিতে চেষ্টা না করিলেও মা স্বয়ং তাহাকে ধরেন ও তাহার নিকট নিজে ধরা দিয়া বসেন।

ছেলের কাজ মাকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহার পর তাঁহাকে ধরিয়া থাকা। কিন্তু ছেলের পক্ষে এই উভয় কাজই অতি কঠিন। কারণ, মা আত্মগোপন করিলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাহির করে? আর মা নিজে ধরা না দিলে কেই বা তাঁহাকে ধরিতে পারে?

তবে কি মা সব ছেলেকে ধরেন না? না, তাহা নহে। তিনি ধরেন সকলকেই, কারণ সকলেই তাঁহার সন্তান। তবে, সকলকে এক সময় ধরেন না। যাহার যখন ধরা পড়িবার সময় হয়, তখনই তাহাকে ধরেন, ধরিয়া আপন করিয়া নেন, পরে তাহার কাছে উপযুক্ত সময়ে নিজেও ধরা দেন। যাহার এখনও ধরা পড়িবার সময় হয় নাই, যে এখনও ধরা দিতে চায় না, যে এখনও বাহিরের মরীচিকায় মুগ্ধ আছে, তাহাকে মা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরেন না, তাহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দেন। মা ধৈর্য্যময়ী, তিনি জানেন, সময় হইলে সেও ধরা দিতে প্রস্তুত হইবে। ধরা না দিলে যে উপায় নাই। মা সেই মহাক্ষণের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করেন।

বাস্তবিক পক্ষে মা ছেলেকে ধরেন কখন? যখন ছেলে প্রকৃতই ছেলে হইয়া মার নিকট নিজেরও অজ্ঞাতসারে নিজেকে প্রকাশিত করে, করুণাময়ী জননী তাহার বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সদ্গুণ, শীল, সম্পদ কিছুই প্রত্যাশা করেন না। নিজের গুণ গরিমা, কলাকৌশল, মান-প্রতিষ্ঠা সবকিছু বিস্মৃত হইয়া যে ছেলে শিশুর মত সরল বিশ্বাসে ও নির্বিচারে মার কোলে বাঁপাইয়া পড়িতে উন্মুখ হয়, তাহাকেই মা ধরেন। সে হয়ত নিজেকে তখনও চিনে না। কিন্তু মা তো তাহাকে চিনেন, চিনিয়া তাহাকে ধরেন। শাস্ত্রে শুনি একদিন এই ‘আমি’ মায়ের গর্ভে নিহিত ছিল — মায়ের সন্তায় নিজ সন্তা ডুবিয়া ছিল বলিয়া তাহার সহিত একসত্তারূপে অবস্থিত ছিল। তখন মা সন্তান সম্বন্ধ ছিল না। অথচ ছিল না যে সে বোধও ছিল না। সেই কালাতীত মহাসন্তা হইতে কি জানি কেন চ্যুত হইয়া কোন এক অচিন্ত্য ক্ষণে অসাড়ে চিদগুরুরূপে এই খণ্ড সত্তাটি কালের স্রোতে পতিত হইয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসে। ক্রমশঃ ৮৪ লক্ষ যোগি ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া নরদেহে আরাঢ় হইবার ফলে তাহাতে আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। নরদেহে কর্তৃত্বের অভিমানে

ও পূর্ব-সংস্কারের উদ্দীপনে শুভাশুভ কর্মের অভিমান বশত: ফলভোগের জন্য বাধ্য হইয়া সেই 'আমি'টি সংসারী সাজে। এই প্রকারে অহংকারের বোঝা লইয়া সুখ-দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে কল্প-কল্পান্তর কাটিয়া যায়। ক্রমে অবসাদ ও ক্লান্তি আসে এবং কালের রাজ্যকে বিদেশ বলিয়া ধারণা জন্মে। অনন্ত বিশ্বে লোক লোকান্তরে যেখানেই তাহার গতি হউক, সর্বত্রই মনে হয় সমগ্র কালের জগৎ তাহার বিদেশ। স্বদেশে ফিরিয়া মায়ের কোলে উঠিবার জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠে। সতাই তখন নিরাবিল শিশুভাব লইয়া বিশ্ব-প্রসবিনী কালাতীত কাল সংকষিণী সচ্চিৎস্বরূপা আনন্দময়ী মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হয়। সে বাহ্যত: বুঝুক বা না বুঝুক, তাহার অন্তরাত্মা অহরহ কাঁদিতে থাকে। নীরব ভাষায় কাঁদে কেহ সে কান্না শোনে না, শুনিতে পায় না, শুনিতে চায়ও না। শোনের একমাত্র মা। মায়ের প্রাণ তখন আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না। মা তখন ছেলেকে ধরিয়া ফেলেন। ধরা দেবেন বলিয়াই ধরিয়া ফেলেন, ধরিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলেন — জীবকে তাহার স্বরূপ সিদ্ধ শিবভাবে ফুটাইয়া সেই শিবময় সন্তানের নিকট নিজেও ধরা দেন।



“তাহার উপরই সব ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।

— শ্রীশ্রী মা

শেষ প্রণাম

— স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শেষ প্রণাম।

যে প্রণামটিকে আমি শেষ প্রণাম বলে চিহ্নিত করতে চেয়ে ছিলাম তা কিন্তু শেষ প্রণাম হলো না। হোল না শ্রীশ্রী মায়েরই ইচ্ছায়। শেষ প্রণাম হলো তার পরের প্রণামটি। সে প্রণামটি ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট বুধবার রাতের প্রণাম। সময় রাত প্রায় সাড়ে ন’টা। তবু আমার সমস্ত মনের প্রাণের শেষ প্রণাম কিন্তু আগেরটিই।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী অসুস্থ। আরও দু’এক বারের মত এবারও সেই অসুস্থ শ্রীশ্রী মাকে দেখতেই ২৪শে আগষ্ট সকালে দেবাদুন এসেছি। অন্তরে অনেক গভীর শ্রদ্ধা, আকুতি আর ভালবাসা। সঙ্গে অমলদা আর অরুণদা।

শ্রীশ্রী মার শরীর ভাল নয়। কথাটা অনেক দিন থেকেই শুনে আসছি। শুনেছি লোক মুখে। জেনেছি চিঠিপত্রে। তাঁর নিজের কাছেও। দেখেছি নিজেও। তবু জানি কেন মন সেটাকে মেনে নিত না। মনে হতো মা আছেন, শরীর আছে, অসুস্থতাও আছে। আছি আমরাও। এমনি করে বিগত দিনগুলোর মতো আরোও অনেকটা পথ গতানুগতিক ভাবেই এগিয়ে যাবো। ছেদ বা বিচ্ছেদ, যদি বা বিরতিটা অনুভব করলাম এবার দেবাদুন এসে। দেবাদুন পৌঁছবার পর স্বামীজী ও পানুদা যখন শ্রীশ্রী মায়ের অসুস্থতার বিবরণ দিচ্ছিলেন তখনও সম্যক অনুধাবন করিনি। অনুভব করলাম, যখন স্বপক্ষে দেখলাম। ২৪শে আগষ্ট। ঘড়ির কাঁটাতে তখন সকাল সাড়ে দশটা।

শ্রীশ্রী মা অসুস্থ। তাঁর সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে শ্রীশ্রী মার সু-অবসরে দর্শন করার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিলাম। সংবাদ নিয়ে পানুদা তখনই আমাদের শ্রীশ্রী মায়ের ঘরে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রী মা দ্বিতলের ঘরে শায়িতা। খাটটি উত্তর দক্ষিণভাবে রাখা। প্রণাম করে নতজানু হয়ে প্রতিবারের মত এবারও হাত দু’খানি তাঁর বিছানার উপরই রাখলাম। অন্যান্য বার এলে অগণিত জনতার ভীড়েও তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের জন্য তাঁর চলার বলার মুখের ভাবভঙ্গিতে স্বতন্ত্র ব্যস্ততা প্রকাশ পায়। মন আজও সেই প্রত্যাশাই করেছিল। শ্রীশ্রী মা কিন্তু আজ উঠলেনও না, বললেনও না। শুধু চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইলেন। ‘অনেক কথাই যাও যে বলে কোন কথাই না বলে।’

পানুদার অনুরোধে সঙ্গে আনীত ফল মিষ্টিগুলো বুড়ি সমেত অমলদা ও অরুণদা শ্রীশ্রী মায়ের সামনে তুলে ধরলেন। মা অন্যের সাহায্যে হাতদুটো সামান্য একটু তুলে সেগুলো স্পর্শ করলেন। শ্রীশ্রী মায়ের জন্য আনীত বস্তাদিগুলো স্পর্শ করলেন। চন্দনের মালাটি প্যাকেটের মধ্যেই রক্ষিত ছিল। পানুদার কথায় অন্যরা খুলে সেটি আমার হাতে দিলে আমি তা শ্রীশ্রী

মায়ের বিছানার উপর রাখলাম। শ্রীশ্রী মা চেয়েই আছেন। স্মৃতির পাতায় ভেসে আসে অন্য দিন হলে শ্রীশ্রী মা বলতেন— কতো জিনিষ এনেছ, হাত দিয়ে তুলে ধরে অন্যান্যদের দেখিয়ে বলতেন— দেখ। দেখ কতো সুন্দর সুন্দর জিনিষ এনেছে। আজ দেবাদুন এসে শ্রীশ্রী মায়ের অসুস্থতার অনুধাবন করে এগুলো স্বামীজীর ঘরেই রেখে আসতে চেয়েছিলাম। স্বামীজীই বললেন— মায়ের কাছে নিয়ে যাও, মা দেখলে খুব খুশী হবেন। আজ শ্রীশ্রী মা শুধু চেয়েই আছেন, আমিও চেয়ে আছি। মনে হলো চির চেনার গভীর পেরিয়ে এ যেন এক অন্য মা। নীরব, নিখর, নিঃস্বপ্ন। লক্ষ্য করলাম হাতেমুখে ফুলো ফুলো ভাব। কিন্তু রোগের ক্লান্তি বা শ্রান্তি কোথাও নেই। সমস্ত মুখ মণ্ডলে এক দারুণ সৌম্যতা ও প্রশান্ততার ভাব।

নীচে বসলাম। শ্রীশ্রী মায়ের দিকে চেয়ে রইলাম। শ্রীশ্রী মা অস্পষ্ট স্বরে, আভাসে ইঙ্গিতে সেবিকাদের কাছে জানতে চাইলেন আমাদের জলখাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি। শ্রীশ্রী মায়ের চোখে চোখ রেখে পরিপূর্ণতার সন্মতি জানালাম। পানুদা শ্রীশ্রী মায়ের কাছে মুখ রেখে জানালেন আমরা কয়েক দিন থাকব। শ্রীশ্রী মায়ের মুখে আরও একটু প্রসন্নতার ভাব। শ্রীশ্রী মায়ের পরিচর্যার অসুবিধার কারণ হতে পারি ভেবে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। উঠতে গেলে শ্রীশ্রী মা আজ আর বললেন না— আরও একটু বসো। এই বোধ হয় প্রথম ব্যতিক্রম। অথচ যতবার এসেছি, যতক্ষণই তাঁর কাছে বসেছি, উঠতে গেলেই শ্রীশ্রী মা বলতেন— আরও একটু বসো। স্মৃতির পাতায় ভীড় করে এলো এমনি এক দিনের, এমনি এক ক্ষণের একটি বিশেষ স্মৃতি।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৪ই মে। হরিদ্বার স্টেশনে এসে নেমেছি আমরা প্রায় সত্তর জন। কেদার-বদ্রী যাব শ্রীশ্রী মা জানতেন। স্টেশনে পাঠিয়েছেন পাটনদাকে গাড়ি সহ। আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে। আশ্রমে নিয়ে যেতে। দুপুরে প্রসাদ নিতে। অনেক লোক অনেক মাল। প্রসাদ নিতে গেলাম। শ্রীশ্রী মা বললেন— পাটনকে আবার পাঠিয়েছিলাম তোমাদের একটু আগে নিয়ে আসতে। একটা বিশেষ অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। কিন্তু অনেক ঘুরেও পাটন তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারে নি। শ্রীশ্রী মাকে প্রণাম করলাম, একে একে মালা দিলাম, আরতি করলাম। শ্রীশ্রী মা সবার হাতে পর্যাপ্ত ফল মিষ্টি প্রসাদ দিলেন। দ্বিপ্রহরিক প্রসাদের ব্যবস্থা করলেন। সে এক বিরাট আয়োজন। বিশেষ একটা পদের উল্লেখ করে বললেন— এখন ত আর পারি না, তবু তোমরা আসছ বলে রান্নাঘরের পাশে জানালার ধারে চেয়ারে বসে বলে বলে ওটা করিয়েছি। তোমরা খেও। ফেরার সময় অনেকগুলো শুকনো ফল দিলেন। বললেন— কেদার বদ্রী যাওয়ার পথে খেও। সকলকে দিও। কেদার বদ্রী থেকে ফিরে এসে দেবাদুনে দেখা করো। সে কথা রাখতেই কেদার বদ্রী থেকে ফিরে এসে একদিন একটা গাড়ি করে ৫/৬ জন হরিদ্বার থেকে দেবাদুন গেলাম। শ্রীশ্রী মা তখন শ্রীযুক্ত খৈতানদের বাড়ি সংলগ্ন বিশ্রাম ভবনে অবস্থান করছেন। আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন সকাল প্রায় দশটা। সেখানে তখন বিশেষ যজ্ঞ চলছিল। শ্রীশ্রী মা যজ্ঞস্থলে ছিলেন। আমরা শ্রীশ্রী মায়ের ঘরের সংলগ্ন

ঘরে বসলাম। একটু পরে চেয়ারে করে সেখানে এলেন। এই প্রথম শ্রীশ্রী মাকে চেয়ারে করে আনতে দেখলাম। শ্রীশ্রী মা আমাদের তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। সবাইকে না নিয়ে আসার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। জলযোগের জন্য বার বার বলতে লাগলেন। আমরা কিছু নিলাম না। শ্রীশ্রী মা কিন্তু তাতেও নিরস্ত হলেন না। সরবতের ব্যবস্থা করলেন। আশ্রমিকদের ডেকে বিশেষ প্রসাদের ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে লোক দিয়ে যজ্ঞস্থলে পাঠালেন। ফিরে আসতে শ্রীযুক্ত খৈতানের স্ত্রীকে ডেকে তাঁর নিজস্ব গাড়ি করে আমাদের তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতে অনুমতি করলেন। শ্রীযুক্ত খৈতানের স্ত্রী আমাদের তাঁর বাড়িতে অনেকক্ষণ সযত্নে রাখলেন। দুপুরে শ্রীশ্রী মায়ের ঘরের সংলগ্ন স্থানে বসে প্রসাদ নিলাম। উপকরণের আর শেষ নেই। শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের বিভিন্ন সময়ের উপকরণ বস্তু প্রসাদের মধ্যে সেদিনের সংখ্যাটিই ছিল বোধহয় সর্বোচ্চ। প্রসাদান্তে শ্রীশ্রী মায়ের ঘরে এসে বসলাম। শ্রীশ্রী মা আমার মাথাটা মস্ত একটা হলদে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিলেন। একটু পরেই প্রণাম করে বিদায় নিতে চাইলাম। শ্রীশ্রী মা বললেন — শুয়ে থাকলেই কি বিশ্রাম হয়? তোমরা কাছে আছ, তোমাদের সাথে কথা বলছি, এটাই ত সবচেয়ে বড় বিশ্রাম, আনন্দের বিশ্রাম। ওঠা আর হল না, আবার বসে পড়লাম। কিন্তু একটু পরে সত্যিই উঠে পড়লাম। প্রণাম করে দাঁড়িয়ে বললাম — আসি। আমাদের ত হরিদ্বার ফিরতে হবে। সবাই সেখানে অপেক্ষা করছে। তাছাড়া আগামীকাল শ্রীশ্রী ভোলাগিরি আশ্রমে আশ্রম দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন মঠ ও আখড়ার সাধুমহাত্মাদের ভাণ্ডারা হবে। আমার সাথে যাঁরা আছেন তাঁরা ফিরে গিয়ে সে সব ব্যবস্থা করবেন। শ্রীশ্রী মা সবার হাতে আবার ফল মিষ্টি প্রসাদ দিলেন। যাঁরা আসতে পারেন নি তাদের জন্যও দেওঘর আশ্রমের জন্য বুড়িতে করে অনেক ফল মিষ্টি প্রভৃতি দিয়ে প্রতিবারের মত তোমরা কত জিনিষ আন, এখান থেকে সামান্য কিছু নিয়ে যাও বলে বিদায় সন্তোষজনক জানালেন — এসো! ঘড়িতে সময় তখন বিকাল তিনটা অতিক্রম করে গেছে।

আমরা এই প্রথম দেৱাদুন আশ্রমে এসেছি জেনে পানুদা আমাদের নীচে নিয়ে গেলেন। সমস্ত আশ্রমটা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। আমার বার বারই মার কথা মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল পানুদার মাধ্যমে শ্রীশ্রী মাই যেন আমায় সমস্ত আশ্রমটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। পানুদাকে বললাম — ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রীশ্রী মার খুব ইচ্ছা ছিল দেৱাদুন আশ্রমে আসি। আসা হয়নি। আজ এলাম। কিন্তু এক ভিন্ন পরিবেশে। ঘটনাটি এরূপ। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কনখল আশ্রমে নবনির্মিত প্রকাণ্ড হলে শ্রীশ্রী অন্তর্গণ্যপূজা সম্পন্ন হল শ্রীশ্রী মায়ের সুব্যবস্থায় ও শ্রীশ্রী নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় উভয় আশ্রমের অগণিত ভক্তদের উপস্থিতিতে। পূজা সমাপন হয়ে গেছে। যাওয়ার পালা শুরু। শ্রীশ্রী বাবার সাথে আমরাও আগামীকাল দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরে যাবো। অনেকেই স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে যাচ্ছেন। আশ্রমের সাথে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন দেৱাদুন যাবেন। তাদের একান্ত ইচ্ছা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার ত যাবার ইচ্ছাও নেই, সুযোগও নেই। শ্রীশ্রী মা ও শ্রী নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ পাশাপাশি ঘরেই থাকেন। অনেক সময় সামনের প্রশস্ত বারান্দাতেই বসে থাকেন। ভক্তদের ভীড় লেগেই

থাকে। অধিকাংশ সময় আমাকেও থাকতে হয় সেখানেই। কিন্তু দেবাদুন যাত্রীরা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে কিছুতেই যাবেন না। দীর্ঘক্ষণ থেকেই তাঁরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। দুপুরে উভয়ে বিশ্রাম করতে গেলে আমি নীচে নেমে সোজা দেবাদুন চলে গেলাম। সেখানে ঘটানাকৈ থেকে অপরিবর্তিত ভাবেই মুসৌরী। সেখানে আধ ঘটানাকৈ থেকে ফিরে এলাম হরিদ্বারে কনখল আশ্রমে। তখন শ্রীশ্রী মা ও শ্রীশ্রী বাবা যথারীতি ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে উপরের বারান্দায় সমাসীন। দু'জনের কেউই আমার এতক্ষণ অনুপস্থিতি প্রত্যাশা করেননি। জিজ্ঞাসা করতেই বললাম — দেবাদুন ও মুসৌরী ঘুরে এলাম। আমার অনুপস্থিতিটা তারা যেমন আশা করেননি, এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘুরে আসাটাতে তাঁরা খুব অবাক হলেন। শ্রীশ্রী মা ততোধিক উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মুসৌরী যাওয়ার পথের ধারেই তো দেবাদুন আশ্রম, তুমি যাওনি? আমি জানালাম — বিশেষ কোথাও না। Just একটা round দিয়ে এলাম। শ্রীশ্রী মা আমার শেষোক্ত কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন — Just একটা round দিয়ে এলে। শ্রীশ্রী মার কথাটা শেষ হতে না হতেই শ্রীশ্রী নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বললেন — ওদেরত বয়স অনেক কম, পরে সুযোগমত যাবে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে কৈদার বদ্রী হতে ফিরে শ্রীশ্রী মার সাথে দেবাদুনে শ্রীযুক্ত খৈতানদের আবাস সংলগ্ন বিশ্রাম ভবনে দেখা করতে যাওয়ার সময়ও এই আশ্রমের সামনে দিয়েই গিয়েছি। সঙ্গীরা এই দেবাদুন আশ্রমের গেটের সামনেই গাড়ি থামিয়ে শ্রীশ্রী মার অবস্থিতিটা জেনে নিয়েছিলেন। সেদিনও আসা যাওয়ার পথ থেকেই এই দেবাদুন আশ্রমকে লক্ষ্য করেছিলাম। না। ভিতরে'ত যাই-ইনি। আজ সে সুযোগ এলো। শ্রীশ্রী মা নিজেও আজ এই আশ্রমেই উপস্থিত। পানুদার কাছে জানতে পারলাম — দেবাদুন আশ্রম শ্রীশ্রী মার খুব পুরাতন আশ্রম। শ্রীশ্রী ভোলানাথজীও এই আশ্রমেই ব্রহ্মলীন হয়েছিলেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীভোলানাথজীর বিশাল প্রতিকৃতিও রয়েছে। পাশেই আরও একটা মন্দির। তাতে একটি বস্ত্রাবৃত মূর্তি। পানুদার কাছেই জানতে পারলাম তা শ্রীশ্রীমায়েরই মর্মর মূর্তি। বানান হয়েছিল। শ্রীশ্রী মা প্রতিষ্ঠা করতে দেননি। শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশেই এখানে সযত্নে রাখা রয়েছে। লক্ষ্য করলাম শ্রীশ্রী মায়ের নিরাময় কামনা করে বিভিন্ন পাঠ ও জপ প্রভৃতি চলছে। কিন্তু কে কাকে নিরাময় করবে? শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীমাই একমাত্র নিরাময় করতে পারেন। শ্রীশ্রী মার খেয়াল হলেই তা একমাত্র সম্ভব। তাই শ্রীশ্রী মার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে পানুদাকে বারবারই লিখেছিলাম — শ্রীশ্রী মার কাছেই প্রার্থনা করছি তিনিই তাকে সুস্থ করে তুলুন। আশ্রম দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আশ্রমেই প্রসাদ নিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে শেখা আশ্রমিকদের সম্পূর্ণ নিখুঁত ব্যবস্থা। তারপর ফিরে এলাম আবাস স্থলে। আশ্রম থেকে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল দেবাদুন আশ্রম সেক্রেটারী মহোদয়ের বাসভবনে।

ঘরে ফিরে এসে শ্রীশ্রী মায়ের কথাই ভাবছি। ভাবছি শ্রীশ্রী নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কথাও। দু'জনকে ঘিরে কতো টুকরো টুকরো স্মৃতি। দু'জনের মধ্যে কি নিবিড় মধুর সম্পর্ক। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি গভীর শ্রদ্ধা। কি গভীর আত্মিক যোগাযোগ। তাঁদের দু'জনকে যারা একত্রে দেখেছেন একমাত্র তাঁরাই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, অনুভব করতে পেরেছেন। একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রী মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রী কাত্যায়নী পূজা হচ্ছে।

আয়োজন শ্রীশ্রীমায়েরই। ভক্তদের নিয়ে শ্রীশ্রী বাবা সেখানে সমবেত পূজা করছেন। শ্রীশ্রী মায়ের এক বিশিষ্ট ভক্ত করুণা ভিখারী অজয়দাকে যুগপৎ উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — শ্রীশ্রী মায়ের সাথে ত কতো সাধুমহাত্মাদের যোগাযোগ। শ্রীশ্রী মায়ের কাছে তাঁরা আসেন। শ্রীশ্রী মাও তাঁদের কাছে যান। কিন্তু শ্রীশ্রী ব্রহ্মচারী মহারাজের সাথে শ্রীশ্রী মার সম্পর্কটা যেন একটু স্বতন্ত্র ধরনের ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর কারণ কি উভয়েরই বাঙ্গালী শরীর ও জন্মসূত্রে উভয়েই খুব কাছাকাছি অঞ্চলের লোক বলে? অজয়দা সেদিন বিষয়টার সত্যতা অনুভব করে উপর্যুক্ত কারণ দুটো যেমন একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি; তেমনি জানিয়েছিলেন — মুখ্য কারণটা তাঁদের আত্মিক নিবিড়তা। অন্তর জগতে তাঁরা এত কাছাকাছি, পাশাপাশি ছিলেন যে সেই মধুর রসে, সেই আনন্দধারায় তাঁদের বাইরের সম্পর্কটা হয়ে উঠেছিল মধুরতম, আনন্দঘন। শ্রীশ্রী মা শ্রীশ্রী বাবাকে ‘বাবা’ বলতেন। শ্রীশ্রী বাবা শ্রীশ্রী মাকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করতেন। সেই আলমোড়া থেকে সুরু। কনখলে তার পরিসমাপ্তি। এর মধ্যে শ্রীশ্রী মা কতবার এসেছেন দেওঘরে। শ্রীশ্রী বাবা কতবার গেছেন শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে। তাঁদের উভয়কে আমরা খুব কাছাকাছি থেকে, খুব পাশাপাশি থেকে দেখেছি। যেমন দেখেছি, যেমন অনুভব করেছি তাঁদের আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গতাকে, যেমন পেয়েছি তাঁদের মহামানবরূপে, অতিমানব রূপে, দেবতারূপে, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মরূপে; তেমনি আবার দেখেছি তাঁদের ধূলির ধরণীতে আমাদেরই কাছাকাছি, আমাদেরই পাশাপাশি, আমাদেরই সাথে এক হয়ে আমাদেরই সুখ দুঃখে, হাসিকান্নায় দোলায়িত হতে। শ্রীশ্রী বাবা ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কনখলের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার পর কলকাতায় কিছুদিন অবস্থান করে দেওঘর এসে ৬ই জুন রবিবার মহাসমাধি লাভ করলেন। তারপর থেকে প্রতিনিয়তই আমরা আমাদের সাধ্যাতিত ভাবেই প্রয়াস করেছি সেই মধুর সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে অক্ষুন্ন রাখার জন্য। পরম করুণাঘন স্নেহময়ী শ্রীশ্রী মাও আপন মাধুর্য ও করুণায় তা পরিপুষ্ট রেখেছেন। সেই পথ ধরেই, সেই প্রাণের পরশেই, সেই স্নেহের আকর্ষণেই আজ দেবাদুন আসা।

কথা ছিল শ্রীশ্রী গুরুপূর্ণিমার পর ৯ই জুন কলকাতা হতে দেবাদুনের পথে রওনা হব। পানুদার মাধ্যমে শ্রীশ্রী মাকেও এ সংবাদ জানান হয়েছিল। কিন্তু হলনা। যাত্রার ঘটনাক্ষণেই আগে সে প্রোগ্রাম বাতিল হল। কারণ সংসারের মতন আশ্রমও একটা বন্ধন। তাই অনেক চেষ্টা করে সে বন্ধন থেকে বের হয়ে আজ এখানে এসেছি।

(ক্রমশঃ)



সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

(দুই)

— ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী

রানী চন্দর 'পূর্ণকুন্ত' বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখিকা রবীন্দ্রনাথের স্নেহন্যা। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ধারায় পালিতা রানী চন্দর রচনায় ঘটেছে অমৃত-বর্ষণ। ছোট ছোট কথায়, দু একটি কথার-রেখায় সমস্ত পরিবেশ এবং মানুষদের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বেঁধে দিয়েছেন এই মহিলা কথা-শিল্পী।

১৯৫০ এর পূর্ণকুন্তযোগ ঘটেছিল হরিদ্বারে। হৃদিকুন্তকে অমৃতে বোধ করি যথার্থই পূর্ত করেছেন তিনি। ফেরার পথে হরিদ্বার থেকে এসেছেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনেই মায়ের চকিত-দর্শন পেয়েছিলেন। তারই অপরূপ রেখাচিত্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী রানী চন্দ। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে মায়ের অতি আদরের হরিবাবার প্রসঙ্গও পাঠকের ভাগ্যে অতিরিক্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়েছে।

খুঁজতে খুঁজতে আনন্দময়ী-মার আশ্রমে আসি। দরজা পেরিয়ে আমরাও ভিতরে ঢুকেছি কি একদল মহিলা হুড় হুড় করে সেই দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যেতে বড়দিকে বলি, 'চলো, ভিতরে যাই।'

বড়দি বললেন, 'আর ভিতরে গিয়ে কী করব ? আনন্দময়ী-মা তো বেরিয়ে গেলেন।'

আনন্দময়ী-মা ! ওঁদের মধ্যে ? কোন জন ? ঐ যেন সাদা ধূতি পরা লাগব্যবতী এক বয়স্কা, তিনিই কি ?

বড়দি মাথা ঝাঁকলেন, বললেন, ফোটো দেখেছি অনেক, তাতেই চিনতে পারলাম।

আশ্চর্য ! সাজে সজ্জায় কোনো তারতম্য নেই। কেবল মুখখানি আকৃষ্ট করে শতেক ভিড়ের মাঝেও। বলি, চলো বড়দি, কোথায় গেলেন অত দলবল নিয়ে গিয়ে দেখি।

মনে হতেই ছুটি দলের পিছনে। কাছেই হরিবাবার আশ্রম। সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একখানা ঘরের সামনের একফালি ছাদে এসে জড়ো হই। এইটুকু জায়গায় কজনই বা ধরে, বাকি সব কেউ সিঁড়ি ধরে ঝুললেন, কেউ নীচে দাঁড়িয়েই উর্ধ্বমুখী হয়ে রইলেন। ভিড়ের আগে জায়গা নেবার কায়দা জানা থাকলে কত সুবিধে !

সামনের ঘরখানা হতে ঋষিতুল্য হরিবাবা বেরিয়ে এলেন। গেরুয়া আলখাল্লা, গায়ে কী রূপ, যেন এক ঝলক আলো এসে পড়ল সেখানে। আনন্দময়ী মা থালায় সাজিয়ে উপহার এনেছেন — গেরুয়া বস্ত্র, ফলফুলের ডালা। আজ হরিবাবার জন্মদিন। হরিবাবা হাসিমুখে বস্ত্র ফলফুল গ্রহণ করে ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন, এখানে তো সকলের স্থান অকুলান হবে, নীচে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি আসছি এখনি। কীর্তন হবে।

অনেকের কাছে হরিবাবার কীর্তনের কথা শুনেছি, যাচ্ছ ওখানে পার তো হরিবাবার কীর্তন শুনে এসো। শোনবার মতো জিনিস। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, হঠাৎ কেমন সব কিছু যোগাযোগ হয়ে সুযোগ ঘটে গেল।

হরিবাবা नीচে নেমে এলেন। অন্যরা আগেই তৈরি ছিলেন খোল করতাল নিয়ে। হরিবাবা মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাত জোড় করে দম নিয়ে আরম্ভ করলেন, ‘রা-।-।-।-’। এই ‘রা’ থেকে আর এক দমে ‘ধা’ পূর্ণ করতেই কেটে গেল পুরো দশ মিনিট। এক একবার এইরকম দীর্ঘস্বরে ‘রা-ধা’ নাম পূর্ণ করেন আর এক-এক পর্দা সুর চড়িয়ে ধরেন। চড়তে চড়তে যখন শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছল তখন আবার তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনতে আনতে অতি-মৃদুতে নিয়ে এলেন। এখন সুরের দীর্ঘতা কমিয়ে দ্রুততালে নাম ধরলেন। দোহাররা খোল করতাল বাজাতে লাগল। হরিবাবা একটা কাঁসরঘণ্টা হাতে তুলে নিলেন; ধীরে ধীরে আবার সুর চড়তে লাগল, তাল দ্রুততর হল। সেই তালে ঘুরে ঘুরে হরিবাবা তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে চললেন। দেখবার মতো এই নাচ, ভঙ্গি। সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে নাম গাইছেন; আবার এই শক্তিরই রাশ চেপে ধরে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে দুলিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। এ যে পাগলের আত্মভোলা উন্মত্ততা। নাচে গানে তুমুল তান্ডব; অথচ সম স্থির, যেন সুতোয়-গাঁথা নিখুঁত পরিপাটি মালা একগাছ।

পথে এসে বড়দি বললেন, ‘একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছিলে কি, প্রথম “রাধা” নামের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন হরিবাবার মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল। কী অদ্ভুত শিহরন নামের!’

মনে পড়ছে সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা। বৃন্দাবনের আশ্রমে মা বসে আছেন ছাদ-সংলগ্ন বারান্দায় তত্ত্বপোশে। হরিবাবার প্রসঙ্গে মা বেদনাতুর। হরিবাবা চলে গিয়েছেন। তিনি আর নেই। মা বার-বার তাঁর এই বৃদ্ধ সন্তানটির জন্য খেদ করছেন। জগজ্জননীর সেই আশু আকর্ষণের কী বিচিত্র প্রকাশ!

বৃন্দাবন পরিক্রমা সেরে রানী চন্দ এসেছেন বেনারসে। বেনারসে আসবেন, আর মায়ের আশ্রমে আসবেন না, তাও কি হয়?

কাশীতে বিকেলবেলা গঙ্গায় নৌকায় চড়ে বেড়ানো রেওয়াজ একটা। যে আসে, সকলেই একবার নৌকায় চেপে গঙ্গার হাওয়া খায়; অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গাকে ঘিরে যে কাশীনগরী, তার শোভা দেখে।

আজ যাব, কাল যাব, করে হয় নি এতদিন। এখন সুযোগ ঘটল, সুবিধেও হল। আনন্দময়ী-মার আশ্রম এখানে, কাশীর প্রায় অপর প্রান্তে। গঙ্গার বুকে উঁচু বাঁধানো ভিতের উপরে দোতলা প্রাসাদ। এক পাশে একটি মন্দির। এই কিছুদিন আগে আনন্দময়ী-মা বিরাট সাবিত্রীযজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করেছেন; সেই ধূনির আগুন এখনো জ্বলছে মন্দিরে। গত এক বছর নাকি সমানে জ্বলছে যজ্ঞসাজ উপলক্ষে। প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচজন মহাত্মাকে বরণ করেন আনন্দময়ী মা। সেই পাঁচজনের একজন ছিলেন ‘হরিবাবা’।

আঙিনার সামনের মণ্ডপে বাসন্তী প্রতিমা, বহু লোক এসে জমেছে সেখানে। গঙ্গার ধার ঘেঁষে একটা জায়গায় সুড়ঙ্গের মতো সিঁড়ি নেমে গেছে। নীচে। জোড়া জোড়া জুতো আছে বাইরে পড়ে। আমি বড়দিও নেমে যাই তাদের নিশানা করে।

প্রকাণ্ড এক হল। গঙ্গা হতে যে উঁচু ভিত উঠে গেছে উপরে তারই গায়ের ভিতর এই লম্বা ঘর। নামতে নামতে মনে হয় যেন নেমে এলাম গঙ্গাতেই। হল হল শব্দ করে গঙ্গা দেয়াল ছুঁয়ে যেতে যেতে।

গ্রীষ্মকালে না জানি কত ঠাণ্ডা থাকে এখানটা। ঘরের চার দিকে দেয়ালভরা আনন্দময়ীর ফোটো। কখনো তিনি ফুলের মালা চুড়ায় জড়িয়ে বাঁশি হাতে কৃষ্ণবেশে, কখনো নানা অলংকারে ভূষিতা রাজরানীর মতো সিংহাসনে; কখনো ভাবে বিভোর দু পা দাওয়ায় ছড়িয়ে, কখনো বা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ‘গুরুপ্রিয়া’র দিকে তাকিয়ে। এর মধ্যে একখানা ছবিই বড়ো ভালো লাগল চোখে — সমুদ্রতীরে হেঁটে আসছেন আনন্দময়ী-মা, টেউয়ে ভিজে যাচ্ছে পায়ের পাতা, ভিজছে শাড়ির লাল পাড়, এলোমেলো উড়ছে মাথার খোলা চুল, সহজ ভঙ্গি, স্বাভাবিক হাসি, গ্রামের মেয়ের মতো দু-ফেরত দিয়ে আঁটসাঁট পরনের শাড়ি।

বড়দি বললেন, ‘ইনি তো আমাদের গ্রামেরই বউ, সাদাসিধে, অশিক্ষিতা, যেমন হয় আর কি সচরাচর। শ্বশুরবাড়ি এসেছেন, রাঁধতে বাড়তে ভাবে বিহুল হয়ে যান, বাসি কাজের পাট পড়ে থাকে, উনুনে তরকারি পোড়ে, খেয়াল থাকে না তাঁর কিছুতে। সবাই বললে, পাগল বউ। অসন্তোষ ছড়ায় তাদের মনে। কার ভিতরে কী সাধনা সঞ্চিত থাকে কে জানে? পূর্বজন্ম বিশ্বাস করি কি সাথে? নয়তো ঐ গ্রাম্য বউ কিসে এমন হল যে, দেওঘরের বালানন্দ স্বামীর কাঁধে চেপে বসে। বালানন্দজী হেসে বলেন, বেটি তো সিংহবাহিনী হ্যাঁ।

সাহিত্যশিল্পীদের দৃষ্টিতে মায়ের রূপ কিভাবে ধরা পড়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এই পর্যায়টি সমাপ্ত করার পূর্বে আর একজন সাহিত্যিকের সুখান্ধরা ভাষায় বৃন্দাবন আশ্রমের তথা মাতৃ-স্মৃতির যে অনন্য সাধারণ রূপ বর্ণনার প্রকাশ ঘটেছে তা স্মরণীয়। শঙ্কু মহারাজ ‘তাঁর বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা’র অমৃত-প্রবাহে বাঙালী রসিকচিহ্নের গ্রন্থিবন্ধন করেছেন। ‘মধু বৃন্দাবনের’ পথে যে মধু তিনি আহরণ করেছেন তা সর্বকালের বাঙালী সমাজকে গভীর ঋণে আবদ্ধ করেছে। এ কালের বৃন্দাবনের দর্শনীয় স্থলের ব্যাপ্তি ও বিস্তার ঘটেছে। এখন শুধু ‘গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনে’ই তা সীমাবদ্ধ নয় বা ষড়গোস্বামীর সপ্তদেবালয়েই তার পরিসমাপ্তি নয়। ‘কুঞ্জ’, ‘কুণ্ড’, মিলগুলিও দর্শনীয়। এ প্রসঙ্গটি শঙ্কুমহারাজ যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তিনিও বর্ণনীয় বিষয়টি শাস্ত্রী মহারাজের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। এই শাস্ত্রী মহারাজের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ‘শ্রীশিখর বসন্ত গোস্বামী শাস্ত্রী, বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য এবং এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম। ষড়গোস্বামীদের মন্দিরের অতিরিক্ত আর কি কি মন্দির দর্শন করা উচিত? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শাস্ত্রীজীর নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেছেন শঙ্কু মহারাজ।

“শ্রীধাম বৃন্দাবনে চার হাজারের উপর মন্দির আছে, তার মধ্যে প্রায় হাজারখানেক মন্দির উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোনো যাত্রীর পক্ষেই এত মন্দির দর্শন করা সম্ভব নয়। তবে গৌড়ীয় সপ্তদেবালয় ছাড়া আরও অন্তত আঠারোটি মন্দির প্রত্যেক যাত্রীর দর্শন করা কর্তব্য। শাস্ত্রীজী উত্তর দেন।

কি কি, বলুন না।

শাস্ত্রীজী আঙুল গুনে বলতে থাকেন, “শ্রীগোপাল রাধাবল্লভ বন্ধুবিস্তারী বিশ্বমঙ্গল শাহজী মহাপ্রভু মীরাবাই তাড়াশ কাত্যায়নী অষ্টসখী চৌষটি-মহাস্ত রঙ্গজী জামাই-বিনোদ অমিয়-নিমাই ব্রহ্মচারী জয়পুর ও লালাবাবুর মন্দির এবং আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম।”

অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিক্রমায় মা আনন্দময়ীর আশ্রম অবশ্য দর্শনীয়। ‘অবশ্য দর্শনীয়’ কেন? এই উক্তির উত্তর সন্ধান করেছেন লেখক। ‘মধুবৃন্দাবনে’র সঞ্চিত মধু-ভাণ্ডারে চিরকালের আমন্ত্রণ রেখেছেন তাঁর হৃদয় নৈবেদ্যের এই অপরূপ কথামৃত।

আজ আমরা বৃন্দাবন শহরের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মথুরা রোড ধরে মথুরার দিকে চলেছি। অনেকটা হাঁটতে হবে বলে আজ শোভাযাত্রার গতিবেগ ক্ষিপ্ততর।

ডানদিকে মোদী-ভবন ও বাঁদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। মোদীভবন বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গেস্ট-হাউস। সাহিত্য সম্মেলনের সময় আমরা এখানে ছিলাম।

মোদী-ভবনের পাশেই পথের ডানদিকে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম ও জয়পুরের মহারাজার মন্দির। আশ্রম বললে আমাদের মানসলোকে যে মনোহরী মূর্তিটি ভেসে ওঠে, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম ঠিক তাই। সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই পথের দু-ধারে চমৎকার বাগান। বাগানের পরে নাট-মন্দির ও মন্দির একই সঙ্গে। মন্দিরটির নিচে কয়েকটি কুঠরি আছে। সেখানে সন্ন্যাসীরা তপস্যা ও ভজন করেন।

মন্দিরের পেছনেও বাগান। তারই মাঝে সন্ন্যাসীদের বাসগৃহ, স্কুল ও ছাত্রাবাস। মা এখানে এলে মন্দিরের ঠিক পেছনে কুটিরাকৃতি একটি ছোট বাড়িতে বাস করেন। এখন তিনি কাশীতে রয়েছেন। অল্পকুট উৎসবের পরে বৃন্দাবনে আসবেন। সংযম-সপ্তাহ পালন করবেন।

মন্দির বা ছাত্রাবাস নয়। বাগানের দিকে নজর পড়লেই এ আশ্রমকে অসাধারণ বলে মনে হবে। আর নজর না পড়ে উপায়ও নেই। কারণ, মন্দির ও বাড়ি ক’খানি ছাড়া সবটাই বাগান। বোধহয় কানন বলাই উচিত হবে। সমস্ত আশ্রমটি ছায়া-শীতল শান্তির নীড়। ভেতরে গেলে আপনা থেকেই মনটা ব্রহ্মলোকে চলে যায়, চারিপাশে সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। হৃদয় আনন্দময় হয়ে ওঠে, আর মাকে আনন্দময়ী বলে মনে হয়।

সমকালীন সাহিত্য-সমাজে মাতৃ-মূর্তির যে অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে তা আমাদের যুগ ও জীবনে তথা বর্তমান কালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বলতায় চির-ভাস্বর।



শ্রীমুখে শ্রীশ্রী মায়ের জীবন

— শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রী মা নিজের সত্যনিষ্ঠার কথা শ্রীমুখে বলেছেন — “একবার এক আত্মীয় আমাকে পায়ের একটা রূপার গহনা দিয়াছিল, আমি পুকুরে গিয়া তাহা খুলিয়া পাড়ে রাখিয়া ছিলাম, তথায় যে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকেও আমি চিনি। আমি উহা ওখানেই ফেলিয়া চলিয়া আসি। বাড়ি গেলে ঐ গহনা মা আনিবার জন্য আমাকে আবার পুকুরে পাঠাইয়া ছিলেন। গিয়া দেখি সেখানে তাহা নাই। আমি বাড়ি আসিয়া মাকে বলিলাম, “মা একজনে পায়ে দিবার জন্য নিয়া গিয়াছে।”

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ছেলে বেলায় নিজের নানা অদ্ভুত আচরণ প্রসঙ্গে নানা কথা বলে গেছেন। “যখন দুঃখের ভাব দেখাইতে হইবে তখন শরীর দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইত। যখন লজ্জার ভাব দেখাইতে হইবে, তখন শরীর দিয়া লজ্জার ভাবই প্রকাশ হইয়া যাইতেছে। এমন সব কাণ্ড হইয়া যাইত। ছোটবেলায় যেমন সোজা সরল থাকিতে হয় শরীরটা দিয়া সেই রূপ হইয়া গিয়াছে। আমি যেন সব দেখিয়া যাইতাম। আবার বউ সাজিলে যেমন হওয়া দরকার তেমনই হইয়া গিয়াছে দেখিতাম। যখন যাহা হওয়া দরকার শরীরটা দিয়া তাহা হইয়া যাইতেছে। কীর্তনের সময় যখন শরীরটা পড়িয়া থাকিত। আমি দেখিতাম শরীরটা পড়িয়া আছে। কীর্তনে যাহারা বসিয়া আছে, দেখিতাম সবই যেন আমি। এ সময় গানের শব্দ যতদূর যাইত, মনে হইত সেই শব্দও যেন আমি। এমন কি তাহাদের ভাবগুলিও যেন আমি। খোল-করতালও যেন আমি। এমনই একটা অবস্থা হইয়া যাইত। শিশুকাল হইতে কোন কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য এ শরীরের এমন একটি প্রকাশ হইত যে ইহা আছে কি নাই এবং কোথায় বা নাই। আবার সাময়িক শরীরও গায়েব।

“এ শরীরটা সর্বদাই বলে। যে যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থা থেকেই কর্তব্য কর্ম করে যাও। এ সংসারে মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাকো। মালিক হলেই যত গণ্ডগোল। এই সংসারটা ভগবানের। আমি সেবক মাত্র এবং তাঁর নির্দেশ মত শুধু সেবা করে যাবো। এই ভাবটা রাখা। তাহলে গৃহস্থশ্রমেও নূতন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। আর ভগবানের সেবা জ্ঞানে জগতে সকলেরই সেবা করার চেষ্টা করে যাওয়া। এইটাই ত মানব জীবনের মহাব্রত।”

মা দেবদুর্লভ কণ্ঠে গাইছেন :

দুর্লভ ভজন হেন
নাহি ভজ হরি কেন
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম
নাহি দেখ বেদ ধর্ম
ভক্তি কর কৃষ্ণ পদ দ্বন্দ্ব ॥

আনন্দময়ী মা বলেছেন, “এ শরীর আগেও যা পরেও তা। মাঝে তোমাদের জন্য তোমরা খেলিয়ে নিচ্ছ।”

এক ভক্ত আকুল হয়ে মায়ের জন্ম কথা শুনতে চাইলেন। মা বললেন, “বৈশাখ মাস, বৃহস্পতিবার, রাত্রি অবসানের দিক দিয়া। ব্রাহ্মমুহূর্ত স্পর্শে, খেওড়ার এক ছোট্টঘড়ের ঘরে তোদের দৃষ্টিতে এই শরীরটা। প্রায় পূর্ব উত্তর কোণের দিকে মাথা। শরীর কিন্তু তোদের দেখায় সেই সময়, মাথা উপরের দিকে একটু গতি—বলিতে-বলিতে মা চুপ, কেমনই এক ভাব। পরে বলিলেন—রকমারিটা আর কি। একটু থামিয়াই হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “হ্যাঁ, ঐ সময়ই কিন্তু ঘরের চালের ফাঁক দিয়া আকাশ ও নিম্ন গাছের ডাল পাতাগুলিও বেশ সুন্দর দেখাইতে ছিল। যেমন তোকে উপস্থিত দেখা। [স্বক্ৰিয় স্বরসামৃত (পঞ্চম ভাগ) সপ্তম অধ্যায়, পৃ: ১২৪]

মা জন্মের পর কাঁদেন নি। পরবর্তী কালে মা বলেছিলেন, “কাঁদবো কেন? আমি যে তখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে আম গাছ দেখছিলাম।”

আনন্দময়ী মা এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, “ঘরে তো আর ঐ সময় অপর কেহ ছিল না। ইতিমধ্যে শরীরের ঠাকুরমার আপন খুড়ীমা তাড়াতারি আসিল। উপস্থিত দেখিয়া শুনিয়া পরে তাহার কোলে।”

মায়ের ঠাকুরমার এই খুড়ীমা তখন প্রায় বৃদ্ধাই। তিনি বড় নিষ্ঠাবতী এবং শুদ্ধ ভাবাপন্ন স্ত্রীলোক ছিলেন।

দিদিমা তুলসী গাছ স্পর্শ করবেন না তাই তিনি তুলসী তলার মাটি মায়ের গায়ে মাখিয়ে দিতেন। মা বড় হলে নিজে তুলসী তলায় গড়াগড়ি দিয়ে আসতেন। একদিন মা আর দিদিমা পাশাপাশি বসে ছিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন—“মা, পাউডার মাখাইয়া দিবে নাকি গো? তুলসীতলার মাটিই হইল এ শরীরের পাউডার।” বেশ! দিদিমা তুলসীতলায় ঐ সময় ধূপ প্রদীপ দিতে বলিলেন বটে কিন্তু লেপিতে বলেন নাই। কাজেই তুলসীপত্র বৃক্ষের তলায় বিছান থাকা স্বাভাবিক। সেই তুলসী পত্রের বিছানায়ই মার প্রথম শয়ন। তুলসী শাখা পত্র সব মস্তকোপরি। মাটিতে মুক্ত আকাশের তলে।” (ঐ পৃ: ১৩৩)

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা তাঁর প্রথম নামকরণ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। গ্রামের এক ব্রাহ্মণ তাঁর জন্মের পরের দিন তাঁকে দেখতে এসে নাম রাখেন। শ্রীশ্রী মা বলেছেন, “পরদিন প্রাতে ঐ গ্রামেরই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নাম দীননাথ ভট্টাচার্য। শরীরটাকে দেখতে আসে তো। ঠাকুরমা ঘরের দরজায় যাইয়া হাঁটু গুঁজিয়ে বসিয়া শরীরটাকে কোলে করিয়া তাহাকে দেখায়। সেই সময়ই ঐ ব্রাহ্মণ শরীরের নাম রাখিল ‘দাম্ভায়নী’। তখন শরীরের মাথা ঠাকুরমার হাঁটুর উপর পূর্বদিকে। ঘরটির দরজা পূর্ব দিকে ছিল। উর্ধ্ব দিকে একটু চাহিতেই চোখে পড়িতে ছিল কয়েকটি গাছের

ডালপাতা আকাশ ইত্যাদি কত কি।” (ঐ পৃ: ১৩৭)।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে এক অসাধারণ দার্শনিক তত্ত্ব ভক্তদের বললেন — “ছোট সময় এ শরীর ছুটাছুটি করিত। শরীরের মায়ের নিষেধে বন্ধ হইল। কি করিয়া বলে এ শরীর? এখনও যেমন তোমাদের এ শরীরটি বড়, কাপড় পরা, দেখাদেখি বলা ব্যবহার ইত্যাদি। ঠিক সেই ভাবেই এই শরীর ঐ ছোট্ট নেংটাই তো। ঐ ভাবেই সব কিছু দেখা। ঐ রকমারি গুলিও। এই যে, ঐ যে দেখা - একই তো, আছেই। নূতন পুরাতন তোমাদের দিক দিয়া যা বল। এ শরীরটাও এষে দেখা। তোমাদের বলা হইতেছে, তোমাদের দৃষ্টিতেও ঐ সময়ে, ঐ রকমে। তোমাদের দৃষ্টি আর এখানে (মা নিজেকে দেখাইয়া) এ কি দুই? একই তো। কিছুই বাদ যায় না - দুইয়েতে এক। একেতে ঐ দুইও। অবাধ যাহা, আছেই, যেখানে যেইটি অবশ্য কথা ইত্যাদি ব্যবহার ঐ সময় তোমাদের দৃষ্টিতেও যে রূপটি। সেই দেখাশুনা সেই স্থির স্থিতি, বায়ুমণ্ডলও সবই সবেতে তো। এ শরীরের তো তখনও যা, এখনও তা-ই, তা-ই, এই। দৃষ্টি বল, দৃষ্টি অদৃষ্টির প্রশ্ন নাই। যা বল তাই, সেখানে সব সম্ভব। খানাখানের সময় অসময়েরও স্থান কোথায় ভাব।” (পৃ: ১৩৭-১৩৮)

শ্রীশ্রী মা বলছেন, “একটা স্থিতি গেছে যখন মাটিতে শোয়া আর খাটে শোওয়ার তফাৎ বোধই থাকত না। পরমার্থ কথায় ও ব্যর্থ কথায় বিশেষ ভেদ মনে হোত। এমন কি জাগতিক আলাপ শুনলে বিদ্যুতের শকের মত এ শরীর অবশ হয়ে যেতো। এ শরীরের সাধনার সময় এমনই হয়েছিল যে কৃচ্ছ সাধনার ফলে যেমন ঋষিদের কৃশ শরীর হয়ে যেতো, সেইরূপ এই শরীরও অস্থিচর্মসার হয়েছিল। কিন্তু কোন ক্লান্তি নাই, হাঁফ ধরা নাই। সোমবার ও বৃহস্পতিবার শুধু আহার।”

ছেলেবেলাতেই মা খুব সুন্দর রান্না করতে পারতেন। তিনি কেমন করে শিখেছিলেন সেই প্রসঙ্গে বলছেন: “ঠাকুরমার এক সই ছিলেন। এ শরীর তাঁহাকে চিক্কন দিদি বলিয়া ডাকিত। তিনি নিঃসন্তান ও বালবিধবা। এই শরীরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহার বাড়ী প্রায়ই নিয়া যাইতেন। এই শরীরকে দিয়া রান্না করাইতেন আর বলিতেন যে তুই যা রাঁধিস যেন অমৃত। রান্নার হাতে-খড়ি জগৎ দৃষ্টিতে তাঁহার কাছে হইয়াছিল বলিলেই চলে।”

(ক্রমশ:)



ড০ ত্ৰিগুণা সেনের চিঠি

(স্বামী পরমানন্দজীর নিকট লেখা)

—সৌজন্যে: চিত্রা ঘোষ

কৌসানী, অক্টোবর, ১৯৭২

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু স্বামিজী —

রানীক্ষেতে ৬ দিন থাকিয়া এখানে কাল আসিয়াছি। কোথাও শহরে না থাকিয়া সর্বত্র শহর হইতে ৩/৪ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর Forest Rest House এ থাকার ব্যবস্থা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। নীরব, নিঝুম। Radio, paper নীচের পৃথিবীর সহিত ইচ্ছা করিয়াই সব যোগাযোগের সম্পর্ক ছাড়িয়া চলিয়াছি। Rest House গুলির গরীব চৌকিদার দয়া করিয়া তাহাদের ডাল রুটির ভাগ দ্যায়, পরম আনন্দে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। এখান হইতে পঞ্চচুল্লী, নন্দাকোট, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, গৌরী পর্বত, নীলকণ্ঠ, চৌখান্না মনে হয় একেবারে কাছে। কী অপূর্ব দৃশ্য। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন না জানি তিনি আরো কত সুন্দর, কতো মহান। আজ বুঝিতেছি কী আকর্ষণে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই সুন্দরের পিছনে ছুটিয়াছে। ইচ্ছা হয় আরো কাছে যাই - আরো কাছে পাই। এতো দিন কাজ করিয়া গিয়াছি। কাজের মধ্যে মান ও যশের ভাব থাকিত। ভালবাসার মধ্যে পাত্রাপাত্রের বিচার আসিত - সাধুতার পিছনে থাকিতো ফলভোগের সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা। নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বের স্পৃহাও আসিত। আজ অভিনেতার ভাব ছাড়িয়া শুধু দর্শকের মতন এই যে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, ইহাতে যে কী আনন্দ।

কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন মনে জাগিতেছে—

১. আপনারা বলেন বাহ্যিক সব কিছুই অনিত্য অস্থায়ী। এর জন্য আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। তবে 'মা'কে পাইতে, তাঁহার চরণ ছুঁয়া প্রণাম করিতে মন যে ব্যাকুল হয়, তবে কী করি ?
২. মা বলেন 'সেবার ভাব নিয়া চলিও, আর সব জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন ভাবিও'। যে নিজের ভিতর ঈশ্বর দেখিলনা সে কী করিয়া সকলের মধ্যে ঈশ্বর দেখিবে ?
৩. কী করিয়া প্রকৃত ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় ?

লম্বা চিঠি। স্নেহগুণে ক্ষমা করিবেন না ? তবে কেনো, পরম-আনন্দ ?

প্রণাম।

— ত্ৰিগুণা সেন

শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম

— সঙ্কিতা সেনগুপ্ত

ঢাকার প্যারীবানুর বাগ,
মায়ের লীলার শাহবাগ।
রমনা,
মন হয়ে যায় আনমনা।
সিন্ধেশ্বরী,
সেথায় মা রাজেশ্বরী।
খেওড়া,
সবার মনে আনে আনন্দের পসরা।
আগরতলা,
রাজারা পেলো মায়ের স্নেহের তলা।
তারাপীঠ,
সিদ্ধি হয় ঠিক ঠিক।
গঙ্গার কূলে আগড় পাড়া,
মাকে ডাকলে দেয় সারা।
রাজগীর,
সেথায় আছেন মায়ের সাথে বুদ্ধদেব
আর মহাবীর।
রাচী,
মায়ের অমৃত কথার বিচি (বীজ)।
পুরী,
সমুদ্রে বাঁধা আছে মায়ের তরী।
কাশী আর উত্তর কাশী,
সেথায় মায়ের ফুল হয় না বাসী।
হরিদ্বার,
যেতে ইচ্ছা করে বার বার।
গেলে কিশোরপুর,
দেখতে হয় মায়ের রায়পুর।

কল্যাণ বনে,
সব দেবতা একাসনে।
নৈমিষারণ্য,
সেথায় নাই কোন বৈষম্য।
বৃন্দাবন,
মায়ের জন্য হয় চঞ্চল মন।
দিল্লী,
মায়ের আলোর বিজলী।
বিন্ধ্যাচল,
গাইবো সেথায় হরিবোল।
কেদার,
ঘুড়ে আসবে একবার।
আলমোড়া,
ভাইজীকে পায় তারা।
ধবল চীনা,
কৈলাশের রাস্তা হয়ে যাবে চেনা।
ভূপাল,
আশ্রমের দাদা, দিদিরা মায়ের গোপাল।
পুণা,
সর্বদা মায়ের কথা শোনা।
ভীমপুরা,
সেথায় থাকেন সাধক যাঁরা।
মা বলেন, জগৎ ভরাই এ শরীরের
আশ্রম,
মিছিমিছি কেন করিস শ্রম?
এ শরীরটা উড়ো পাখী
মিলে মিশে থাক, সংকাজ
রাখিস না বাকী।



আমার মা আনন্দময়ী

— বিশুদ্ধা

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান সেবিকা আমাদের প্রিয় “দাদাভাই”, শ্রদ্ধেয় ভাইয়া, অগ্রজ প্রতিম ব্রহ্মচারী শৈলেশদা ও কন্যাপীঠে আমাদের শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া রেনুদি ও সতীদি অনেকেই বলেছেন, ছোট বেলা থেকে মাকে যেমন দেখছো তা লিখে ফেলো। কিন্তু লিখতে বসলেই কেবল ভয় হয় মার কথা লিখতে গিয়ে নিজেকে জাহির করে মাকে গোঁণ করে ফেলবো না ত? এই আশঙ্কায় বার কয়েক চেষ্টা করেও এতদিন লেখা হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু বছর কয়েক আগে হঠাৎ মেনিন্জাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দেখছি recent past অনেক কিছুই ভুলে গেছি। মায়ের অসীম কৃপায় মাতৃ বিষয়ক বহু পুরনো ঘটনা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। ভাবলাম এগুলো মনে থাকতে থাকতে লিপিবদ্ধ করা দরকার, নয়তো কবে দেখবো এও ভুলে গেছি। তাই লিখতে বসা।

আর সত্যি কথা হলো আমার জন্ম জন্মান্তরের বহু পুণ্য ফলে মার কোলে বড় হবার সুযোগ পেয়েছি - মা আমাদের কত আদর করেছেন, শাসন করেছেন, লীলা করেছেন। সে সব লিখতে গেলে আমার নিজের কথা ত কিছু আসবেই, আমি কি করতে পারি?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি —

(মাগো) আমারে যেন না করি প্রচার

আমার আপন কাজে,

তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ

আমার জীবন মাঝে।

আমার জন্মের কিছুদিন আগে শ্রীশ্রী মা, বাবা ভোলানাথ, ভাইজী, খুকুনীদি, আমার দিদিমা বিরাজমোহিনী দেবী প্রভৃতি আসামে নওগাঁয় গিয়েছিলেন। স্টেশন থেকে আমার বাবা শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কাকাবাবু শ্রী ধরণীমোহন ভট্টাচার্য্য, দাদারা ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন সহ শোভাযাত্রা করে আমাদের বাড়ীতে মাকে নিয়ে আসেন। ২/৩ দিন মা সেখানে ছিলেন। যাবার সময় শ্রীশ্রী মা আমার দিদিমাকে আমার মার কাছে রেখে যান। ভাইজী দিদিমাকে বলেন — ‘বিরাজদি, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে মা এসে ঘুরে গেলেন, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, আপনি আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবেন।

তারপর আমার জন্মের পর দিদিমা চিঠি লিখে দিন ক্ষণ জানান। ভাইজী আমার কুষ্ঠী বিচার করে দিদিমাকে জানান - এর পাঁচটি শুভ যোগ ও তিনটি দোষ আছে, তবে আদ্য অক্ষর ‘অ’ দিয়ে নাম দিলে দোষ গুলি কেটে যাবে। ভাইজী আমার নাম-করণ করেন ‘অম্বিকা’। বাবা অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে নাম রাখেন ‘গায়ত্রী’। পরে যখন কন্যাপীঠে আসি তখন সেখানে গায়ত্রী নামে আর একটি মেয়ে থাকায় মা নাম দেন ‘বিশুদ্ধা’। সে আর এক বৃত্তান্ত।

আমার বাবা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজের) শিষ্য ছিলেন। বাবা কীর্তন সং-সঙ্গাদি খুব ভালবাসতেন। প্রতি সন্ধ্যায় বাড়িতে নাম কীর্তন ও রাতে সদগ্রন্থ পাঠ করতেন। একদিন উদ্বোধন পত্রিকায় পড়েন - শ্রীশ্রী সারদা মা জনৈক ভক্তকে বলছেন - ‘কাশীতে মাছি মরলেও মুক্তি’। ব্যাস বাবার মন ছুটলো কাশীর দিকে। তখন বাবা নওগাঁয় ভালো চাকরী করেন, বাড়িঘর বাগান, আমরা ছোট-ছোট স্কুলে পড়ি, সব ছেড়ে কাশী যাবার জন্য প্রস্তুত দেখে প্রতিবেশীরা বললেন — আপনি আগে কাশীতে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে পরে সকলকে নিয়ে যান। বাবা বললেন — পিছু টান রেখে ধর্ম হয় না, কাজেই সবাইকে নিয়েই কাশী রওনা হবেন।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রণালী বাবার বিশেষ প্রিয় ছিল, এজন্য বড়দাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ দেওঘরে এবং ছোড়দা, মেজদা ও দিদিকে দেবাদুনে শ্রী আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ ও কন্যাপীঠে পাঠিয়ে ছিলেন। আসাম থেকে কাশী যাবার সময় মা, বাবা, আমি ও ছোট দুই ভাই ছিল।

১৯৪৪ সনে তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মনে আছে নওগাঁ থেকে কাশী পৌঁছতে আমাদের ১৪/১৫ দিন লেগেছিল। কারণ ট্রেন ভর্তি শুধু মিলিটারী যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে কোনও ট্রেন খালি থাকলে সাধারণ যাত্রীরা যেতে পারছে। কাজেই এরকম অনিয়মিত ব্যবস্থার জন্য কে কখন কোথায় পৌঁছবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যাই হোক আমরা শেষ পর্যন্ত কাশীতে পৌঁছলাম। কাশীতে কোথায় গিয়ে থাকবো ঠিক না থাকায় প্রথম হর সুন্দরী ধর্মশালায় উঠলাম, পরে পাতালেশ্বরে একটা ভাড়া বাড়িতে ছিলাম।

সেই সময় কাশীতে মার আশ্রম হয় নাই। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা ভাড়া বাড়িতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী উমেশানন্দজী, শ্রী নিশিকান্ত মিত্র, শ্রী শচীকান্ত ঘোষ ও তাঁর মেজদি মনোরমা দেবী প্রভৃতি ছিলেন। বাবা প্রায় রোজই সেখানে আমাকে নিয়ে যেতেন। মায়ের কথা ও নানা সংপ্রসঙ্গ আলোচনা হতো। অখণ্ডানন্দজী পূর্বাশ্রমে শ্রী শশাঙ্ক মোহন মুখার্জী আসামে নওগাঁয় সিভিল সার্জন ছিলেন, তখন থেকেই বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল। শচীদাদু ও কিছুদিনের জন্য নওগাঁয় আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীর পরিবেশ তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। বলেছিলেন — ‘নগেনদা আপনার বাড়ীটাই ত একটা আশ্রমের মত, আপনি ছেলেমেয়েদের যে রকম ধার্মিক পরিবেশে রেখেছেন ওদের আশ্রমে দিন আরো ভাল হবে। অখণ্ডানন্দজী আমাকে বলতেন — ওগো তোর বাবা এইখানে আনছে ক্যান জানস্? বনবাসে দিব, আশ্রমে পাঠাইব। বাবার আশ্রম প্রীতির কথা তিনি ভালই জানতেন। সকলের অকুণ্ঠ স্নেহ পেয়েছি।

শ্রীশ্রী মা তখন প্রায়ই কাশীতে আসতেন। আশ্রম না হওয়ায় মা কোন ধর্মশালায় কিন্না গঙ্গাবক্ষে বজরায় থাকতেন। মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী ননী ভট্টাচার্য তখন কাশী স্টেশন বাংলাতে ছিলেন। কখনো তাঁর বিরাট বড় লনে মার জন্য তাঁবু ফেলা হতো। ২/১ দিন থেকেই মা আবার অন্যত্র চলে যেতেন। ননীদার বাড়ীর তাঁবুতেই মাকে আমি প্রথম দর্শন করি। মনে আছে

আমরা তাঁবুর বাইরে লনে বসে আছি। কিছুক্ষণ বাদে তাঁবুর পরদা সরিয়ে মা বেরিয়ে এলেন। আমাদের ঠাকুরের আসনে মার রাজরাজেশ্বরী ফটো দেখেছি কিন্তু চাক্ষুষ দেখে মনে হলো কী সুন্দর! তাকিয়ে রইলাম। মার খাটে বালিশের পাশে একটা সুন্দর লাল গোলাপ ছিল। ফুলটার থেকেও অনেক সুন্দর লাগছিল মাকে! মা সবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন। আমরা প্রণাম করে চলে এলাম।

কাশীতে বাবা ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করতেন। আমিও সঙ্গে যেতাম। প্রায়ই দেখা যেত মা গঙ্গায় বজরায় ঘুরছেন। মাঝে-মাঝে গঙ্গার ওপাড়ে ছাতা হাতে ঘোরা দেখেই বোঝা যেতো মা ওপাড়ে শৌচ কর্ম করতে গেছেন, খুকুনীদি ছাতা দিয়ে মাকে আড়াল করে দাঁড়াতেন। শুনেছি বারাণসী বিশ্বনাথের স্থান মুক্তিক্ষেত্র, এজন্য অনেকে এপাড়ে বিশেষতঃ গঙ্গাবক্ষে মলমূত্র ত্যাগ করে না। কাশী বিশ্বনাথের জীবন্ত বিগ্রহ রূপে খ্যাত বিরক্ত মহাপুরুষ হরিহর বাবা অসি ঘাটে বজরার উপরে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বসে থাকতেন। শুধু শৌচ কর্মের জন্য রোজ গঙ্গার ওপাড়ে যেতেন।

মা তখন বেশীর ভাগ বিজয়নগর রাজ পরিবারের বিশেষ বজরায় থাকতেন। বাস্ যেই বোঝা গেল মা কাশীতে এসেছেন অমনি আমরা মার বজরাতে গিয়ে উঠতাম। ঐ বজরাটার মাঝখানে চৌকো সুন্দর জায়গাটার চারপাশে মোটা পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল। তার মাঝে মার বসবার ও শোবার জায়গা। আর চারপাশে ঘোরানো বারান্দা যতন সেখানেই ভক্তরা বসতেন।

বজরাতেই সকাল বিকেল সৎসঙ্গের আয়োজন হতো। দুপুরে কোনও চড়ায় বা ঘাটে বজরা নোঙর করে খুকুনীদি মন্ত্রী পিসিমা কিম্বা পরমানন্দ স্বামিজী খিচুরী রান্না করতেন, মাকে খাইয়ে খুকুনীদি চারপাশে থাড়া থাকতাম তাদের পাতায় গরম-গরম খিচুরী পরিবেশন করতেন, সে যে কী দারুণ ভালো লাগতো। খেয়ে গঙ্গায় পাতা ফেলে হাতমুখ ধুয়ে নিতাম। মা যখন বিশ্রাম করতেন তখন মার চারপাশে পরদা টেনে দেওয়া হতো। আমরাও যার-যার জায়গায় বসে শুয়ে বিশ্রাম করতাম। বিকেলে আবার বজরা গঙ্গায় ভাসতো। এপাড়ে তখন ঘাটে-ঘাটে কথকতার ভীড়, ধীরে-ধীরে ঘাটের আর ব্রীজের আলোগুলো স্থলে উঠতো - গঙ্গাবক্ষে বজরায় বসে এই আলোর দৃশ্য অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতো। বিকেলে অনেক ভক্তরা মার দর্শন করতে আসতেন। মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী তখন কেদার ঘাটের কাছে কোথাও থাকতেন। রোজ সন্ধ্যার সময় গৌরাজ ঘাটে একটি নোঙর করা বজরার ছাদে ধ্যানস্থ থাকতেন। মা কাশীতে থাকলে তিনিও মাঝে-মাঝে মার বজরায় এসে মন্দিরা বাজিয়ে মিষ্টি সুরে মাকে গান শোনাতেন। আর আসতেন শ্রী গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি ও সুন্দর স্তব ভজনাদি গাইতেন। তাছাড়া আশ্রমের অভয়দা ও শোভনদা ছিলেন। তাঁরা কীর্তন করে জমিয়ে রাখতেন, কমলদা পাঠ করতেন। কলকাতা থেকে ভক্তরা প্রায়ই আসতেন।

(ক্রমশঃ)



শ্রীশ্রী মায়ের দাক্ষিণাত্য যাত্রা

—শ্রী শিবানন্দ

পুণ্যভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। দেব-দেউলে ভরা এই দেশ দেবতা ও দেবকল্প পুরুষের চির বিহার ক্ষেত্র। তাঁদের বিহারভূমি বলেই এ দেশের প্রতিটি তীর্থের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নদ-নদী, প্রতিটি গিরি অরণ্য পরম পবিত্র এবং এ কারণেই আমরা দেখি সেই সৃষ্টির আদি যুগ হতে সেই ঋষিযুগ হতেই এই ভারতে পরিব্রজনের এত মহিমা। দেবতা ও দেবমানবগণের বিহারের ফলে প্রতিটি তীর্থের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁদের চরণ স্পর্শে পবিত্র। সেই তীর্থ ভ্রমণের ফলে তাঁদের চরণ স্পর্শ পেয়ে আমরাও হয়ে উঠি পবিত্র। আমাদের চিত্ত বিগত-কন্মুষ হয়ে জীবনের ক্ষুদ্রতা হীনতা বিস্মৃত হয়ে ওঠে উদার, ভৌম। আর সে চিন্তেই ‘তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি।’

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীকে যারা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি ছিলেন সমগ্র দেবদেবীর সম্মিলিত বিগ্রহ। তিনি ছিলেন পরম পুরুষের প্রতিমূর্তি। সেই শ্রীশ্রী মা কতিপয় সিদ্ধ মহাত্মাগণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় একবার ঘুরে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থে তীর্থে। এ সব তীর্থ, দেবদেউল, পীঠস্থান, আদি পৌরাণিক যুগ হতেই বিরাজিত। শ্রীশ্রী মায়ের পদ স্পর্শে সে সব তীর্থ আরো একবার পবিত্রাকৃত হন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। মা আছেন পুরীতে—জগন্নাথ ধাম পুরী। শ্রী মায়ের পুরী স্থিত আশ্রমেই দীপাবলীতে শ্যামা মায়ের অর্চনার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রী শ্রী মায়ের উপস্থিতিতে শ্যামাপূজায় তাই যথারীতি দলে দলে ভক্তজন। সাধু-মহাত্মাগণেরও সমাগম ঘটল। একে তো মহাতীর্থ এই জগন্নাথ ধাম, তদুপরি মায়ের উপস্থিতিতে এত সাধু-সন্ত মহাত্মাগণের সমাবেশে সৃষ্ট হল এক স্বর্গীয় পরিবেশ। মহানিশায় সাড়স্বরে সম্পন্ন হয়েছিল শ্যামা মায়ের পূজা মহোৎসব।

পর দিবস শনিবার অন্নকূটের পূজান্তে বৈকালীন সংসন্দের আসরে উপস্থিত মহাত্মাগণ মাকে স্মরণ করালেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা। ‘স্মরণ করালেন’ এই দুটি কথা স্পষ্টতঃই ইঙ্গিত করছে অতীতের কোন ঘটনার দিকে। প্রকৃত পক্ষেই আরম্ভেরও আরম্ভ থাকে। এ ক্ষেত্রে ও তাই হয়েছে। দক্ষিণ যাত্রার প্রস্তাবের সূত্রপাত ঘটেছিল শ্রীশ্রী মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে। সেখানে একদিন সংসঙ্গে বসে তীর্থ যাত্রার কথা প্রসঙ্গে শ্রী হরিবাবা, শ্রী অবধূতজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে মাতৃ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ তীর্থ যাত্রার ইচ্ছার কথা নিবেদন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন — দক্ষিণাপথ দেব দেউলের দেশ। অসংখ্য তীর্থ, অসংখ্য মন্দির রয়েছে দক্ষিণে। মা তো তীর্থের আত্মস্বরূপ, তাই তাঁদের ইচ্ছা মায়ের সঙ্গে তাঁরা একবার সে সব তীর্থে পরিব্রজন করেন।

কল্পলতা মা, কারো কোনো শুভ আকাঙ্ক্ষাই তো অপূর্ণ রাখেন না। তাই তখন মা বলেছিলেন, দেখ, ভগবান কি করেন!

আজ এ কথাই তাঁরা শ্রীশ্রী মাকে স্মরণ করালেন এবং মায়ের অনুমতিও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রার দিনও স্থির হয়ে গেল। আগামী ২১শে অক্টোবর।

শ্রীশ্রী মা দক্ষিণাত্য যাত্রায় যাবেন, এ সংবাদ পেতেই বহু ভক্ত যাত্রায় সম্মিলিত হবার জন্য মা এবং গুরুপ্রিয়া দিদির অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। সুরু হল বিচার পরামর্শ। আলাপ-আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত বার জনের একটি দল মার যাত্রার সঙ্গী হবেন, স্থির হল। এরা হলেন বিশিষ্ট মহাত্মা শ্রী হরিবাবা, স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূত জী প্রভৃতি। মায়ের আশ্রমের স্বামী পরমানন্দজী, শ্রী গুরুপ্রিয়া দিদিও যাবেন। এতদ্বিধি সঙ্গী হলেন কমলাকান্ত, বিভূপদ, কুসুম এবং ফুল্লযুথিকা ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিনী বৃন্দ এবং শ্রী হরিবাবার চার শিষ্য।

কথা বলে শুভস্য শীঘ্রম্। তাই আর কাল বিলম্ব না করে মায়ের যাত্রা হল সুরু। শুভদিন ২১শে অক্টোবর মা যাত্রা পথে পা বাড়ালেন।

এদিকে মায়ের যাত্রার দিন স্থির হতেই ওয়ালটেয়ারে শ্রীশ্রী মায়ের এক অধ্যাপক ভক্তকে স্বামী পরমানন্দজী মায়ের সেখানে আগমন সংবাদ পাঠালেন।

যথাসময়ে শ্রীশ্রী মা সেখানে উপস্থিত হতেই সকলে দেখল সে স্থানের ভক্তবৃন্দ মায়ের যথাযথ অভ্যর্থনার কোন ক্রটিই রাখেন নাই। স্টেশনে বহু স্থানীয় ভক্ত উপস্থিত। মা অবতরণ করতেই তাঁকে সুসজ্জিত এক মোটরে নিয়ে আসা হল সদ্যনির্মিত এক ত্রিতল ধর্মশালায়। দলের অন্যান্য যাত্রীদের আনা হয়েছিল অন্য একটি মেটাডোরে। অবশ্য শ্রী হরিবাবা এবং শ্রী অবধূতজী ছিলেন মায়ের মোটরেই। সে ধর্মশালাতেও ব্যবস্থা ছিল একেবারে নিখুঁত। দেখলেই বোঝা যায় একরূপ ব্যবস্থা প্রকৃত ভক্ত না হলে করা যায় না।

ধর্মশালাতে উপস্থিত হবার প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরেই হঠাৎ মার কি খেয়াল হয়েছিল, মা অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে শ্রী শশধর ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও সঙ্গে নিলেন না। শ্রী শশধর বাবু কলিকাতা হতে শ্রীশ্রীমায়ের এখানে আসার সংবাদ পেয়ে দু'দিন পূর্বেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অকস্মাৎ এই যাওয়ার ব্যাপারে সঙ্গীদের মধ্যে কেহই বিন্দু মাত্রও কিছু জানতেন না। সুতরাং সঙ্গীরা সকলেই বিস্মিত হল।

প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টা পরে মা ফিরে এলেন। শ্রী শশধর বাবুর নিকট জানা গেল যে ঐ সময় কয়েকটি স্থান ঘুরে ফিরে স্থানীয় এক আশ্রম শান্তি আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। মায়ের আগমন সংবাদ তারা নাকি পূর্বেই পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সে আশ্রমের কেহই মাকে কখনো দেখেনও নি। শুধু মাত্র মায়ের কথা তাঁরা শুনেছিলেন। এখন মায়ের এ স্থানে আগমন সংবাদ

পাওয়ার পর তাঁদের মনে নাকি আন্তরিক ইচ্ছা জেগেছিল যদি মা একবার এ আশ্রমে আসেন। অন্তর্যামী মা, তাঁদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই যেন মায়ের অতি আকস্মিক ভাবে সে স্থানে যাওয়া। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, মা যখন তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন কেউ মাকে চিনতেও পারে নি। তাঁরা শশধর বাবুকে নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইনি কে? এদিকে মায়ের প্রতি শশধর বাবুর সশ্রদ্ধ সসম্মান ব্যবহার দেখে তাদের মনে উদয় হয়েছিল, যে আনন্দময়ী মা ওয়ালটোয়ারে এসেছেন, ইনি তিনিই নহেন তো? এবার শশধর বাবুর নিকট মায়ের পরিচয় পেয়ে তাঁদের সে কি উল্লাস। সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমের এক মন্দির কক্ষে মায়ের বসার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সংবাদ পেয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ মায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে করজোরে বলেছিলেন, — “মা, কতশত জন্মের সুকৃতির ফলে আজ তোমার দর্শন পেলাম। মা, আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, তুমি একবার এ স্থানে আস। মাগো, তোমার করুণার শেষ নাই। আমাদের সে আশা তুমি অন্তর্যামী পূর্ণ করে দিলে।”

মা সে স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সমুদ্র উপকূলবর্তী নুলিয়া পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ দেশে সমুদ্রের জেলেদের ‘নুলিয়া’ বলে।

সে স্থানে উপস্থিত হয়ে মা সমুদ্র তটেই একটু উপবেশন করেছিলেন এবং “জয় গণেশ, জয় গণেশ...” কীর্তন আরম্ভ করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল অদূরবর্তী নুলিয়া পাড়া হতে বেশ কয়েকজন নুলিয়া সে স্থানে উপস্থিত হল। ক্রমে ক্রমে তাদের পুত্র কন্যা প্রভৃতিও এসে উপস্থিত। আরম্ভ হয়ে গেল সমবেত কীর্তন, তোমরা গাও, মা বলতেই। পরে নাকি মা “হে ভগবান, হা ভগবান —” এই কীর্তনটিও করেছিলেন। মনে পড়ছে নবদ্বীপে গঙ্গাতটে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনের কথা।

কীর্তন সমাপ্ত হল। মা উঠলেন। তখন নুলিয়াদের চোখে মুখে এক জিজ্ঞাসা ইনি কে? কোথায় থাকেন? শশধর বাবুর নিকট হতে সব সংবাদ সংগ্রহ করে তারা বলেছিল, বৈকালে আমরা মায়ের দর্শনে আসব।

এর পরে মা ফিরলেন ধর্মশালায়। বৈকালে চার ঘটিকা হতে না হতেই স্ত্রী-পুত্র কন্যা সহ বহু নুলিয়া এসে উপস্থিত। আশ্চর্য মায়ের লীলা। এই অশিক্ষিত অবজ্ঞাত নুলিয়াদের ও কী অদ্ভুত শ্রদ্ধা ভক্তি, মায়ের প্রতি কী আকর্ষণ।

আবার শুরু হল কীর্তন। লীলাময়ী মা, লীলাস্থলে ওদের ভাষার অনুকরণ করে কিছুক্ষণ কীর্তন করলেন। পরে ওদেরই কথার অনুকরণে ওদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন কত কথা, কত গল্প। অবশেষে মায়ের হাতের ফলমিষ্টি প্রসাদ পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে বিদায় নিল।

পরের দিন প্রত্যুষেই মায়ের সঙ্গে সকলে গেলেন অদূরবর্তী সিমাচল পর্বত দর্শনে। সিমাচলের

উল্লেখ পুরাণেও মেলে। পুরাকালে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল এই সীমাচলেই। ভগবৎ ভক্তির অপরাধে অসুররাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের ওপরে এ স্থানেই বহুবিধ অত্যাচার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভগবান নৃসিংহ অবতার ধারণ করে এ স্থানেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজো এ স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দিরে তাঁর মূর্তি পূজিত হয়। মন্দিরের পূজারী জানালেন জন সাধারণের জন্য এ মন্দির কেবল মাত্র অক্ষয় তৃতীয়াতেই উন্মোচিত হয় এবং নৃসিংহদেবের দর্শন মেলে। কিন্তু স্থানীয় ভক্তের নিকট মায়ের পরিচয় পেয়ে পুরোহিত সকলকেই অতি যত্ন সহকারে মন্দির অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। বিগ্রহ দর্শন করিয়ে চরণামৃত দিলেন। মন্দিরের সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মন্দির দ্বারে উপস্থিত হতে প্রায় এক হাজার একশটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। সব দর্শনান্তে প্রায় বেলা ১০ ঘটিকায় মা ধর্মশালায় ফিরলেন।

আজ ২৩শে অক্টোবর। আজ মা এ স্থান হতে বেজওয়ালা যাবেন। মায়ের আসা যাওয়ার সংবাদ বোধ হয় বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নইলে আজ প্রভাত হতেই দলে দলে স্থানীয় অনেকেই মাকে প্রণাম নিবেদন করতে উপস্থিত হচ্ছেন। একটা দিনই তো মা এ স্থানে, এরই মধ্যে স্থানীয় জনগণের এত আসা যাওয়া।

মা বেজওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়াণা হলেন। স্টেশনে উপস্থিত হয়েও দেখা গেল সেই চিরন্তন দৃশ্য। প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। মা গাড়ীতে প্রবেশ করার সামান্য সময় পরেই গাড়ীর যাত্রা সঙ্কেত বেজে উঠল। মায়ের আবার যাত্রা শুরু। প্লাটফর্মে বহু লোক উর্ধ্ববাহু হয়ে মাকে পুনঃ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং আহ্বান জানালেন— মা, ফির জলদি আনাজী।

গাড়ী চলছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমশঃ পথ পার্শ্বের বৃক্ষ-লতা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শোনা গেল বেজোয়াড়াও আসন্ন প্রায়। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় মায়ের গাড়ী বেজোয়াড়া এসে পৌঁছাল। মায়ের দরজা খুলতেই দেখা গেল লীলা বেন। এবং আরো কতিপয় ভক্ত প্লাটফর্মে উপস্থিত। তারাই মাকে সাদরে সম্বরণে অপেক্ষারত মোটরে নিয়ে গেলেন এবং অন্যান্য সঙ্গীদের নির্ধারিত মিনি বাসে নিয়ে স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে আনা হল। মায়েরও এ স্থানেই থাকার ব্যবস্থা। তবে মা তো গৃহস্থ গৃহে প্রবেশ করেন না, সুতরাং গৃহের উন্মুক্ত ছাদের ওপরে কাঠ ও কাপড়ের সাহায্যে একটি চালাঘরের মত নির্মাণ করা হয়েছে। সেটাই মায়ের বিশ্রাম কক্ষ। যাত্রার শেষে সেদিন সকলেই ক্লান্ত, সুতরাং সেদিন বিশ্রাম। যথা সময়ে মায়ের ভোগ হয়ে গেল, সকলে প্রসাদ পেলেন।

পর দিবস অতি প্রত্যুষেই মাতৃভক্ত এবং মহাত্মাবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে মাকে দর্শনে নিয়ে যাওয়া হল। কৃষ্ণা নদী সন্নিকটেই। সুতরাং সঙ্গীয় সকলেই সর্ব প্রথম নদীতে অবগাহন স্নান সমাপন করলেন। মা সকলের মস্তকে জল সিঞ্চন করে দিলেন।

স্নান সমাপনান্তে এবার দর্শনের পালা। এ স্থানের বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রসিদ্ধ মহামায়ার মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ ব্যাঘ্রবাহিনী অষ্টভূজা মহামায়া অম্বাদেবী। দর্শনান্তে দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ পূজারীজীর নিকট মায়ের নির্দেশে প্রদান করা হল। অতঃপর দর্শন করা হল শ্রী লক্ষ্মী দেবীর মন্দির। প্রবেশ করতেই দেখা গেল, সে স্থানে সংসঙ্গের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ পূর্ব হতেই এ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। দেখা গেল বেশ কিছু জনতাও সে স্থানে উপস্থিত। মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দিরেই সংসঙ্গের ব্যবস্থা। একটি সুসজ্জিত আসনে মাকে উপবেশন করান হল। অপর দুটি আসনে সঙ্গীয় দুই মহাত্মাও উপবিষ্ট হলেন। ভক্তগণের অনুরোধ মায়ের নিকট হতে কিছু উপদেশ লাভ। মা হরিবাবাকে সে কথা জানাতেই শ্রী হরিবাবা কিষ্কিৎ হরিকথার উপদেশ দিলেন। সংসঙ্গের পর মাকে নিয়ে সকলে প্রত্যাবর্তন করলেন। আজই মা অন্যত্র যাবেন। সুতরাং ভোগ অস্তে সামান্য বিশ্রামের পর মা আবার যাত্রা পথে পা বাড়ালেন। আজ পৌছাতে হবে গুটুর। গুটুর এ স্থান হতে বাইশ মাইলের ব্যবধান।

(ক্রমশঃ)



আশা

— শ্রীমতি মীরা রুদ্র

সংসারের মায়া জালে কি বাঁধনে বাঁধো মা মোরে
 এ বিষম মায়া ডোর ভাঙ্গাও এ ঘুমো ঘোর
 মন চায় সব ফেলে ছুটে যাই তব কোলে।
 সেই শিশুকাল হতে এসেছি তোমার চরণ তলে ॥
 তুমি অনেক দিয়েছ অঞ্জলি ভরে
 জাগতিক সুখ ভরে দিয়ে রাখো আমায় বিবশ কোরে।
 সংসারের পাওনা যত মেটাতে হবে সেবা রূপে
 তুমি আছো সর্বজীবে সর্ব রূপে এই মনে রেখে ॥
 আর ভুলাওনা মোরে
 ঠিক জানি সময় হলে
 তোমার সন্তানে তুমি
 ঝেড়ে মুছে নেবে কোলে তুলে ॥
 প্রার্থনা জানাই সদা মনে মনে
 এই আশা নিয়ে ও দুটি দুর্লভ চরণে
 মনে থাকে অবিরত।
 সকল জীবের যেখানে মুক্তি কর্ম শেষে
 আবার আমি সেখানে হবো স্থিত ॥

ছেলেধরা মা

— জনৈক সন্তান

জীবন চেতনার প্রথম প্রত্যুষ থেকে গর্ভধারিণী জননীকে হারিয়ে জগৎ জননী শ্রীমাকে খুঁজছে এক মাতৃভক্ত সন্তান। সে জানেনা মা আছেন কোথায় বা কে দেবে তার ঠিকানা। “বাঁশ বাগানে মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ.....” সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় পড়তে বসে কবিতাটি পা দুলিয়ে আবৃত্তি করতে করতে কল্পনার রঙে ছবি এঁকে এক দিদিকে প্রশ্ন করতুম আমার সেই শোলোক বলা কাজলা দিদি কই। গর্ভধারিণী মা জ্ঞানদা হারিয়ে গেলেও মাকে খুঁজে বেড়াতুম আকাশের আঙিনায়। মাতৃ-জিজ্ঞাসা বন্ধ হয়নি। শ্রীযুত যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের এক শিষ্য পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী সদানন্দজী পিতার গৃহস্থ আশ্রমে মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁকেও জিজ্ঞেস করতুম। বলতেন - তোমার মিলবে। কবে কোথায় কেমনভাবে তাও বলেন নি। পরে যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে যাবো স্বামী যোগানন্দজী রচিত “An Autobiography of a Yogi” বইতে ‘নির্মলা মা’র কথা পড়েছি সেই “মা আনন্দময়ী’র কথা চৈতন্যকে একটুও নাড়া দেয়নি। মেদিনীপুরের এক অতি অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রামে প্রায় লেখাপড়া নেই যে তপশীলি পরিবারে সেখানে যে ‘বড়লোকের মা’ কে যে পাওয়া যাবে কে জানতো। মাতো বড়লোকের না গরীবলোকের তা কে জানে তবে অধম আজ জানে “ছেলেধরা মা” যা হাত ধরে জীবন পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার জীবন পথে। আজ স্পষ্ট বোঝা যায় জীবন পথে আশার বর্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৪৮টি বসন্ত। সেই ছেলেধরা মার কথা বলতে এই গৌরচন্দ্রিকা।

কলেজ জীবনে সাহিত্য সৃষ্টির বাসনা নিয়ে যখন ছোট পত্রিকাগুলিতে ঘোরাঘুরি করি তখন সেই মফঃস্বল শহরে এসেছিলেন রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। যুবক অটোগ্রাফ শিকারীর খাতায় লিখে দিলেন — “জীবনে সুখের সন্ধান কোরো না, আনন্দের সন্ধান কোরো।” সুখ আর আনন্দ তখন প্রায় সমার্থক শব্দ। কিন্তু তার সন্ধান মঠে মন্দিরে সাধু সঙ্গে মিলিত হয়েছি কত বার। একদিন কাঁদতে কাঁদতে শিশির ব্রহ্মচারীজীকে বলেছিলাম, কবে তাঁর দেখা পাবো। মনে আশা জাগিয়ে বলেছিলেন — তোমার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তখন যে সময় হয়নি এখন বুঝি। কারণ যখন সঙ্গীত সাধক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ‘অতিরুদ্ধযজ্ঞ’ সময়ে শ্রীমাকে পাওয়া যাবে বলেছিলেন, মাত্র এক জামা কাপড়ে (ব্যাগটা বা গামছাও নেই) যখন হরিদ্বার চলে যাই তখন শ্রীমার উপর অভিমান করে সেই রাত্রিতেই পালিয়ে আসি বৃন্দাবনে। যাবে কোথায়? ‘ছেলেধরা মা’ যাকে হাতে ধরে রেখেছেন তার অন্য জায়গায় যাওয়ার উপায় নেই। তাই তো ছলিয়া মন্দিরে বড় স্নেহভরে ধীরানন্দজী বলেছিলেন - তুমি নিজ মুখে কেন মাকে বললে না? তখন কিছু বুঝিনি। বন্ধু সুন্দরের জন্মোৎসবে শিশির ব্রহ্মচারী আশা জাগিয়ে বলেছিলেন - এক বুকভরা ভালবাসা নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সন্তানকে ধরার অপেক্ষায়। বলেছিলাম, বড় অভিমান ভরে পালিয়ে এসেছি। না না তা নয়। সময় হয়নি বলে মন্ত্র পাওনি।

আমি বলেছিলাম - ঐ তো বললাম। বরাবর জিদ ছিল চেয়ে মস্ত্র নেবো না। না না সময় হলে ও কথা বলতে পারবে না। সত্যিই তো! আজ বুঝতে পারি। ছলিয়া মন্দিরে সেদিন কাউলজীকে (স্ৰ.এন. কাউল) বলে ফেলেছিলাম - এই সে বৃন্দাবনে এসেছি। প্রায় শ্লেষের সুরে বল্লেন — Don't say that you have come here; Mother has brought you. সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র চৈতন্য শিহরিত হল। সত্যিই তো। তখনও বুঝিনি কে মা আনন্দময়ী কী জন্যে এসেছেন পৃথিবীতে। আজও যে বুঝি তাও নয়। পরে একদিন কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে বলেছিলেন — কোন একজন গগংকারকে ভাইজী কোষ্ঠী দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলুন তো কার ঠিকুজী। পুরীধামের সেই গগংকার বলেছিলেন, কি বলবো! শুধু বলা যায় “তোমার সাজানো বাগানে এসেছ বেড়াতে দেখে যাও কেমন আছে তারা। বারবার সেই কথা মনে পড়ে। ‘Auto Biography’তে পড়েছি, তখনও কিছু বুঝি নি।

এখনও যে কিছু বুঝি না তাও জানি। তবু শ্রীমায়ের কথা লেখার ইচ্ছে জাগে। ভাবি শ্রীমায়ের কথা বলতে গিয়ে যদি আমার কথা বলে ফেলি। গত বছর শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দজী এসেছিলেন। ছেলেকে বলেছিলেন — মার কথা একটু লিখে আমাদের “অমৃত বার্তা”য় দিতে বলা। ভয়ে লিখিনি। যশ: কীর্তি ধ্বজাধারী ইংরেজীর অধ্যাপক এন্ ব্র্যানার্জী শিখিয়েছিলেন — বাবা, শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ, শব্দকে ব্রহ্মজ্ঞানে ব্যবহার করবে। তখন মনে কথাটি তেমন ধরেনি। ধরেনি বলেই সেই বছরেই “পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ” এর (১ম খণ্ড তখন লিখেছিলেন মাত্র) লেখক অচিন্ত্যবাবু এসেছিলেন সেই মফঃস্বল শহরে। অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আরও বলেছিলাম — আমরা একটা কাগজ চালাই, লেখা দিন। লিখেছিলেন আমাদের প্রগতি পত্রিকার জন্য — গতির শ্রেষ্ঠ প্রগতি; প্রগতির শ্রেষ্ঠ শরণাগতি। শব্দ ব্রহ্ম জ্ঞান হয়নি। তখন বুঝতে পারিনি। আজ স্পষ্ট অনুভব করি — ‘ছেলেধরা মা’ আঁমায় বিভাল বাচ্চার টুটি চেপে পুরী, বৃন্দাবন, বারাণসী ইত্যাদি জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে কন্থলে জ্ঞানচক্ষুটি খুলিয়ে দিলেন। শুনেছি গর্ভধারিণী জ্ঞানদা সদানন্দ ব্রহ্মচারীর হাত ধরিয়ে দিয়েছিলেন, পিতা যোগদা সংসঙ্গ আশ্রমের সন্ন্যাসী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের কাছে হাতে খড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন। মা দেহে না থাকলেও শিক্ষাজীবন সমাপ্তিকাল পর্যন্ত স্বামিজী আশীর্বাদ করে গেছেন, এমন কি কর্মজীবনের মধ্য লগ্ন পর্যন্ত। আর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল যাঁর আশীর্বাদ পূত পবিত্র “জনসেবা কেন্দ্র” ঐ সেই স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী আজও দেহে বর্তমান। আর সাধন-জীবন শুরু হয়েছে শ্রীমায়ের পবিত্র চরণ কমল স্পর্শে। আজ কর্মজীবনের সমাপ্তি ও সাধন জীবন শুরু।

সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম নিয়ে যে মানুষের মধ্যে এখন “আমি” বর্তমান সেই মানুষদের কাছে আমি ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধের নৈতিক দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে নিয়েছি। নিয়েছি বলেই মেদিনীপুরের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা স্মরনোৎসবের আয়োজন করেছি। কিন্তু কোনো ভাবে নিজের নামকে জড়াতে চাই নে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব বন্ধু শিক্ষকরা

এখনও বর্তমান তারা বলেন, তুই নিজের জন্য কিছু করলি না।

আজ শুধু ‘ছেলেধরা মা’র কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা মা তোমার চরণ দুটি ছাড়া আমার কিছুই চাইবার নেই। তবু শেষ কথাটা বলে যাই। প্রথম যখন মাকে পেতে আসি যাবার অনুমতি পাইনে। কোনওভাবে না পেয়ে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। জ্ঞানী জৈল সিং (তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বর্তমানে প্রয়াত প্র০ রাষ্ট্রপতি) তেরঙা পতাকা উড়িয়ে এলেন। ভাবলাম এই ফাঁকে গলে যাব। ‘বাহার যা’। বাকবা: আমি কোন হার! ঘুরে ঘুরে বুঝলাম স্বামী পরমানন্দজী দয়া করলে হবে। একজনও চেনাজানা মানুষ নেই এক জামাকাপড়ে চলে এসেছি। যাব কি করে? এখন বুঝি ‘ছেলেধরা মা’ নিয়ে এসেছেন। যাই হোক সারা দিন স্বামিজীর কাছে কাঁদছি। মুখ ফুটে বলিনি। সেই “অভিমান”! সেদিন এসেছিলেন শৃঙ্খরী মঠের শংকরাচার্য। উনি বল্লেন যাও দেখে এসো। প্রণাম করে বসেছি। কিছু বলিনি। ধৈর্যের সীমা হারিয়ে পা জড়িয়ে কেঁদে বলেছি “কৃপা করুন”। যেন ভৎসনার স্বরে বল্লেন — “কৃপা মানে বোঝ? কী করেছ পাবে?” তখনও বুঝিনি এইভাবে সাধুরা কৃপা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক মোরারজীর মতন দেখতে একজন জিঞ্জিৎস করেন — কে তুমি? সাথে কে আছে? কেন এসেছ? ইত্যাদি ইত্যাদি। তুলে নিয়ে গেলেন মার কাছে। শিব মন্দির থেকে মায়ের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাঁকে প্রশ্ন করলাম — আপনার পরিচয়টা দিন। কিছুতেই বলতে চাইছেন না। আমি তো না ছোড়াবান্দা। বল্লেন — আমাকে সবাই বেনারসের ‘পটল’ বলে।

যাই হোক — মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। আমি তো খালি হাতে এক জামা কাপড়ে এসেছিলাম। তবে মার জন্য কিছু ফুল নিয়ে এসেছিলাম পকেটে করে। সে ফুলগুলি চরণ পদ্মে অর্পণ করে পা দুটি জড়িয়ে ধরলাম। যাঁরা সেদিন মার সঙ্গে ছিলেন তাঁরা তো হৈ হৈ করে বলে উঠলেন, আহা পায়ে হাত দেবেন না। যাই হোক পটলদা মাকে বল্লেন — “মা তোমার নামে এক বস্ত্রে পালিয়ে এসেছে বাড়ী থেকে।” দেখি কই স্ত্রীমূর্তি যা ছবিতে দেখি তা তো নয়। এ তো একেবারে অন্য এক “অসাধারণ নারসিংহী মূর্তি”। আজও তার অর্থ বুঝিনি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এমন আরও কয়েকটি ছবি দেখিয়ে ছিলেন তাতে বিগত কয়েকটি জীবনের ছবি মনে পড়ে।

শেষ করছি — সেবার কন্থলে ডা: ত্রিগুনাদাকে কয়েকদিন ধরে বলছি, দাদা একবার আপনার ঘরে যাবো। বলেন, বলো না এইখানে। তখন সমাধি মন্দির হয়নি। যাইহোক কয়েকদিনের অনুরোধে রাজী হলেন। নিয়ে গেলেন। দৃশ্যটি মনে গোঁথে রইলো। “শ্রীচরণ” দুটি উলের ফুলে সাজানো। ছিমছাম রুম্টি। শুধু ঐ চরণ পদ্ম দুটি ছাড়া আর কিছু নেই। আমারও বাসনা চরণ পদ্মে নিঃস্পন্দিত হোক দেহ পল্লবী।

জয় মা! জয় মা! জয় জয় জয় মা!



সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে শ্রীশ্রী মা

— জয়া ভট্টাচার্য

আত্মস্বরূপিনী শ্রীশ্রী মা যে কি এবং কে এ প্রশ্ন হয়ত চিরদিনই অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। মার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক সহজাত সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে অলৌকিক ও দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রী মায়ের চরণতলে মিলিত হইয়াছিল পৃথিবীর দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, গৃহী, হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খ্রীষ্টান, জৈন এবং বৌদ্ধ। যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন প্রত্যেকেই মাকে আপন আপন ইষ্টরূপে দেখিয়াছেন। শ্রীশ্রী মার শ্রীমুখ হইতে যে দৈব বাণী স্বতঃ স্ফুরিত হইয়াছে তাহাতে আমরা দেখি ধর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। মা বলেন, “সর্বরূপে একমাত্র ভগবানই ত, কারো সঙ্গে বিরোধ মানে ভগবানের সঙ্গেই বিরোধ। আমরা সকলেই যে এক আত্মা। সর্ব ধর্মের এক ধারা সকল ধারাই এক। এক আত্মা ছাড়া দুই নাই সেই এক এর মূর্ত প্রকাশ আমাদের মা। সেই কারণে প্রত্যেক জীবাত্মার সঙ্গে মার অখণ্ড ঐক্য। যিনি নিঃস্বৈগুণ্য, নিত্য নিরঞ্জন পদে আরূঢ় থাকিয়া অখণ্ড চৈতন্যে স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহার কাছে এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। সেখানে বিরোধ কোথায়? সর্বরূপে অরূপে ভগবানই একমাত্র।

ধর্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তরে মা বলিয়াছেন, “যা সকলেই চায় তা পাবার সহায়ক কর্মই ধর্ম। তাই স্বভাবের ধর্ম প্রত্যেকেরই প্রকাশিত হবার পৃথক পৃথক রাস্তা আছে। যেখানে তুমি আছ সেইখান থেকেই তুমি চল। একমাত্র তিনিই ত। ধর্মই তো প্রাণের প্রাণ, আত্মা। নিজকে জানতে হবে। আজ সমগ্র বিশে হিংসা ও অসন্তোষের ব্যাপক এবং ভয়ঙ্কর প্রকাশ দেখা যাইতেছে। এ কারণে সকলের মনে প্রশ্ন আসিয়াছে ইহার হাত হইতে বিশ্বকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়। মা বলিয়াছেন, একমাত্র ধর্মের দ্বারাই তা সম্ভব হইতে পারে। বিশ্বমৈত্রী ধর্ম ব্যতীত আসিতে পারে না। সে ধর্ম বিশেষ কোন জাতির হইতে পারে না। সে ধর্ম হইবে বিশ্বজনীন। মা বলেছেন, “যেখানে আত্মা সেখানে আমি থাকে কি করে? আপনাতে যে আপনি। সবই যে তিনি। এখানে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলিম কেহই কারুর অনাস্থীয় নয়। আমরা সবাই এক অচ্ছেদ্য চিরন্তন বাঁধনে বাঁধা।

আনন্দই আমাদের উৎস — আনন্দেই আমাদের স্থিতি এবং অবশেষে আনন্দেই আমাদের গতি। আনন্দের সন্ধানে বিশ্ববাসী ব্যাকুল। আমাদের মার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রবাহ দেখিয়াছি। বিশ্বব্যাপক, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা তিনিই তো আমাদের সকলের মা। তাঁকে সৎচিং আনন্দ বলা হয়। তিনি আছেন তাই সৎ। তিনি জ্ঞান স্বরূপ তাই চিং। এই সৎ এর জ্ঞান হইলেই আনন্দ। সত্য বস্তু জানিলেই আনন্দ। তাই সচ্চিদানন্দ। লীলা বিলাসে মা প্রবাহিত করিয়াছিলেন অজস্র আনন্দ ধারা। মা বলতেন, “প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছেন পরমপতি পরমেশ্বর। তিনি-ই তো প্রত্যেকের ‘আমি’ হয়ে নিত্য বিরাজিত — এই চেতনা জাগা চাই। সেই জাগরণের মন্ত্র মার জানা ছিল

বলিয়াই সকলের আকাঙ্ক্ষা ছিল মাতৃসপ্নের জন্য। মা বলেছেন, “ভগবান কে জানা মানে নিজেকে জানা, নিজেকে জানা মানে ভগবানকে জানা।

ভগবানই একমাত্র এই জ্ঞান না হইলে প্রকৃত সেবা হয় না। মা বলতেন, ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবা। তাতে ভগবানেরই সেবা হয়। সবই ভগবানের সৃষ্ট। তদ্বুদ্ধিতে জন জনাদর্শনের সেবা। নিজের জীবন নিজেই গড়তে হবে মনে করা। তুমি সত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শাস্ত্বত।

একথা সকলেই বিশ্বাস করেন মা মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সর্ববর্ধর্মের সমন্বয় সাধন মার মধ্যে এমন সহজভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে সকলেই মাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে দেখিয়াছেন। এখানে কোনও দ্বন্দ্ব আসে নাই।

অবতারের অসীমতা আমাদের সীমিত মনের পরিধিতে ধরিতে পারি না। আমাদের চেতনা কে জাগাইবার জন্য আমাদের অভাব বোধ কে দৈব ব্যাকুলতায় উন্নত করিবার জন্য মার আগমন। আমরা কি পাইলাম তাহা দিয়া জীবনের মূল্যায়ন হয় না। আমরা কি হইলাম তাহা দিয়াই জীবনের চরিতার্থ।



আশ্রম-সংবাদ

নতুন বছরে মায়ের চরণে প্রণতি জানিয়ে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে যথারীতি ‘আশ্রম-সংবাদ’ উপস্থাপিত হল।

১. কনখল —

কনখলে মায়ের আশ্রমে গত ২৮শে অক্টোবর হতে ৪ঠা নভেম্বর সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় মহাব্রতের উদ্বোধন সমারোহ আয়োজিত হয়। সেদিন নিব্বাণী আখাড়ার মোহন্ত পূজ্যপাদ শ্রী ১০৮ গিরিধর নারায়ণ পুরী জী, কৈলাশ আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দগিরিজী মহারাজ, দিব্যজীবন সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী ১০০৮ স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ ও গরীবদাসী আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রী ১০০৮ স্বামী শ্যামসুন্দরদাসজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই সংযম সম্বন্ধে সুন্দর সারগর্ভিত উপদেশ দেন। স্বামী বিদ্যানন্দজী সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আগামী সুবর্ণ-জয়ন্তী মহোৎসব সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের আগে ও পরে পুষ্পদি ও ছবিদির স্তব ও ভজন হয়।

এবারের সংযমের বিশেষতা হল অন্যান্য বছর হতে ব্রতীদের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল। প্রায় সমস্ত মহাত্মারাই উপস্থিত ছিলেন। ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী দেবানন্দ স্বরস্বতীজী মহারাজ দুই দিন খুব সুন্দর বলেন। বিকালে সাধনা সদন আশ্রমের স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীর পুরাণ পাঠ অতি আকর্ষণের বিষয় ছিল। সকালে ধ্যান ও গীতা চণ্ডীপাঠের পর স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ বৃহদারন্যক উপনিষদের জ্ঞান গর্ভিত ব্যাখ্যা করতেন। রাত্রি বেলা স্বামী চিদানন্দজীর ভাষণ সাতদিনই চলেছিল।

৪ঠা নভেম্বর মহানিশার ধ্যান ও ৫ই নভেম্বর প্রাতে হোমের পর সংযম সপ্তাহের পরিসমাপ্তি হয়। সেদিনই রাত্রিতে নামযজ্ঞের অধিবাস হয় এবং ৬ই রাত্রিতে কীর্তনের সমাপন হয়।

২. বারাগসী —

বারাগসী আশ্রমে গত শারদীয়া নবরাত্রিতে মহাসমারোহের সঙ্গে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের হীরক জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মহালয়ার দিন গঙ্গা পূজা এক অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। এক দিকে সাড়ম্বরে গঙ্গাপূজা ও অপরদিকে বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনির সঙ্গে ৬০ কিলো দুধে গঙ্গামাতার অভিষেক এক অলৌকিক ভাবের উদয় হয়েছিল। সেদিন রাত্রিতে আশ্রমের শিবমন্দিরে রুদ্রাভিষেক ও ব্রাহ্মণদের রুদ্রীপাঠ শ্রবণ করে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শারদীয়া প্রতিপদের পুণ্য তিথিতে আশ্রমস্থ সকল মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজা ও ৬০ জন কুমারীর আভরণ, বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভোজন অতি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। এই প্রতিপদ

তিথিতেই আজ হতে ৬০ বছর পূর্বে কন্যাপীঠের স্থাপনা হয়। এরপর হতে নবরাত্রির মধ্যে প্রতিদিন প্রত্যুষে কন্যাপীঠের কন্যারা বারাণসীর সমস্ত মূখ্য মন্দিরে গিয়ে ক্রমশঃ পূজা দিয়ে আসে। বিকালে প্রতিদিন কন্যাপীঠেরই একজন অধ্যাপিকার দ্বারা দেবী ভাগবতের ব্যাখ্যা সম্পাদিত হয়।

গত ১৯শে অক্টোবর মন্দিরে কালীপূজা এবং ২১শে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মন্দিরে যথারীতি অন্নকূট সুসম্পন্ন হয়। ১৮ই অক্টোবর হতে ২০শে অক্টোবর বিকালে শ্রী নবব্রত ব্রহ্মচারী সুললিত বাংলা ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা ও মধুর কণ্ঠে ভজন শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

২৬শে নভেম্বর হতে ২৯শে নভেম্বর গীতাজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গীতার ব্যাখ্যায় ছিলেন কন্যাপীঠের অধ্যাপিকাগণ ও আশ্রমের কয়েকজন মাতৃ ভক্ত। সকালে যথারীতি গীতা পাঠ হত। একাদশীর দিন শ্রী পার্থসারথির ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. জামশেদপুর —

নবনির্মিত জামশেদপুর আশ্রমে গত ১৯শে অক্টোবর ৮কালীমাতার মন্দিরে শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা এবং পরের দিন অন্নকূট অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রচুর ভক্ত সমাগম ভজন কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

৪. দিল্লী —

দিল্লীতে আশ্রমস্থ ৮কালী মন্দিরে ১৯শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন রাত্রিতে ১১টা হতে ভজন কীর্তন আরম্ভ হয়। কীর্তন রাত ৩টা অবধি চলে। রাত ১টা হতে ৩টা পূজা হয়। তারপর হোম হয়। পরদিন অন্নকূট হয়। প্রচুর ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৫. উত্তরকাশী —

উত্তরকাশী আশ্রমেও ৮কালী মন্দিরে ১৯শে অক্টোবর বিশেষ ভাবে কালীপূজা ও পরদিন অন্নকূট উৎসব হয়। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।



শোক-সংবাদ

১. বিষ্ঠন দেবী—

মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত মহিলা, যিনি আশ্রমে “বিষ্ঠনজী” নামেই পরিচিতা ছিলেন গত ৫ই নভেম্বর পরিণত বয়সে নিজের ইষ্টদেবের শ্রীচরণে চিরতরে লীন হন। বারাণসী আশ্রমে তাঁর রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ শ্রীশ্রী মায়েরই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন।

বিষ্ঠনজী অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি শ্রী রাধা গোবিন্দের সেবা, পূজা, আরাধনা করে গেছেন। পরম পূজ্য স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ হতে তিনি গৈরিক বস্ত্র লাভ করেন। তাই সন্ন্যাসের বিধি অনুসারেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

২. ড० বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—

কলকাতার সল্টলেক নিবাসী মাতৃভক্ত ডাক্তার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য (সকলের বুদ্ধদেবদা) গত ৬ই নভেম্বর, ১৯৯৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছেন।

তিনি ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ৮শ্রীশ্রী শ্যামাপূজার দিন সস্ত্রীক মায়ের আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে আসার অনেক আগে থেকেই তিনি অজানিত ভাবে তাঁর কৃপা পেয়েছেন। শৈশবে মাতৃহারা ও কৈশোরে পিতৃহারা হয়ে তিনি অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও যে অটুট মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, মাতৃকৃপা ছাড়া তা অসম্ভব বলেই তিনি মনে করতেন।

নিরতিমান নিরহঙ্কার বুদ্ধদেবদার সহজ সরল আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

কৈশোর কাল থেকেই তিনি লেখার জগতে আসেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। কয়েকটি গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও বেশ কিছু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, শিশু ও কিশোরদের জন্য নানা বিষয় দিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি বই রয়েছে। কিন্তু মাতৃসান্নিধ্যে আসার পর তাঁর কলমে শুধু মায়ের বিষয় নিয়ে লেখাই এসেছে। আর তারই ফলস্বরূপ ‘গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী’ (দুই খণ্ড), ‘তিন মায়ের কথা’ আমরা পাই। এরপর শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপায় ‘আনন্দময়ী মায়ের কথা’ (শ্রীশ্রী মায়ের আবির্ভাব শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত) গ্রন্থটিই তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা বলে সকলে মনে করেন। বাণী হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। ‘অমৃত বার্তার’ তিনি স্থায়ী লেখক ছিলেন।

কিছুদিন থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। শেষবার তিনি ‘মা এসো’, ‘মা এসো’ বলতে বলতে অজ্ঞান হয়েছেন। এই তাঁর শেষ কথা। তাই শ্রীশ্রী মায়ের চরণে প্রার্থনা তাঁকে যেন তিনি চির আনন্দে রাখেন। আমরা ‘অমৃত বার্তা’র সদস্যগণেরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। আর তাঁর আত্মীয়জনের চির সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

With best compliments from :

“যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে। তাহলেই
কর্মের আসবে পূর্ণতা।”

—শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES.

Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD.

25, SWALLOW LANE,
CALCUTTA - 700001

FACTORY AT: DUM DUM & BARODA.

BARODA CITY OFFICE-

D. WREN INTERNATIONAL LIMITED,
ALKAPURI, BARODA - 390007

With best compliments from:

“সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কৰ্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কৰ্ম করবে তাহাই
সত্য এবং খাঁটি হবে।”

— শ্রী শ্রী মা

A.R. Dewanjee & Co.

MANUFACTURERS OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD
EXPORTERS & IMPORTERS
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA - 700001

Phone: 220-9739
Offi.: 220-4746
Fax: 220-8472
Factory: 477-9239
Resi.: 473-3157

শুভ কামনা সহিত :



“যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে নেবে পূর্ণাঙ্গীণ রূপে
চেষ্টা করা দরকার।”

—শ্রী শ্রী মা

With best compliments from:

দি এশিয়াটিক অস্সিজেন এণ্ড অ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড

৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব)

কলিকাতা - ৭০০০০১

ফোন : ২২০৪২৪৭/২২০৪২৫৯/২২০৪৪৮৭

With best compliments from :

“শুভমতি দিয়ে কর্ম করে কর্মের ভিতর দিয়েই
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা।”

— শ্রী শ্রী মা

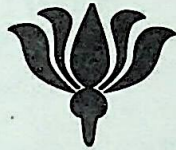
ORISSA AIR PRODUCTS LTD.

Head Office : 8, B.B.D. Bag East
CALCUTTA - 700001

Regd Office : Gundichapada
Dhenkane : 759013

Phones : 220-4247/2204-259

At the Lotus feet of Ma



Kalipada Dutta

35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta—700 005

With best compliments from :

“প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।”

— শ্রী শ্রী মা

SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY

87/5, Block E, New Alipore

Calcutta-700053

Phone : 78-3545

“মা আছেন কিসের চিন্তা?”

With best Compliments from:

Amrita Bastralaya

157-C Rashbehari Avenue

Ballygunje, Calcutta-700029

Phone : 464-2217

*Suppliers of Quality Sarees,
Woollen and Readymade Garments
and School Uniforms.*

*** WE HAVE NO OTHER BRANCH**

“হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার॥”

— শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

- শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত ক্যাসেট “আনন্দ সংগীত” নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ :

- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
- মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

With Best Compliments from

"Try to grasp the significance of 'all is His', and you will immediately feel free from all burdens."

—Ma Anandamayee



RISHI GASES (P) LTD

Head Office : 8, B. B. D. Bag East

CALCUTTA-700001

Phones : 220-4247 / 4259

Factory : Industrial Estate

P.o. Tifra

Bilaspur-495223 (M.P.)

Phones : 4233, 4675

With best compliments from

KHADIM

তবু কিছু কথা রয়ে গেল বাকি
বারোমাস যেন মাগো তোমার পায়েই থাকি ।



Khadim

Footwear * Construction * Export

*** Branch Ashrams ***

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 327835)
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P.
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 310054+311794)
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel: 05442-64343)
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97



रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमप्लेक्स, वाराणसी, फोन-३९२८२०

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

* Branch Ashrams *

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 33208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009
U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road,
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel: 416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ — ৩

এপ্রিল, ১৯৯৮

সংখ্যা — ২



সম্পাদক মণ্ডল

- ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
- ড: শুকদেব সিংহ
- কুমারী চিত্রা ঘোষ
- কুমারী গীতা ব্যানার্জী
- ব্রহ্মচারিণী গুণীতা

কার্যকারী সম্পাদক

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী



বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা

বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

- ★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতি ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয়।
- ★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।
- ★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যিক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।
- ★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম :
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c
- ★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—

**Managing Editor,
Ma Anandamayee—Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221001**



পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম :—

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা—২০০০/- বাৎসরিক।

অর্ধেক পৃষ্ঠা -- ১০০০-বাৎসরিক।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

। শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারানসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারানসী-১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক—শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচী পত্র

১. মাতৃ বাণী	...
২. শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	... শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত
৩. আপনাকে জানা আপনাকে পাওয়া	... শ্রী জগদীশ্বর পাল
৪. দিদি	... ব্রহ্মচারী নিব্বাণানন্দ
৫. দিদি ও মায়ের কাছে	... তাপস কুমার সোম
৬. দিদি গুরুপ্রিয়া স্মরণে	... শ্রী সোমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭. গুরুপ্রিয়া স্তুতি	... ডা० চিত্ততোষ চক্রবর্তী
৮. শতবর্ষের আলায় শ্রী গুরুপ্রিয়া	... শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত
৯. আমাদের দিদি গুরুপ্রিয়া	... সন্ন্যাসিনী মৈত্রী পুরী
১০. আমাদের ব্রহ্মচারী মা....	... শ্রীমতী গীতা চ্যাটার্জী
১১. দিদি গুরুপ্রিয়ার অবদান	... শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য্য
১২. সম্ভবামি যুগে যুগে	... শ্রীমতী স্মৃতি মুখার্জী
১৩. আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা	... প্রতিভা কুমার কুণ্ড
১৪. শত বরষের লহগো প্রণাম	... ব্রহ্মচারিণী গীতা
১৫. শ্রী মায়ের শুভ জন্মদিন আসছে	... সঙ্কিতা সেনগুপ্ত
১৬. আশ্রম সংবাদ	...



নূতন প্রকাশনা

দিদি গুরুপ্রিয়া — শ্রদ্ধার্থ্য

পরমশ্রদ্ধেয়া দিদি গুরুপ্রিয়ার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি অপূর্ব গ্রন্থ। শ্রীশ্রী মায়ের লীলা সঙ্গিনী, “শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী” গ্রন্থের প্রণয়িত্রী এবং শ্রীশ্রী মায়ের বহু প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকর্ত্রী দিদি গুরুপ্রিয়ার সম্পূর্ণ জীবনী বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। এই দৃষ্টিতে এই পুস্তকটি মাতৃভক্তদের নিকট একটি অমূল্য সম্পদ। এই পুস্তকে দিদি গুরুপ্রিয়ার বিশেষ গুণমুগ্ধ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক লেখিকারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

—মূল্য ২৫/-

ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া — সচিত্র জীবনী

দিদি গুরুপ্রিয়ার একটি অতুলনীয় সচিত্র জীবনী গ্রন্থ। আট পেপারে ১৩৪টি দুর্মূল্য চিত্র সম্বলিত এবং প্রবুদ্ধ সাহিত্যিক হিন্দী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য প্রকাশন। মাতৃভক্তদের বিশেষ মূল্যে পরিবেশিত করা হচ্ছে।

—মূল্য ১০০/-

প্রাপ্তি স্থান — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১০০১



মাতৃ-বাণী

সংকলন - চিত্রা ঘোষ

জগতে সকলে এক পরম পিতারই সৃষ্ট বলে কারো কেউ ভিন্ন নয়, যে রূপ এক পরিবারে বহু ছেলে মেয়ে হ'লে জীবনযাত্রা নির্বাহের সুবিধার জন্য দশ রকম ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন ক'রে দশ জায়গায় দশখানি বাড়ী করে তারা বসবাস করে, তেমনি মূলে সকলে এক হ'লে কর্ম শৃঙ্খলার বশবর্তী হয়ে বহুভাবে বহুরূপে দলবদ্ধ হ'য়ে সবাই রয়েছে মাত্র।



সংসারের সুখ দুঃখের আন্দোলনে মনটিতে ঘসা-মাজা পড়লে কখনো কখনো মানুষকে ত্যাগময় করে ও ভগবানের জন্য আকুলতা জাগায়, সে অবস্থার সুযোগ গৃহত্যাগী সাধুরাও অনেক সময় লাভ করতে পারে না।



অন্তর জানতে হলে বাহিরকে বাদ দেওয়া চলে না; তাই তিনি জগতের চিত্রে অন্তরের ছবি এঁকে রেখেছেন। এই জগৎ জাগ্রতের আভাস বললেও চলে। জগতের ক্ষণিক আনন্দে মুগ্ধ না হয়ে অন্তর্যামীর স্মরণ নিতে চেষ্টা কর।



নিজেকে নিজে শাসন করতে না পারলে বিরাট পরতন্ত্র চালাবে কি করে? মনো রাজ্যের রাজা হতে পারলে বিশ্বের রাজত্ব আপনা হতেই হাতে আসবে। ধর্মের উপরেই জগতের সত্য প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই জগতের জীবন।



আঁকা বাঁকা পথে যেমন গাড়ীর চাকা ঘুরাতে ফেরাতে ঘোড়া বা ইঞ্জিন এর উপর জোর দিতে হয়, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত মনকেও সংকল্পের দ্বারা মুচড়ে ধর্ম কাজে লাগাতে হয়।



প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলেও তা বজায় রাখবার জন্য তাঁর উপলক্ষ্যে উপাসনা, দান, ধ্যান ইত্যাদি প্রয়োজন। তা হলে তাঁর স্মৃতি সকল সময় আত্মসত্তার মত লেগে থাকবে এবং মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তাঁর মূর্তি তোমাকে ছেড়ে যাবে না। এরই নাম ভগবৎ-প্রাপ্তি।



মিলনের আশা মিলনের চেয়েও সুখকর এবং যতই শ্রদ্ধা, ভক্তি বাড়তে থাকে ততই এই আশার উৎফুল্ল হতে ব্যাকুলতা, প্রার্থনা ইত্যাদি পূর্ণতায় পৌঁছায়। হিমালয়ের ভিতরে কি দেখনি দুই পাখি ‘কৈ-কৈ’ করে অবিশ্রান্ত ডাকতেই আছে, একে অন্যের ডাক শোনে অথচ এত আসন্ন প্রীতিতেও কেউ কারো কাছে আসে না। ডেকেই বিচ্ছেদের সাময়িক বেদনার শাস্তি করে। বিরহ বা অভাব বোধ নিতান্ত আবশ্যিক। অভাবের তাড়নায় যেমন প্রবল বেগে কর্ম সংগ্রাম আরম্ভ হয়, কর্তব্য বুদ্ধিতে তেমন হয় না। অভাব স্মরণে রেখে সদৃভাবে তা পূরণের চেষ্টা কর। এ রূপে সদবৃত্তি যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই তাঁর বিরহ তোমাকে অন্য সব কর্ম হতে বিরত করে তাঁর প্রতি শরণাগতি এনে দেবে।



প্রকৃতির এই অবিরাম গতি বেশ বুঝিয়ে দেয় যে জন্ম মৃত্যু বলে কিছু নেই এবং এক পরম পুরুষই নানা ভাবে নানা রূপে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন মাত্র। প্রকৃতির বিধানগুলি সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শেখো। তাঁর নিরপেক্ষ ভাব হৃদয়ঙ্গম কর, তা হলে যিনি সকল কারণের বিধাতা, তাঁর চিন্তা আপনা হতে জাগ্রত হয়ে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই প্রমাণ করে দেবে।



কেউ কাউকে দেখে না, সকলকে দেখেন মাত্র একজন। মহাপর্বতের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখতে পাবে পাথর, মাটি, গাছ, শিকড়, লতা প্রত্যেকে প্রত্যেককে এমন ভাবে আঁকড়িয়ে রেখেছে যে মনে হবে, একটি খসলেই বুঝি সবগুলি খসে পড়বে। কিন্তু তা কি হয়? যে পর্বতের গায়ে তারা লেগে আছে, সেই তাদের ধরে রেখেছে। ভূমিকম্প বা অন্য কোন দৈবোৎপাতে পর্বত যদি একবার গা ঝাড়া দেয়, তবে আর কিছুই স্থির থাকবে না। সেইরূপ যদি তোমরা মনে কর সংসার, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির গঠনে তোমরাই জগৎ রক্ষা করছ, মূলে কিন্তু তিনিই সর্বময় রক্ষাকর্তা। এ কারণে তাঁকে জানা দরকার। তাঁকে জানলেই সব জানা হয় এবং অভাবের দ্বন্দ্ব দূর হয়।



শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হইলে বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে

স্টেশন হইতে কিশনপুর আশ্রমে ফিরিবার পথে ভুবনবাবু আজ যে এক হাস্যকর ব্যাপার করিয়াছেন সেই কথা দিদি সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। দিদি বলিলেন, “আজ হরিদ্বার হইতে আসিয়া যখন শুনিলাম যে কমল আমাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্টেশনে চলিয়া গিয়াছে তখন তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য তখনই আবার মোটর লইয়া স্টেশনে গেলাম। ভুবনদাদাও আমার সহিত চলিলেন। স্টেশনে কমলের সহিত দেখা করিয়া যখন আশ্রমে ফিরিতেছি তখন ভুবনদাদা বলিলেন, “বেলুদিদি আমাকে তাহার চশমটা মেরামত করিতে দিয়াছে। দেৱাদুনে কোথায় যে ইহা মেরামত হয় তাহা জানি না। তবে শহরে পৌঁছিলে গাড়ী থামাইয়া খোঁজ করিয়া দেখিব।” তাঁহার কথামত আমরা শহরে আসিয়া মোটর গাড়ী থামাইলাম। ভুবনদাদা গাড়ী হইতে নামিয়া চশমা মেরামতের খোঁজে গেলেন। আমি গাড়ীতেই বসিয়া রহিলাম। এমন সময় পুলিশ আসিয়া আমাদের ড্রাইভারকে গাড়ী সরাইয়া অন্য এক জায়গায় রাখিতে বলিল। তাহার কথামত গাড়ী একটু দূরে লইয়া যাওয়া হইল। ড্রাইভার তখন বলিল, “গাড়ী ত এখানে আনা হইল, কিন্তু বাবু ত আমাদের খোঁজে পূর্বের জায়গায়ই যাইবেন। গাড়ী এখানেই থাকুক, আমি গিয়া বাবুর জন্য আগের জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি।” তাহার কথায় আমি সন্মত হইলাম। ড্রাইভার চলিয়া গেল। ড্রাইভার পূর্বের জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইল যে ভুবনদাদা এদিকে ওদিকে তাকাইয়া আমাদের খোঁজ করিতেছিল। তখন সে ভুবনদাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বাবু, জরাসা শুনিয়ে।” ভুবনদাদা ড্রাইভারকে ভাল করিয়া চেনেন না। কাজেই লোকটি যে আমাদের ড্রাইভার ইহা তাঁহার ধারণায় আসিল না। তিনি ভাবিলেন কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অনেক সময় গুপ্ত প্রকৃতি লোকেরা যেমন সন্ধ্যাবেলা অসতর্ক পথিককে নিঃস্বর্ণে ডাকিয়া নিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লয় এ লোকটিও বোধ হয় সেই জাতীয় হইবে। কাজেই তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিতে লাগিলেন। ড্রাইভার যখন দেখিল যে বাবু অন্যদিকে যাইতেছে তখন সেও তাঁহার পিছু লইয়া বলিতে লাগিল, “বাবু, শুনিয়ে, শুনিয়ে।” ভুবনদাদা যখন দেখিলেন যে লোকটি তাঁহার পেছন ছাড়িতেছে না এবং বার বার তাঁহাকে ডাকিতেছে তখন আরও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিজে ছুটিতে ছুটিতে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার পিছু নিয়াছ, আমি তোমাকে পুলিশে দেব।” (সকলের উচ্চ হাস্য) ড্রাইভার ত বাবুর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। অথচ সে বাবুকে ছাড়িয়া যায় বা কিরূপে? সে বাবুকে ঐ ভাবে ছুটিতে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, “বাবু, আপ গাড়ী পর জায়েগা নেহি!” এই কথা শুনিয়া ভুবনদাদা হাতজোড় করিয়া বলিলেন, “ভাই, আমার বড় ভুল হইয়াছে। তুমি মনে কিছু করিও না।” তখন দুইজনে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভুবনদাদা গাড়ীতে আমাকে এই ঘটনার কথা বলিলে আমি তখনই ভাবিয়াছিলাম যে আজ সকলের

কাছে এই গল্প করিব।”

এই গল্প শুনিয়া আমরা খুব হাসিতে লাগিলাম। ভুবনদাদাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেন ঐরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কাছে বুঝাইবার জন্য দুই একবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই আমাদের হাসির শ্রোতে ভাসিয়া গেল।

এই গল্প শুনিয়া মাও খুব হাসিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমারও একটা গল্পের খেয়াল হইতেছে, এক দরিদ্র গৃহস্থ ছিল। তাহার স্বামী আর স্ত্রী। কিন্তু বড় ধর্মভীরু। একদিন তাহাদের গৃহে এক অতিথি আসিল। কিন্তু ঘরে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা দ্বারা অতিথি সেবা চলিতে পারে। তাই স্বামী স্ত্রীকে বলিল, “তুমি অতিথিকে বসিতে আসন দাও। আমি দেখি কিছু যোগাড় করিয়া আনিতে পারি কি না। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ঐ গৃহস্থদের মাত্র একটাই ঘর। অতিথিকে ঘরের এক কোণে বসিতে দিয়া স্ত্রী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেক বেলা হইয়া গেল; কিন্তু স্বামীর ফিরিয়া আসিবার কোন লক্ষণ নাই। গৃহে আহ্বারের কোন আয়োজন হইতেছে না দেখিয়া পাছে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যান এই আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীলোকটি তখন ঘরের অপর কোণে সিলনোড়া লইয়া মশলা পিষিবার ভান করিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে রাস্তায় গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল যে তাহার স্বামী ফিরিতেছেন কিনা। বেলা দু প্রহরেও রাস্তার কোন উদ্যোগ হইতেছে না দেখিয়া অতিথি চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঐ স্ত্রী লোকটির অনুপস্থিতিতে সিলনোড়ার দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে উহাতে কোন মশলাই পেষা হইতেছে না। এতক্ষণ সিলের উপর শুধু নোড়াটি ঘষা হইয়াছে মাত্র। ইহা দেখিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল এবং সে আর বিলম্ব না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

“অতিথিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বাড়ীর গৃহিণী ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কারণ অতিথি হইল সাক্ষাৎ নারায়ণ, সে যদি অভুক্ত অবস্থায় কোনও গৃহস্থের বাড়ী হইতে চলিয়া যায় তবে ত সে গৃহস্থের মঙ্গল নাই। তাই সে ব্যস্ত হইয়া অতিথির পিছু পিছু ছুটিল। ভুল ক্রমে হাতের নোড়াটি হাতেই রহিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া সে অতিথিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, “আপনি যাইবেন না, আপনি যাইবেন না, আরও একটু বসুন।” তাহার ঐ কথা শুনিয়া এবং তাহার দিকে তাকাইয়া অতিথি দেখিল যে মহিলাটি নোড়া হাতে করিয়া তাহার দিকেই আসিতেছে। তাহাকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া অতিথি মনে করিল যে ইহার মতলব বোধহয় ভাল নয়; হয়তো ঐ নোড়া দিয়া সে তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিবে এবং এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় সে এতক্ষণ নোড়াটি সিলে ঘষিয়া চোখা করিতেছিল। এই সব চিন্তা মনে উদ্ভিত হওয়ায় সে ভয়ানক ঘাবড়াইয়া গেল এবং অগ্র পশ্চাৎ আর বিবেচনা না করিয়া সে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। মহিলাটিও অতিথিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার পেছনে পেছনে ছুটিতে লাগিল।

“এদিকে ঐ গৃহস্থ কিছু ভাল চাল যোগাড় করিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দেখিতে পাইল

যে তাহার অতিথি প্রাণপণে দৌড়াইতেছে এবং তাহার স্ত্রী অতিথির পেছন পেছন ছুটিতেছে। ইহা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। এমন সময় অতিথি হঠাৎ হেঁচট খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন গৃহস্থ এবং তাহার স্ত্রী দুই জনে গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অতিথি অতি কাতরভাবে তাহাদের নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলে তাহারা বুঝিতে পারিল যে কি ব্যাপার হইয়াছে, তখন তাহারা তাহাকে সাত্বনা দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিল।”

মা আবার বলিলেন, “জ্যোতিষকে নিয়া যখন আনন্দ চকে (দেরাদুন) ছিলাম তখনও এইরূপ একটা ঘটনা হইয়া ছিল। উহাও তোমাদিগকে বলিতেছি। আমরা আনন্দ চকে একটা শিব মন্দিরে ছিলাম। এখন অবশ্য উহার আর পূর্বের অবস্থা নাই। অনেক কিছুই বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন উহা অনেকটা খোলা মেলা ছিল এবং যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ঐখানে ঢুকিয়া পড়িতে পারিত।

“জ্যোতিষের ত চিরদিনই গোপনে ধ্যান জপাদি করার অভ্যাস। তাই সে প্রত্যহ রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া শিব মন্দিরে বসিয়া ধ্যান জপাদি করিত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদল কিছুই তাহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিত না। একদিন সে ঐ জপ করিতে বসিয়াছে এমন সময় মন্দিরের পূজারী ভোর হইয়াছে মনে করিয়া মন্দিরের ঘণ্টা বাজাইতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে ঘণ্টা বাজাইতে দেখিয়া জ্যোতিষ মনে করিল পূজারী যদি হঠাৎ তাহাকে মন্দিরের মধ্যে দেখিয়া ফেলে তবে সে তাহাকে চোর কি ডাকাত মনে করিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়াও যাইতে পারে এবং সত্য সত্যিই যদি তাহা হয় তবে সে হয়ত শিবলিঙ্গের উপর পড়িয়া আহত হইয়া মরিয়াও যাইতে পারে। এই মৃত্যুর জন্য তাহাকেই ব্রহ্মহত্যার পাপে পড়িতে হইবে। এইরূপ মনে হওয়াতে সে আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া পূজারীকে পেছন দিক হইতে ধরিয়া ফেলিল। পূজারী তখন ঘণ্টা বাজাইয়া ঠাকুরকে জাগাইতে ছিল। (সকলের হাস্য) হঠাৎ ঐ ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া পূজারী চিৎকার করিয়া উঠিল, আর জ্যোতিষ তাহাকে শাস্ত করিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিল, “ভয় নাই, ভয় নাই, আমি, আমি” এবং কি জন্য সে এরূপ করিয়াছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে এক হাসির রোল পড়িয়া গেল।”

নিদ্রিত অবস্থায় কি করিয়া অপরের প্রশ্নের সমাধান করা যায়

আনন্দ চক থাকিতে একবার চোর আসিয়া যে হারমনিয়াম ইত্যাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল সেই গল্পও মা করিলেন, উহা একবার উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। সেই সময় জ্যোতিষবাবু যে গভীর নিদ্রার মধ্যেই চোর আসিয়াছে বলিয়াছিলেন সে কথা মা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “বাস্তবিক অনেক সময় এই রূপই হয়। অনেকে নিদ্রিত অবস্থায় প্রশ্নের উত্তরে এমন সব কথা বলে যাহাতে প্রশ্নের ভাল সমাধান হইয়া যায় অথচ সে নিজেও জানে না যে সে কি বলিয়াছে। একবার নর্মদায় নরেশ চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে ছিল। একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে আমার নিকট বসিয়া আধ্যাত্মিক প্রশ্নাদি করিতেছিল। খুকুনী আমাদের

নিকটে পড়িয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে ছিল। এমন সময় নরেশ একটা প্রশ্ন করিল। তোমরা ত এ দেহের ভাব জান, এ দেহ হইতে কখনও প্রশ্নের উত্তর হয় আবার কখনও হয় না। নরেশের প্রশ্ন শুনিয়া এ দেহ আর কোন উত্তর দিল না; কিন্তু খুকুনী গভীর ঘুমের মধ্যে উহার যথার্থ উত্তর দিয়াছিল। নরেশ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। পরে খুকুনী জাগিলে তাহাকে ঐ সব কথা বলা হইল। সে বলিল যে সে ইহার কিছুই জানে না।

আমি। এরূপ হয় কেমন করিয়া?

মা। এ গুলি এক একটা স্থিতির কথা। এক ত আছে যে সত্তারূপে সবই থাকিয়া যায়। যা কিছু বলা কওয়া হয়, উহা সত্তারূপে থাকে। আবার অনেক সময় শব্দরূপেও ঐগুলি থাকিয়া যায়। যদি কাহারও এমন এক স্থিতি হয় যখন সে ঐ শব্দগুলির সহিত যুক্ত হয় তখন উহা তাহার ভিতর দিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়ে। অথচ সে নিজে জানে না যে কি হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ শব্দরূপে যে তাঁহারই প্রকাশ ইহা সে জানিতে পারে না।

দেবতার প্রকাশও এইরূপ। ধর কেহ বিষ্ণু বা শিবের সাধনা করিতেছে, সাধনা করিতে করিতে একদিন তাহার নিকট বিষ্ণুর প্রকাশ হইল। বিষ্ণুর প্রকাশের অর্থ কি? বিষ্ণু সর্বদাই প্রকাশমান আছেন, সাধক যে নিজেই বিষ্ণু এই জ্ঞান হওয়ার নামই বিষ্ণুর প্রকাশ হওয়া। শিব, কালী, সমস্ত দেবতা সম্বন্ধেই এইরূপ জানিবে। এক উপাস্য লইয়া পড়িয়া থাকিলে ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যেই সমস্তের প্রকাশ হয়। এক পথ ধরিয়া চলিলে দেখা যায় যে উহার মধ্যে অন্যান্য পথ আসিয়া মিলিয়াছে।

আবার দেখ, তোমার শরীর যদি আগুনে পুড়িয়া যায় তবে তুমি উহা যে ভাবে অনুভব কর, অন্যের শরীর আগুনে পুড়িলে কিন্তু সে ভাবে অনুভব কর না। আবার এমন স্থিতি আছে যখন পরের শরীর আগুনে পুড়িলে উহা নিজের শরীর পুড়িয়া যাওয়ার মতই মনে হয়। এ দেহ যখন বাজিতপুরে ছিল তখন রাখালেরা মাঠে গরু চড়াইতে বা ক্ষেতে চাষ করিতে গিয়া গরুগুলিকে যখন লাঠি দিয়া মারিত যদিও গরু বা রাখাল কাহাকেও এ দেহ দেখিত না তবুও ঐ লাঠির বাড়ির দাগ গরুর শরীরে যে স্থানে এবং যে ভাবে ফুটিয়া উঠিত, এ দেহের মধ্যেও ঐ দাগ ঐ সকল স্থানে এবং ঐভাবে ফুটিয়া উঠিত। নিজের সত্তাই যে বিশ্বময় ইহা সাধন করিতে করিতে বেশ বুঝা যায়। এই হইল একদিকের কথা। আবার ইহার বিপরীত দিকও আছে, অর্থাৎ যখন এ দেহের উপর কোন আঘাত পড়িলে সে সম্বন্ধে এ দেহের কোন জ্ঞানই হইত না। একবার হইয়াছে কি, আমি বসিয়া আছি, ভোলানাথ আমার কাছে বসিয়া তামাক খাইতেছে। ঐ তামাকের আগুন আসিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়াছে; কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। আগুন পায়ের উপর কিছুক্ষণ জ্বলিয়া পরে নিভিয়া গিয়াছে এবং পায়ের ঐ জায়গায় একটা বড় ফোস্কা উঠিয়াছে। ফোস্কা যে উঠিয়াছে তাহাও জানিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পর হাতটি আপনা হইতেই ঐ ফোস্কার উপর গিয়া পড়িয়াছে এবং পায়ের উপর একটা উঁচু কিছু

অনুভব করিয়া উহা আগন্তুক কিছু মনে করিয়া উহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিলাম। ফলে উহা হইতে জল বাহির হইয়া পড়িল। তখন চাহিয়া দেখি যে একটি ফোস্কা ঐখানে পড়িয়া ছিল এবং আমার টানাটানিতে উহা গলিয়া গিয়াছে। এখানেও দেখিতেছি যে সেই জ্ঞান বলিয়া কোন জ্ঞান নাই।

ইহার পর মা তাঁহার হাসিকান্না সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, অনেক সময় তোমরা দেখিতে পাও যে একটা সামান্য বিষয় লইয়াই এ দেহ হাসিয়া অস্থির হয়। কান্নার বেলায় ও এইরূপ হয়; কিন্তু যাহা উপলক্ষ্য করিয়া এই হাসিকান্না হয় উহা কিন্তু উহার প্রকৃত কারণ নয়।

আমি। হাঁ, তুমি পূর্বে একবার বলিয়াছিলে যে অতীত বা ভবিষ্যতের কোন কোন ঘটনা তোমার দৃষ্টি পথে আসিয়া পড়ে বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে।

মা। হাঁ, পূর্বে এইগুলি বেশী হইত। কেহ যদি দুঃখে, শোকে ব্যাকুল ভাবে এ দেহের বিষয় চিন্তা করিত তবে তাহার শোকের তীব্রতা অনুযায়ী এ দেহের অস্থিরতা ও সেইরূপ প্রকাশ পাইত, অর্থাৎ তোমরা উহা দেখিতে পাইতে।

রাত্রি ১১।টা বাজিয়াছে দেখিয়া দিদি মাকে শয়ন করিবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিলেন। আমরাও মাকে প্রণাম করিয়া হলঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)



আপনাকে জানা-আপনাকে পাওয়া

— শ্রী জগদীশ্বর পাল

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অমৃত কথায় বাণীতে উপদেশে আপনাকে জানা আপনাকে পাওয়ার অনুসরণ শুনতে পাই। সংযম সপ্তাহে, সংসঙ্গে, গীতা জয়ন্তীতে, ভাগবত পারায়ণের মূল উদ্দেশ্য নিজেকে জানা, নিজেকে পাওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। বলেছেন আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। বলেছেন, কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে, কোন সকালে ডাক দিয়েছ কেউ তা জানেনা।

সাধক কবি রাম প্রসাদ গেয়েছেন, এমন মানব জীবন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।

যোগী ঋষি তথা শাস্ত্রকাররা বলেছেন প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথে ৮৪ লক্ষ যোনি পেরিয়ে আমরা মানুষ হয়েছি। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায়, যার হুঁস আছে সেই মানুষ। তাঁর ভাষায়, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যে ভগবান লাভ করা। প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথ পরিক্রমা করে এসে আমরা মন পেয়েছি মানুষ হয়েছি। মন পাবার পর আমাদের প্রাকৃতিক বিবর্তন শেষ হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা ভগবত্তা লাভ করবো। এই জন্যই জপ, তপ, ধ্যান, ধারণ, পূজা, পাঠ প্রভৃতি। হিন্দুর ১২ মাসে ১৩ পার্বন এই জন্যই। শ্রী অরবিন্দর অতি মানস এবং আধমানস প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য।

বলা হয় আত্মার তিন যাত্রার কথা — Journey from God to man, man to God & journey within God. পরমাত্মা থেকে আত্মার বিচ্ছুরণ আত্মার পরমাত্মার প্রতিগতি এবং পরমাত্মা তথা ভগবানের ভিতরে অনন্ত যাত্রা, ভগবান এক ছিলেন লীলাচ্ছলে বহু হয়েছেন, আবার এক হবেন এই তাঁর লীলা।

আমরা মানুষ হয়েছি, মন পেয়েছি, ভালমন্দ বিচার করবার অধিকার এসেছে। আমাদের বহিঃপ্রাণ ইন্দ্রিয় সব সময় হাতছানি দিচ্ছে স্থূল জগতের আনন্দ উপভোগ করার জন্যে। আমরা সবার মধুর উপভোগে জড়িয়ে পড়ছি। এই উপভোগের শেষ নেই। কামনা বাসনায় জর্জরিত হচ্ছি। শরীর ও মন ক্লান্ত হচ্ছে। জরা, ব্যাধি আক্রমণ করছে। কাল রাজ্যের নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি। আবার পূর্বজীবনের কর্মফল ভোগ করবার জন্য জন্ম গ্রহণ করছি। এইভাবে যুগ যুগ কেটে যাচ্ছে। এরপর আসে ক্লান্তি আর অবসাদ। তখন বলি আর পারছি না। তখন বলি, মা ভগবান পরমাত্মা পরমেশ্বর আর পারছি না। আমি তোমার শরণাগত আমাকে মুক্ত কর। তখনই মা দায়িত্ব নেন। তাই পূর্বে নয়। এখানে মায়ের ভাষায়, মা মানে আত্মা, আত বাদ দিলে মাই থাকে। শরণাগত না হলে মা দায়িত্ব নেন না। তাই চতীতে নারায়ণী স্তুতিতে পাই—

শরণাগত দীনান্ত পরিব্রাণ পরায়ণে। সর্বসার্থি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে। একাদশ অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোকেও একই কথার পুনরুক্তি দেখি — দেবি প্রপন্নার্থি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য। প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং তুমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য। গীতাতেও দেখি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন যখন অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বললেন, কার্ণ্য দোষপহত স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছেষ্যস্যামিচ্ছিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। দীনতাদোষে আমার শোধ্য তেজাদিয়ুক্ত স্বভাব অভিভূত ও আমার চিত্ত স্বধর্ম বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা নিশ্চয়পূর্বক বলুন। আমি আপনার শিষ্য আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন। এর পরেই ভগবান উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন এবং চরম এবং পরম উপদেশ দিলেন অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ নম্বর শ্লোকে — সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। সকল ধর্মধর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব।

প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, শরণাগতি কি ভাবে আসবে ?

গীতায় ভগবান বলেছেন — চার থাকের ভক্ত আমাকে চায়, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (৭ম অধ্যায় শ্লোক ১৬) আরও বলেছেন চার প্রকার ভক্তের মধ্যে একাকী তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। (শ্লোক সংখ্যা ১৭) সবাই আমার প্রিয়। কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কিন্তু বহু মানুষ আছেন যাঁরা ভক্ত নন, যাঁরা ভগবান বিশ্বাস করেন না, যাঁদের জীবন দর্শন হচ্ছে খাও দাও আর মজা লুটো। শাস্ত্রে চতুর্ভূতের কথা বলা হয়েছে — ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই অবিশ্বাসী মানুষরা ধর্মে এবং মোক্ষে বিশ্বাস করে না। অর্থ এবং কামই তাদের জীবনে পরম সুপথ। গীতায় শ্রী ভগবান এদের সম্বন্ধে বলেছেন, এরা অসুর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। এদের ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম বিষয়ে নিবৃত্তি নেই। এরা বলে জগৎ সত্যশূন্য ধর্মধর্মের ব্যবহৃৎহীন। কামবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই সংসারের উৎপত্তি। ইহার উৎপত্তির অদৃষ্ট- ধর্মধর্মাদির অন্য কারণ নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ভক্তদের নিয়ে, যারা নিজেদের জানতে চায়, আত্মজ্ঞান লাভ করতে চায়, তাদের নিয়ে, স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে।

আমাদের জ্ঞানী ভক্ত হতে হবে। প্রশ্ন হল, কি করে আমরা জ্ঞানী হব, কি করে আত্মজ্ঞান লাভ করব ? সংস্কৃতে বলা হয়, আত্মানং বিদ্ধি। ইংরেজীতে বলা হয় Know thyself.

রবীন্দ্রনাথ পূজার গানে গেয়েছেন “আমাকে যে সব দিতে হবে, আমার সকাল আমার সন্ধ্যা তোমারই নাম বলব বলব নানাছলে। তোমাকে যে হয়নি পাওয়া সে কথা রয় মনে।”

অতুল প্রসাদ গেয়েছেন — হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন তিনটান এক হলে তাকে (বা আমাকে) পাওয়া যায়।
বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতির প্রতি টান এবং মায়ের সন্তানের প্রতি টান।

আচার্য্য শংকর বলেছেন — মনুষ্যত্ব, মুমুক্শুত্ব এবং মহাপুরুষ সংশ্রয়র কথা।

চণ্ডীদাস বলেছেন — সবার উপরে মানুষ সত্য। দেবতারাও এই মনুষ্যদেহ ধারণ করবার জন্য উদ্গ্রীব, কেননা এই মনুষ্যদেহের মাধ্যমেই সং চিৎ আনন্দের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব, বলেছেন মহাপুরুষরা।

মা বলেছেন — হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যাথা। যদি পারে যেতে চাও, তবে শুধু তাঁরে চাও, তাঁকে না পাওয়ার ব্যাথা তাঁকে পাওয়ার সহায়ক। একান্ত না হলে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায় না। শুধু এককে ধর।

আপনাকে জানা এবং আপনাকে পাওয়ার জন্য মা আমাদের ডাক দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। স্বভাব থেকে অভাবে এসেছি, আবার স্বভাবে ফেরবার পালা। ক্ষুদ্র অহং থেকে পূর্ণাহং এ। কাঁচা আমি থেকে পাকা আমিতে পৌঁছাতে হবে। এই গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার একটাই মাত্র শর্ত, আমাকে সব দিতে হবে, এক মন হতে হবে। আমরা কি তা পারব না ?

কবির গান দিয়ে শেষ করি — আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে, তোরা কে যাবি পারে তোরা আয়।



विनि

दिदि गुरुप्रिया



“अक्षजलि”

দিদি

— ব্রহ্মচারী নিব্বাণানন্দ

শ্রীশ্রী মায়ের গুরুপ্রিয়া, স্বামী অখণ্ডানন্দজীর খুকুনী, কন্যাপীঠের মেয়েদের দাদাতাই ও আমাদের সকলের সার্বজনীন স্নেহময়ী দিদি। একাধারে শরণাগতি, কৰ্ম্মযোগ-জ্ঞান-ভক্তি ও স্নেহ প্রেম ভালবাসার করুণাঘন মূর্তি। তাঁর জন্মশত বর্ষ পালন হচ্ছে কাশীতে কন্যাপীঠে তাঁর বড় আদরের স্নেহের কুমারীদের দ্বারা। আমাকেও যাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছে, কিন্তু নানা কারণে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই দু একটি কথা লিখে পাঠাচ্ছি স্মৃতি তর্পণ করে। যদি কর্তৃপক্ষ ভাল বোঝেন তবে কেউ যেন আমার হৃদয়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্গার ভক্তদের পড়ে শোনান।

শৈশবেই মাতৃহারা যৌবনে নানা ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের ঘাটে ঘাটে অজানার উজানে ভেসে চলা এক দিশাহারা পথিকের আশ্রয় মিলেছিল দিদির স্নেহাঞ্চল ছায়ায় ও শ্রীশ্রী মায়ের অভয় আশ্রমে। সে আজ কতদিনের কথা। সঠিক মনে না থাকলেও মনে হয় সেটা ১৯৪২ সন ইংরাজী হিসাবে। তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এস্ সি পড়ি।

মায়ের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গান্ধীর্ষ্য তখনও তাঁকে আড়াল করেই থাকতো। সাহস সঞ্চার করে কিছু বলতে পারতাম না। অথচ মায়ের কাছে কাছে থাকা ও তাঁর সঙ্গই ছিল জীবনের ধ্রুবতারা। তখন দিদিই ছিলেন আমাদের সবার আশ্রয় স্থল ও ভরসা। দিদি আমাদের সর্বদাই অভয় দিতেন ও ভরসা দিতেন- “রাখ না, দেখ না মা কি করেন, আমি সময় ও সুযোগ মত মায়ের কানে কথাটা তুলবো।” আর সত্যিই দিদির কঠোর বাইরের আবরণের আড়ালে যে একটা স্নেহসিক্ত কোমল হৃদয় ছিল তার খোঁজ ক’জন পেয়েছেন।

অগণিত ভক্তদের নানান আবদার অনুরোধ অত্যাচার থেকে মাকে রক্ষা করতে দিদিকে একটা বাহ্যিক কঠিন আবরণের ভান করতে হত। দিদির একাধারে স্নেহ কোমল মূর্তি ও মায়ের সেবার জন্যে একাধারে দশভুজা মূর্তি ও আবার ভক্তদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে দিদির সেই রুদ্রমূর্তি, সেই বাহ্যিক ফ্রোড কষায়িত গোল গোল চোখ কে না দেখেছে? কিন্তু দিদি ছিলেন অনন্ত স্নেহ-মায়া-করুণা-ক্ষমার উৎস।

আজকে শ্রীশ্রী মায়ের নামে যে সব আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান জগৎ কল্যাণে কর্মরত তার প্রাণপুরুষ দিদি গুরুপ্রিয়াদি। তাঁর একটা হাতকাটা waist coat ছিল, তার পকেটেই ছিল আজকের আনন্দময়ী সংঘের সূতিকাগৃহ। একাধারে মায়ের সেবা যত্ন, ভক্তদের জন্যে রান্না বান্না, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, দিন প্রতিদিন ডায়েরী রাখা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। মা ত কিছু করতেন না, দিদির মাধ্যমেই তাঁর প্রকাশ। তা না হলে এতগুলি আশ্রম প্রতিষ্ঠার সুচারু সঞ্চালন ও ব্যবস্থাপনা, কন্যাপীঠ স্টুডেন্টস মাতৃনির্দেশমত চালানো, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও তার সুব্যবস্থা কি ভাবে সম্ভব।

এবারে আমার ২/৪ টি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কীৰ্ত্তন করি।

দিদি আমার সন্ধ্যাবন্দনার গুরু। শিশুকালে উপনয়ন হলেও কালের প্রভাবে তার মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝার মত বয়স ছিল না। একবার আলমোড়ায় মা আমাকে রান্না করতে শেখান। সকলকে ও বিদ্যাপীঠের ছেলেদের তা দিতে গেলে তারা নিতে অস্বীকার করে। মুক্তিবাবা বলেন, “তুমি সন্ধ্যা পূজো কর না, ওরা তোমার হাতে খাবে না।” মাকে জিজ্ঞেস করতে “তুমি, আমার হাতে খাবে ত?” মাও বলেন, “তুমি, সন্ধ্যা না করলে তোমার হাতে আমি খাই কি করে?” তখন মাকে বলি, “বেশ, সন্ধ্যা করবো, তবে ত আমার হাতে খাবে।” দিদি তখন সেই রাত্রে ১০টা বেজে গেছে- ছেলেরা তাদের শেষ প্রার্থনা ‘মা আছে আর আমি আছি’ ইত্যাদি গেয়ে শুয়ে পড়েছে, কান্দিভাই ছিল বিদ্যাপীঠের ইনচার্জ, তাঁকে ডেকে তুলে তখনি পৈতা গ্রহি দেওয়া হল। পরদিন মস্তক মুণ্ডন করে পঞ্চগব্য খেয়ে দিদি আমায় ব্রহ্মগায়ত্রী সামবেদী সন্ধ্যা করতে শেখান। সে সব দিন কি কভু ভুলবার। শত ব্যস্ততার মাঝেও দিদির সदा জাগ্রত স্নেহ দৃষ্টি।

মা আমাকে রান্নার হাতে খড়ি দিলেও দিদিই আমাকে রান্না করতে শেখান। তখন সে সব কি দিন ছিল। শত দিকে শত কাজ। তার মধ্যেও নিজের হাতে মাকে নানা বাঙালদেশের রান্না, তিতার ডাল, লাউর ঘন্ট, শুক্লা, মোচার ঘন্ট, মরিচ ঝোল, আলু বেগুন ঝোল, আলুকপি ঝোল, সব একহাতে দশভুজা অন্নপূর্ণা হয়ে রান্না করতেন। কী তার অপূর্ব স্বাদ। এখনো মুখে লেগে আছে যেন। যখন বলতাম কি করে তুমি এত ভালো রান্না কর? কিন্তু কি বিনয় ও আত্মবিলোপ। “না রে, এসব আমার হাতের গুণ না, সবই মায়ের প্রসাদ কিনা, তাই তার এত স্বাদ।” কি গোছগাছ ছিল সব কাজের। তরকারী পাতি সব থরে থরে কাটা থাকবে। তেল, ঘী, মসলা পাতি সব সাজানো, ৪/৫টা কাঠ কয়লার আঙ্গুঠী গনগন করে জ্বলবে। দিদি এসে একটা ঘূর্নিঝড়ের মত সব রান্না করে মাকে খাওয়াতেন। মা না শোওয়া পর্যন্ত তাঁর জ্বল গ্রহণ করার সময় নেই। খাবার সময় কতদিন হয়েছে মাত্র বসবেন হয়তো মা ডেকেছেন— অমনি খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলেন, হয়ে গেল খাওয়া। কোনদিন হয়তো খেতে বসবেন, আরে সন্ধ্যা করেছি ত? তখন সন্ধ্যা করতে বসলেন, তবে মুখে মুখে দুটো গোত্রাসে গিললেন। সदा জাগ্রত দৃষ্টি লক্ষ্য মায়ের দিকে। এমন আত্মবিলোপ কে কবে দেখেছে- শুনেছে?

অথচ মায়ের প্রতি কি ভক্তি শ্রদ্ধা— আমাদের সর্বদা বলতেন, “তোদের ভয় ডর নেই, কার সঙ্গে এমন মান অভিমান রাগ জেদাজেদি করিস্! এ ত সাক্ষাৎ জগৎমাতা মহাশক্তি, সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত আগুন নিয়ে খেলিস, তোদের ভয় করে না।” মায়ের প্রতি সর্বদা সর্বতোভাবে সর্বাবস্থায় বিনাসর্গ সমর্পণ। অহং এর পূর্ণ আত্মবিলোপ।

মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “তুমি কি চাও?” উত্তরে বলেন, “ইচ্ছে থাকলেই কষ্ট। সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর হাতের যন্ত্র হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আস্তাকুড়ের এঁটো পাতাকে হাওয়া যেমন খুশী য়েদিকে খুশী নিয়ে যায়। তার কি কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে?” দিদি সর্বতোভাবে মায়ের চরণে সমর্পিত প্রাণ। হরিবাবা বলেন, ‘মাকে সুস্থ করে দিতে প্রার্থনা কর।’ দিদি বলেন, ‘তিনিই দিয়েছেন, যখন ভাল বুঝবেন, যা করার করবেন।’ এমনি ছিল দিদির জ্বলন্ত বিশ্বাস ও সমর্পণ।

জয় মা!



দিদি ও মায়ের কাছে

— তাপস কুমার সোম

দিদির কথা লিখতে গেলে মায়ের কথা এসে পড়ে। ‘মা’কে নিয়েই ত দিদি। মায়ের নামে যেমন একটা স্নেহ ভালবাসার ছোঁয়া আছে, একটা পরম নির্ভরতার ভাব আছে, দিদির নামে তারই প্রতিচ্ছবি। এখানে আমি সর্বব্যাপক মা ও দিদির কথা আলোচনা না করে, কি ভাবে শ্রীশ্রী মা ও দিদি গুরুপ্রিয়ার সান্নিধ্যে এলাম, তারই একটু বর্ণনা করব।

মা আনন্দময়ীর নাম আমি প্রথম শুনি ১৯৫৩ সালে মে মাসে, শিলংএর বাড়ীতে। সেই সময়ই দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীরও নাম জানতে পারি। শ্রীশ্রীর কলেজ ছুটি। শিলংএ রিলবংএর বাড়ীতে গেছি বাবা (তমোনাশ সোম) ও দাদা-বৌদি, ভাইবোনদের সাথে ছুটির কয়েকটা দিন কাটাতে। গর্ভধারিণী মা অনেক বছর হল গত হয়েছেন। বাবার অবসর জীবন, পূজা পাঠ নিয়ে একটু নির্লিপ্তই থাকতেন। সে সময় বাড়ীতে নানা সমস্যা। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিলই।

এই রকম পরিস্থিতিতে আমার এক দাদার সাথে একজন গৃহী সাধক বাড়ীতে আসেন। সৌম্য দর্শন, শ্যামবর্ণ, ছোটখাট মানুষ, উন্নত ললাট, আয়ত চক্ষু, পরিধানে সাদা ধূতি, সাদা হাফ সার্ট, পায়ে লাল কেশিসের জুতো। নাম তাঁর শ্রী গজেন্দ্র কুমার দে। বাড়ীতেও থাকতেন কখনও। দেখতাম, তাঁর মাঝে মাঝে ভাব হেত। ভাবে নানা কথাও বলতেন। চাহিদা ছিল না কোন। কথা বলতে ভাল লাগত। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি কেন এসেছেন। বললেন, ‘মা’ পাঠিয়েছেন। কোন ‘মা’ জিজ্ঞাসা করিনি। ওনার বিস্তারিত পরিচয় বা সাধন ধারা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগেনি মনে। কথায় কথায় উনি একদিন বললেন, জীবনে উন্নতি করতে হলে, চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) লাভ করতে হলে সঙ্গুরুর আশ্রয় লাভ প্রয়োজন। উনি বললেন, বর্তমানে বাংলাদেশে আদ্যাপীঠের বিমলা মা এবং দেওঘরের শ্রী অনুকূল ঠাকুর সঙ্গুরু স্থিতিতে আছেন। কিন্তু তোমাকে অন্য এক মাতাজীর কাছে যেতে হবে, নাম তার ‘মা আনন্দময়ী’। অবাক্ হলাম। বললাম এই নামত কখনও শুনিনি বা বইএ পড়ি নি। উনি বললেন — ‘মা সাধারণতঃ উত্তর ভারতেই থাকেন, খুব উচ্চ স্থিতি।’ জীবন্ত ভগবান বলে উল্লেখ করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম কি করে যোগাযোগ হবে? বললেন প্রার্থনা, চিঠির মাধ্যমে প্রার্থনা জানাতে হবে। উনি বেনারস ও দেৱাদুন আশ্রমের ঠিকানা দিলেন এবং বললেন গুরুপ্রিয়া দেবী ওনার প্রধান সেবিকা। তাঁর কাছেই চিঠির মাধ্যমে মাকে প্রার্থনা জানাতে। গুরুপ্রিয়া দেবীকে ‘দিদি’ বলে সম্বোধন করতে বললেন। কিভাবে লিখতে হবে তার খসরাও বলে দিলেন।

এই প্রথম মা ও দিদির নাম শুনি। খরগপুর কলেজ হোস্টেলে এসে পত্রালাপ শুরু করি দিদির সাথে। প্রার্থনা জানাই মাকে, কিন্তু চিঠির উত্তর আসে ৪/৫ মাস পর।

দিদি গুরুপ্রিয়া লিখছেন —

বেনারস

৩/১১/৫৩

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। মাকে চিঠি শুনাইয়াছি। মা বলিলেন, ‘উপস্থিত কর্তব্যপালন। সত্য লাভই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। সেই লক্ষ্যে সদগ্রন্থাদি পাঠ, জপ-পাঠ, নিত্য একটু গীতা পাঠ করণীয়।’

পূজা এবার দেবাদুনে। আমরা ৬ই দেবাদুন রওনা হইতেছি।

ভালবাসা নিও। ইতি — দিদি গুরুপ্রিয়া

দিদির এই চিঠি ও মায়ের বাণী মনে অনাবিল আনন্দ এনে দিল। যদিও প্রার্থনা জানিয়েছিলাম ভুক্তি ও মুক্তির মায়ের কথা ও উপদেশ পেলাম! কিন্তু পালনের তাগিদ কোথায়! হোষ্টেলে ছাত্রমহলে একটু আড়ালেই ধর্মীয় বই পড়ি। গীতার কথা শুনেছি, বাবা পড়তেন। শ্রী অরবিন্দের গীতার ভূমিকা পড়েছি। কিন্তু মূল গীতা নাড়াচাড়া করি নি। এই প্রথম গীতা নিষ্ঠাভাবে পড়া শুরু করলাম। জপ পাঠ কি জানি না।

দিদিকে চিঠি লিখি। উত্তর আসে কয়েক মাসে পর। উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। এর মধ্যে সেই মহাত্মার প্রেরণায় বড়বৌদি (৮বাণী) কলকাতায় সংযম সপ্তাহে মায়ের কাছ থেকে নাম পান। সেই সূত্রে দুএকটা মায়ের সম্বন্ধে বই হাতে আসে। ১৯৫৩ সনের বড় দিনের ছুটিতে ‘মা’ আছেন দমদমের উপকণ্ঠে শ্রী আপতাপ মিত্রের বাগান বাড়ীতে। বড় বৌদিকে নিয়ে মাতৃদর্শনে যাই। দেখলাম, বাগানে ভক্তদের সামনে বসে গৌরবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মাথার উপর চূড়ার মত করে চুলবাঁধা। মা ভাবস্থ হয়ে গাইছেন অপেক্ষাপ গান — “শ্রেয় ভগবান, ধ্যেয় ভগবান, প্রেয় ভগবান, শ্রেয় ভগবান, হা, ভগবান।” বড় ভাল লাগছিল ঐ পরিবেশ। সে যাত্রা দূর থেকে প্রণাম করে ফিরে আসি। মনে জাগে প্রশ্ন, ভগবান রূপী মায়ের সাথে কি করে কথা বলব। কি বলব? এরপর আবার দিদিকে চিঠি দিই কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর চেয়ে। প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরও এলো প্রায় ৮ মাস পর। ইতিমধ্যে একডালিয়া আশ্রমে খবর পেলাম ১৯৫৫ সনের দুর্গাপূজা হবে কলকাতায় লেক টেরেসে। মা আসবেন, গুরুপ্রিয়া দিদিও আসবেন। আমার তখন পাঠক্রম শেষ হয়েছে। কলকাতায় এক বিদেশী কোম্পানীতে শিক্ষানবিশ হয়ে যোগদান করেছি। থাকি মহানির্বাণ রোডে এক দিদির বাড়ী।

লেক টেরেসও কাছেই। খবর নিয়ে জানলাম দুর্গাপূজা ওখানেই হবে, তবে মা থাকবেন এক ভক্ত বাড়ীতে এবং দিদি গুরুপ্রিয়া আশ্রমবাসীদের নিয়ে কাছেই একটি বাচ্চাদের স্কুল, চিল্ড্রেনস্ কর্ণার- এ থাকবেন। ভালোমত এবার নিশ্চয়ই যোগাযোগ হবে মায়ের সাথে। জীবনের একটা হৃদিস্ মিলবে। এক সন্ধ্যাবেলা গেলাম দিদির সাথে দেখা করতে। দিদির অনুমতি পেলেই

ত মাতৃদর্শন ও মায়ের সাথে কথা হবে। এই প্রথম দিদিকে দেখা। বিছানায় শুয়ে আছেন। গৌরবর্ণা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মোটা সোটা চেহারা, বয়স্কা, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। পরিধানে বাসন্তী রংএর কাপড়। প্রণাম করলাম। দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন দিদি। তারপর সাহস করে বললাম যে শিলংএর এক মহাত্মা বলেছেন শ্রীশ্রী মায়ের কাছ থেকে আমার দীক্ষা নেওয়া একান্ত কর্তব্য। দীক্ষা জিনিষটা কি, তখনও সঠিক জানিনা। দিদি আমার কথা শুনে যেন হঠাৎ রেগে গেলেন। জোর গলায় বললেন, ‘মাত দীক্ষা দেন না। হবে না।’ দিদির সেই মূর্তি ও হাব ভাব ও কথাবার্তা শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আশা করেছিলাম স্নেহময়ী দিদির কাছে স্নেহমাখা কথা। উত্তরে বলতেও পারলাম না দিদির চিঠির কথা যাতে তার ইঙ্গিত ছিল। মা বলেছিলেন, “তৎজ্ঞানে সবকাজ সমাধান মানুষের কর্তব্য। গুরু উপদেশে ধ্যানের ক্রম পেতে হয়। গুরু উপদেশ গ্রহণীয়।” কিন্তু একি হোল। মনে হোল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এখন কি করব? কোনও রকম প্রণাম করে বিষয় মনে চলে এলাম। আর ও মুখো হইনি ভয়ে। পরে শুনেছিলাম দিদি অসুস্থ ছিলেন, হারপিসে কষ্ট পাচ্ছিলেন। মাত এমনি দীক্ষা দেনও না! হয়ত সময় হয় নি।

যাক্, পূজামণ্ডপে মায়ের দর্শন হোত। মা এসে রোজ বসেন পূজা মণ্ডপে তাঁর জন্য রাখা একটি বিশেষ আসনে। সামনে একচালি দুর্গা প্রতিমা। নিষ্ঠা ভরে পূজা করেন একজন ব্রহ্মচারী, সাথে আরও ২/৩ জন সাহায্যকারী। সুন্দর প্রতিমা, অপূর্ব পরিবেশ পূজা মণ্ডপে। শ্রীশ্রী মায়ের চেহারায় একটা দিব্যভাব ফুটে উঠত পূজার সময়। বহু ভক্তের সমাগম। দূর থেকে বা কখনও সামনে গিয়ে মাতৃদর্শন করতাম, কাছেত যাওয়ার উপায় নেই। মা যখন চলে যান, ভক্ত-বৃহ ভেদ করে কাছে যাওয়া ত সম্ভব নয়। কাউকে চিনিও না। এই ব্যাপারে একটু লাজুকও ছিলাম। বাড়ীতেও বলতাম না, যদি কিছু বলে। মা কাছে এলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস মার কাছে যেতে পারলাম না। সামনে গিয়ে প্রণামও করতে পারলাম না। যে বাড়ীতে মা থাকবেন খোঁজ নিয়ে সেখানেও যাইনি — দিদি ত না বলে দিলেন। মনের অব্যক্ত ব্যথা আর কাকে জানাব! শিলংএ সেই মহাত্মাকে জানালাম।

এরপর কাজে মন দিলাম। কর্ম যোগাযোগে সেই কোম্পানী থেকে ইংলাণ্ডে শিক্ষানবিশীর জন্য যাওয়ার ব্যবস্থা হয় ১৯৫৬ এর অক্টোবর মাসে। বিদেশে পাড়ি দেবার আগে শিলং যাই বাবার সাথে দেখা করতে। সেখানে সেই মহাত্মার সাথেও দেখা করি। বলি পরিস্থিতির কথা, দীক্ষা ত হোল না। এবার কি উপায়। উনি আমায় দোষারোপ করলেন, কেন আমি মায়ের কাছে ব্যবস্থা করে যাই নি। বললেন, বিদেশে গিয়ে আবার চিঠিতে দিদি ও মায়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে। আর ওনাকেও চিঠি দিতে।

বোম্বে থেকে একজন সতীর্থের সাথে জাহাজে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ওখানে পৌঁছে গেলাম বাথএর কাছে চিপেন হাম শহরে ওদের কারখানায়। একটা গ্রাম্য হোটেলের থাকার ব্যবস্থা। পরিবেশটা খুবই ভাল। সেখানে তিন মাস থাকতে হবে। তারপর লণ্ডন এ হেড অফিসে।

মাকে ও দিদিকে চিঠি লিখলাম মায়ের আশীষ চেয়ে। মাস কয়েক পর উত্তর এলো লণ্ডনের ঠিকানায়। আনন্দ হোল দিদির চিঠি পেয়ে। তাহলে দিদি ও মায়ের খেয়াল আছে।

দিদি লিখছেন—

দেৱাদুন

২০/৪/৫৭

মাকে তোমার চিঠি শোনান হয়েছে। মা বললেন, যেমন ছেলোটি গেছে, তেমন যেন ফিরে আসে। কোন অন্যায় আবহাওয়ায় আকর্ষণ জীবন নষ্ট না করে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা করা। ভগবানের উপর নির্ভর। তাঁর ধ্যান, জপ এবং নিত্য গীতা পাঠ এবং নিত্য নমস্কার। নিত্য তাঁর নাম সর্বদা স্মরণে রাখবার কেবলই চেষ্টা।

মার বাণী পাঠালাম। এ সর্বদা মনে রাখবে। মা যা বললেন তাই করবে।

তুমি আমার ভালবাসা জেনো। ইতি— দিদি গুরুপ্রিয়া

এরপর প্রায়ই জানাই নিজের কথা ও মায়ের কৃপা প্রার্থনা চিঠির পর চিঠিতে। ২/৩ মাস পর উত্তরও আসে মায়ের মন্বস্পর্শী অভয় দায়িনী উপদেশ সহ দিদির চিঠি।

একটা চিঠিতে দিদি লিখছেন—

দেৱাদুন

১৮/৭/১৯৫৭

তোমার চিঠিখানা মাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে মা যাহা বলিয়াছেন তাহা দেওয়া হইল— “প্রাণের ঠাকুর প্রাণের ডাক আসিলেই হয়। তিনি অখণ্ড পূর্ণ। তাঁহার প্রতি অখণ্ড লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই তিনি লক্ষ্য পূর্ণ করেন। তাঁহার করুণায় সব সম্ভব। সর্ব অবস্থায় তাঁহার উপর নির্ভর তাঁহাকেই স্মরণীয়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সব কিছু সম্ভব। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে গেলে তিনি সব কিছু সরল করিয়া দেন। নিত্য গীতা পাঠ, জপ, ধ্যান, প্রণাম, সংগ্রহাদি পাঠ। বৃথা সময় নষ্ট না করা। কর্তব্য কাজ সমাপ্তের চেষ্টা। হরিকথায়, হরি চিন্তায় মনটা রাখিতে চেষ্টা কেবল করণীয়।”

আশাকরি মার কৃপায় তুমি ভাল আছ। তুমি আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

এইভাবে পত্রালাপে দিদির সাথে পত্র-মিতালী হল। দিদি যেন কত কাছের মানুষ।

এর মধ্যে মায়ের সম্বন্ধে কয়েকটা বই পড়েছি। পড়তে শুরু করেছি সংঘ প্রকাশিত ‘আনন্দবার্তা’ পত্রিকা যেখানে আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ ছাড়া থাকত মায়ের লীলা কথা, মায়ের ভ্রমণ কাহিনী। ভাল লাগত। থাকতাম একটি ভারতীয় হোষ্টেলে। প্রতি রবিবারে যেতাম লণ্ডনের

বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্রে। অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দের সংস্পর্শ ও সংসঙ্গ ভালই লাগত। মায়ের একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব অনুভব করতাম। এর মধ্যে বিদেশে এক বছরের জায়গায় প্রায় দুই বৎসর থাকতে হল। শেষ দিকে আবার যেতে হল চিপেনহামে মূল কারখানার ডিজাইন বিভাগে কাজের জন্য। পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকতাম এক বিদেশীর বাড়িতে। মোটামুটি পরিবেশ। সেই সময় কোন কারণে আমার কথিত সেই মহাত্মার সাথে শিলংএর বাড়িতে তাঁর কিছু ক্রিয়া কর্মে গোলমাল হয়। একটা অশুভ প্রভাব পড়ে। আমার সাথেও পত্রে বিপরীত ভাবের প্রকাশ হয়। সে সময় শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ি। দেখা দেয় স্নায়ুবিক দৌর্বল্য। হাসপাতালে যেতে হয়। ভাবি কেন এমন হল। কি করব? মাকেত চিঠিতে জানাতে পারছি না সব কথা। তবুও কিছু লিখি দিদিকে। দেহাদুন থেকে ৬/১০/৫৮ তারিখে লেখা স্বামী পরমানন্দের চিঠি এল, “মা বলিলেন, হরি চিন্তা ছাড়া মন শান্ত হয় না। সত্যের দিক দিয়া অগ্রসরের দিক নিতে হয়। একবার দেশে আসতে চেষ্টা কর না। অনেক দিন ত ওখানে আছ!”

দেশে ফেরার ব্যবস্থা হয়। লণ্ডনে এসে দেখি প্লেনে কলকাতার ফেরার টিকিট হয়েছে। মাতৃদর্শনের জন্য আমার মন উতলা হয়েছে। এই অবস্থায় মাই একমাত্র ভরসা। দীক্ষা নাই বা হল। চিঠিতে জেনেছিলাম দিদি দিল্লী আশ্রমে আছেন, অসুস্থ। মা যাবেন এলাহাবাদে কোন ভক্তের আহ্বানে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে। ভাবলাম কলকাতায় গেলে ত মায়ের কাছে যাওয়া হবে না। তাই চেষ্টা করে টিকিট বদল করলাম—বোম্বেতে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে এসে, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ এর প্লেনে দিল্লীতে যাবার। উদ্দেশ্য দিদির সাথে দেখা করা। তারপর মা।

অর্থার্থী হয়ে শুরু করেছিলাম জীবন। জিজ্ঞাসাত তেমন জাগেনি। কিন্তু আর্ত হয়েই মায়ের কাছে আসি। রাস্তায় চিন্তা, কেন এমন হোল? মাকে কি করে বলব সব কথা! রাস্তায় শুধু প্রার্থনা করি, মা কল্যাণ কর, মঙ্গল কর, রক্ষা কর।

১৯৫৮ ইংরাজীর ১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছলাম দিল্লীর পালাম এয়ারপোর্টে। জনপথ হোটেলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হোটেলের এসেই গাইড থেকে ফোন নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করলাম কালকাজীতে মায়ের আশ্রমের সাথে। ফোনে কথা বললেন শ্রী কমল ব্রহ্মচারী (তখনও চিনি না)। উনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানালেন কি ভাবে আশ্রমে আসতে হবে। পরদিন খুব ভোর বেলা একটা অটো নিয়ে হাজির হলাম কালকাজী আশ্রমে।

এই দিল্লীর কালকাজী আশ্রম ভক্তদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৪ সনে। তখন সবে মাত্র বড় জায়গা নিয়ে আশ্রম তৈরী হয়েছে। গোলাকৃতি আশ্রম! মাঝখানে নামব্রহ্ম মন্দির, চারদিকে বারান্দাসহ চারটা ঘর। উপরে মায়ের থাকার ঘর। কোন বিগ্রহ নেই তখনও। দিদি আছেন একটি ঘরে। শ্রী কমল ব্রহ্মচারীর সাথে দেখা। উনি কিছু কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে দিদির কাছে নিয়ে গেলেন। দিদি শুয়ে আছেন। প্রণাম করার পর দিদি সন্মুখে কথা বললেন অনেক। কোথায় কলকাতায় দেখা দিদির রুদ্রমূর্তি, আর কোথায় স্নেহ ভালবাসার প্রতিমূর্তি দিল্লী

আশ্রমের দিদি। দিদি বললেন, ‘তুমি দেবী আর করো না। আজই দিল্লী-কালকা মেলে এলাহাবাদ রওনা হয়ে যাও। এক ভক্ত শ্রী বিষ্ণেশ্বরী প্রসাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মা থাকবেন। তুমি বিন্দুদের বাড়ীতে (৩ নীরজ মুখার্জির বাড়ী) উঠবে।’ ব্রহ্মচারীজী বিন্দুদাদের বাড়ীর ঠিকানা ও স্বামী পরমানন্দজীর নামে দিদির কথা অনুযায়ী একটা চিঠি লিখে দিলেন। দিদিও ব্রহ্মচারীজীকে প্রণাম করে তাঁদের আশীষ ও অভয় নিয়ে রওনা হলাম এলাহাবাদে মাতৃদর্শনে। দিদি বলে দিলেন চিঠিতে যোগাযোগ রাখতে।

পরে শুনেছিলাম এই দিদি অল্প বয়সেই মায়ের সহচরী। ১৯২৬ ইংরাজীতে ঢাকায় শাহবাগে পিতা শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন এবং পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ) ও কন্যা খুকুনী (গুরুপ্রিয়া দিদি মায়ের দেওয়া নাম) মাতৃ দর্শন করেন এবং ক্রমে দুজনই মায়ের আকর্ষণে মায়ের সেবায় লেগে যান। প্রথম দর্শনে দিদির মা বলেছিলেন— “এতদিন কোথায় ছিলে?” পরে ভাইজীকে মা আরও বলেছিলেন, “খুকুনীরও পূর্বের বিশেষ আধ্যাত্মিক সূত্রেই এই শরীরের কাছে আসা।”

সকালের দিল্লী-কালকা মেলে এলাহাবাদ রওনা হলাম। রাত ৮টা নাগাদ এলাহাবাদ পৌঁছালাম। ট্যাক্সি করে উপস্থিত হলাম ৩১ নং জর্জ টাউনে বিন্দুদাদের বাড়ীতে। বিদেশ থেকে এসেছি, দিদির কাছ থেকে চিঠি নিয়ে থাকার একটু সুব্যবস্থা হোল ওদেরই বাড়ীতে। মায়ের কাছে খবর গেল আগমনের। রাত্রে দূর থেকে প্রণাম করলাম মাকে। জানলাম কাল সকালে দেখা হবে।

পরদিন সকালে স্নান করে সকালের কাজ সেরে গেলাম পূজা মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা দেখতে ও প্রণাম করতে। এ যেন কলকাতার লেক টেরেসের দুর্গাপূজার একটা বিশেষ সংস্করণ। সুন্দর একচালি দুর্গা প্রতিমা। পূজা করছেন নিষ্ঠার সাথে একজন ব্রহ্মচারী (পরে জেনেছিলাম উনি হলেন কুসুম ব্রহ্মচারী ব্র: নির্বানানন্দজী) সাথে সাহায্য করছেন আরও ২/৩ জন ব্রহ্মচারী। মণ্ডপে এক ধারে জলটোঁকির উপর আসনে বসে আছেন শ্রীশ্রী মা ও অন্য এক আসনে গেরুয়া বসনা এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী। শুনলাম উনি শ্রীশ্রী মায়ের গর্ভধারিণী মা, বর্তমানে সন্ন্যাসিনী, নাম শ্রীশ্রী ১০৮ মুক্তানন্দগিরিজী। দিদিমা বলেই ভক্তরা ডাকে। পূজা প্রান্তরে ভক্ত সমাবেশে একদিকে চলছে পূজার মন্ত্রপাঠ, অন্যদিকে ভজন গান। অপূর্ব পরিবেশ। পূজা মণ্ডপে মায়ের দিব্য মূর্তি দেখে মন অভিভূত। বিদেশ থেকে এসে ভালই লাগছিল।

সকালের পূজার পর মা এলেন বিন্দুদাদের বাড়ীতে তাঁর জন্য তৈরী করা কুটিয়াতে বিশ্রাম করতে। আমার ডাক পড়ল মায়ের কাছে যাবার। যাঁর দর্শনের জন্য এত আকুলতা ও প্রার্থনা, সেই ভক্ত ভগবানরূপী সেই মাতৃরূপের কাছে কিভাবে যাব বা কি কথা বলব? এই প্রথম শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা আলুলায়িত কুন্তলা স্নেহময়ী মায়ের এত কাছে যাবার সুযোগ হল। মাকে প্রণাম করে সামনে বসলাম। মনে হোল একটা পরম আশ্রয় পেলাম। মা মিষ্টি গলায় নাম

ও দুয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মনে হোল স্নেহ ভালবাসার মূর্ত রূপ এই মা। বললেন, “পূজায় এখন খুব ব্যস্ত, সময় কম। অল্প কথায় তোমার কি বলার আছে বল।” অমিত নির্বাক, চোখে আনন্দাশ্রু। আস্তে-আস্তে বললাম পারিবারিক সমস্যার কথা। সেই মহাত্মার কথা। দীক্ষা শব্দটা বলার সাহস হোল না, যদি না শুনতে হয়। বললাম ঐ মহাত্মা বলেছিলেন নাম নেবার জন্য। মা যেন খুসী হলেন—বললেন, “তোমার কি এই নাম (শক্তি) ভাল লাগে।” মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—না। কারণ অব্যক্ত ভাব ছিল ব্যক্ত ভগবানকে কি ঐ নামে পাওয়া যায়। মা তখন বললেন, “তুমি তবে এই নাম কর (সেটাও শক্তির নাম)। আচ্ছা, কর গুণতে জান?” উত্তর দিলাম—না। মা তখন দেখিয়ে দিলেন কিভাবে করে সংখ্যা রেখে জপ করতে হয়। বললেন, “বাইরে গিয়ে এক হাজার জপ করো। সকালে ও সন্ধ্যায়। এখনত খুব ব্যস্ত, পরে আবার তোমার কথা শোনা যাবে।” প্রণাম করলাম। মা মাথায় হাত দিলেন। নাম পেয়ে মনে একটু শান্তি এলো আনন্দ হল। এলাহাবাদে পূজার পরিবেশ ও ভক্ত সমাগম ভালই লাগছিল। ক্রমে-ক্রমে পরিচিত হলাম স্বামী পরমানন্দজী, শ্রী পানু ব্রহ্মচারী, বিভূদা, ব্রহ্মচারী কুসুমদা, ব্রহ্মচারী তপন দা, দাসুদা ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীর সাথে। পরিচিত হলাম বিন্দুদা ও মাতৃভক্ত দাদাদের সাথে। ব্রহ্মচারিণী দিদিদেরও পরিচয় পেলাম। ওনারাইত মাকে ঘিরে থাকতেন। মার সেবা করতেন। পানুদা এক সময় বললেন, এখানে মায়ের সাথে কথা বলা ত মুশ্কিল, সময়ও কম। পূজার পর মা বেনারস যাবেন। সেখানে গেলে কথা হবে। কিভাবে যেতে হবে ট্রেনে তাও বলে দিলেন।

সেই অনুযায়ী দুর্গাপূজার পর ট্রেনে বেনারস পৌঁছে রিজ্ঞাতে আশ্রমে গেলাম। আশ্রমে থাকার ও প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন পানুদা। শুনলাম এই কাশীর আশ্রম দিদি গুরুপ্রিয়ার অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ চেষ্টাতে তৈরী হয়েছে ১৯৪৫ এ, মা কে ধরে রাখবার জন্য। এর আগে মা থাকতেন ভক্ত বাড়ীতে, নয়ত গঙ্গা বক্ষে বজরাতে। শুনলাম এই আশ্রমেই সাবিত্রী মহাযজ্ঞ হয়েছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। বহু সাধু মহাত্মা, ব্রাহ্মণ ও ভক্তজন এই যজ্ঞে যোগ দিয়েছিলেন। দেখলাম সেই যজ্ঞকুণ্ড। এখানে আছে অন্নপূর্ণা মন্দির, যেখানে মায়ের ভাবে দেখা অন্নপূর্ণা মূর্তি, শূন্য কালী মূর্তি ও শিবমূর্তি নিত্য পূজিত হয়। এই মূর্তিগুলি পূর্বে রমনা আশ্রমে ছিল। পাশেই আছে গোপালের মূর্তি। পরবর্তীকালে তা আনন্দজ্যোতি মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। শুনলাম অন্নপূর্ণা মন্দিরের সংলগ্ন ছিল একটা বড় হল ও কিছু ঘর। আজ তা গঙ্গা গর্ভে। দেখলাম দিদির অনন্যকীর্তি মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ। এখানে অল্প বয়স থেকে মেয়েরা বৈদিকধারায় ব্রহ্মচারিণী হয়ে আদর্শ শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষান্তে কেহ ফিরে যায় গৃহস্থশ্রমে, কেহবা আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকে। অনেক মেয়েই কন্যাপীঠ থেকে এম.এ., পি.এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। কেহ শাস্ত্রী বা আচার্য হয়েছেন। শুনলাম দিদির আরেক কীর্তি ডাঃ গোপাল দাসগুপ্তের সহায়তায় তৈরী ‘আনন্দময়ী করুণা’ দুই ছেলে মেয়েদের চিকিৎসার জন্য। পরবর্তীকালে এখানেই হয়েছে মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল। পরবর্তীকালে আনন্দময়ী সংঘ গঠনের পিছনেও ছিল দিদির উদ্যোগ। দিদি ছিলেন সেবা ও কর্মের চিরন্তন প্রেমিকা। তাঁর সব কিছুই একমুখী, সবই মাতৃমুখী। দিদির

ত্যাগ তিতিস্কার ফলেই গড়ে উঠেছে নানা স্থানে মায়ের আশ্রম। মায়ের সব কিছুই তার দিদির উপর। যেদিন থেকে মায়ের কাছে এসেছেন দিদি ডাইরীতে মায়ের কথা লিখে রাখতেন। সেটা মায়ের লীলা কাহিনীর অমূল্য সম্পদ। সতের খণ্ডে বইরূপে প্রকাশিত হয়েছে ভক্তদের জন্য।

মা রোজ সকালে অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে বারান্দায় বসতেন সৎসঙ্গে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ কিছু বলতেন। তাঁর মার সাথে কথা হোত। ওখানেই মাতৃ দর্শন হোত। পরিবেশ ভালই লাগত, কিন্তু মাতৃ সান্নিধ্যত পাওয়া যায় না প্রাইভেটে। চিঠিতে গুরুপ্রিয়া দিদির জানাই মাতৃ কৃপার কথা, নামের কথা। কলকাতায় দিদির ও শিলং বাবাকেও জানাই আমার ভারতে আসার কথা ও মায়ের আশ্রমে কয়েকদিন থাকার কথা। মা এক সময় বললেন, ‘এখানেত কথা হবে না। বিদ্যাচলে যাচ্ছি, সেখানে কথা হবে।’ যাওয়ার অনুমতি পেলাম। পানুদা পথ নির্দেশ দিলেন ট্রেনে যাবার।

বিদ্যাচলে অষ্টভূজা পাহাড়ের উপর মায়ের ছোট আশ্রম। ১৯২৮ সনে স্বামী অখণ্ডানন্দজী এই আশ্রম তৈরী করেন। মা মাঝে মাঝে বিশ্রামে আসেন এখানে। মায়ের সাথে গেছেন কিছু আশ্রমবাসী ও ভক্ত এবং বিশিষ্ট অতিথি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ। ওখানে মহেশ ভট্টাচার্যের অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা হোল আমার।

অল্প ভক্ত থাকায় মায়ের ঘরেই সৎসঙ্গ হত সকালে। একদিন মায়ের ঘরে শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ বসে আছেন, আর আছেন কিছু আশ্রমবাসী। মা বললেন, “তোমার কথা কি বলার আছে বলো।” কিন্তু এত লোকের সামনে কি করে বলব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কথা! আমার মুখে যেন কুলুপ আঁটা। যাক্ মা বলেছেন যখন বলতে হবেই। সাহস সঞ্চার করে অল্প কথায় বললাম, চিঠিতে মহাত্মার সাথে গোলমালের কথা, পারিবারিক সমস্যার কথা। গোপীনাথজী শুনে বললেন, “তোমার ভাবনা কি, তুমিত মায়ের কাছে আছ।” তারপর আরও কিছু কথা হলো। মন খুলে বলতে পারলাম না। মহাত্মার দুয়েকটা চিঠির বক্তব্যও বলা হলো না। মা বললেন, ‘মহাত্মার সাথে যোগাযোগ নাই বা রইল।’

ইতিমধ্যে আমার ঠিকানা পেয়ে একদাদা (সুনীল) কলকাতা থেকে আমার খোঁজে বেনারস হয়ে বিদ্যাচল আশ্রমে এসে পৌঁছায়। মায়ের দর্শন লাভ করে। মা ওকে কিছু নির্দেশ দেন এবং বলেন শিলং থেকে অসুস্থ বাবা ও বোনকে নিয়ে আসতে কলকাতায়। আমাকে বললেন কাশী আশ্রমে কালীপূজা ও অন্নকূটের পর দাদার সাথে কলকাতায় ফিরে যেতে, কোম্পানীর কাজে যোগ দিতে। বললেন, “নিজের কর্তব্য কর্ম যা নিয়েছ তা সুন্দরভাবে করতে চেষ্টা করা। ভগবানের উপর নির্ভর রাখা। কর্তব্য পরায়ণ হওয়া।”

মা কালীর পূজা উপলক্ষ্যে মা সকলকে নিয়ে বেনারস আশ্রমে এলেন। সুন্দরভাবে পূজা ও অন্নকূট উৎসব হল। এবার ফেরার পালা। মাকে প্রণাম করে তাঁর আশীষ ও অভয় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম দাদার সাথে। দিদি ও আত্মীয়রা একটা আশ্বস্ত হোল। আমার সম্পদ

হল মায়ের সুমধুর স্মৃতি ও ভালবাসা। কলকাতায় থাকাকালীন গঙ্গাতটে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আগড়পাড়া আশ্রমে যাতায়াত শুরু হোল। এদিকে চিঠিতে দিদি ও মায়ের সাথে যোগাযোগ। সুযোগ হলে দুর্নিবার আকর্ষণে মায়ের কাছে ছুটে যেতাম। দিদির সাথে ক্রমে যোগাযোগ দৃঢ় হল।

একটা কথা বলি, এই দিদিরই কৃপায় দশবৎসর পর ১৯৬৯ ইংরাজীর এপ্রিল মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় মায়ের পুত্র উপস্থিতিতে দিদিমার কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা লাভ হয় কাশীতে। (আশ্চর্য্য সেই নাম ও বীজ যেটা মা এলাহাবাদে প্রথমে দিতে চেয়েছিলেন।) সে অনেক কথা।

দিদি বলতেন— “মা, কর্তব্য অকর্তব্য বুঝি না। জীবনটা যেন তোমার সেবায় লাগে, তাই যেন জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য হয়।” দিদি ছিলেন গুপ্ত যোগী। ব্যবহারে সহজ, কিন্তু উদাসীন। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতম্পর্হঃ। ১৯৮০ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বরে কাশীতে দেহ রক্ষার সময় আমরা জানলাম দিদি মার কাছ থেকে সন্ন্যাস পেয়েছিলেন, নাম গুরুপ্রিয়া আনন্দ গিরি।

আজ দিদি গুরুপ্রিয়া আনন্দ গিরিজীর শতবার্ষিকীতে স্মরণ করি তাঁর মাতৃমুখী অক্লান্ত সেবার কথা। স্মরণ করি তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ ও ভালবাসা, শুধু ব্যক্তি জীবনে নয় সকল ভক্ত ও আশ্রমবাসীর জীবনে। প্রার্থনা করি দিদি ও মায়ের কৃপা ও প্রেরণা, যাতে আমরাও যেন মাতৃমুখী হয়ে লোক কল্যাণ সেবা ও কর্ম করতে পারি।

জয় মা।



দিদি গুরুপ্রিয়া স্মরণে

— শ্রী সোমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তাঁর সঙ্গে লীলা সহচরেরাও এসে যোগ দেন। শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী একবার প্রকাশ করেছিলেন যে যারা এ শরীরটার কাছে এসেছে, তারা এ জগতে এই শরীরটার জন্যই এসেছে। এই সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দিদি গুরুপ্রিয়া। ঢাকাতে শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্য লাভ করার পর তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কেবল মায়ের সেবায়ই আত্ম সমর্পণ করেছিলেন।

গুরুপ্রিয়াদিদির পূর্বাশ্রমের নাম ছিল আদরিণী দেবী। গুরুপ্রিয়া নামটি শ্রীশ্রী মায়েরই দেওয়া। মায়ের আশ্রমে আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁকে আদরের সঙ্গে ‘দিদি’ বলে ডাকতেন। মাতৃ সন্তানেরা তাঁর কাছে আপন ভগ্নী হতেও অধিক স্নেহ পেতেন। যে কথা শ্রীশ্রী মাকে বলার সাহস তাঁদের হত না, দিদির কাছে আবেদন করলে পরে তিনি মায়ের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে দিতেন। শ্রীশ্রী মা দিদিকে বলেছিলেন, “কোথাও গেলে তুই যে ভাবে সকলকে আপন করে নিস্ এরকমটি আর কেউ পারে না।”

শ্রীশ্রী মায়ের সেবায় তাঁর তন্ময়তা এত গভীর ছিল যে অনেক সময় শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে যে সময়ে যে কাজটি হওয়া প্রয়োজন, দিদি সে কাজগুলি নিজ থেকেই করে ফেলতেন। তাঁকে বলার প্রয়োজন হত না। এমনও দেখা গেছে যে শ্রীশ্রী মায়ের হয়ত জল তেঁষ্টা পেয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করার আগেই গুরুপ্রিয়াদিদি সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন।

গুরুপ্রিয়া দিদির ব্যক্তিত্ব ও কার্য ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কোন কাজই তিনি শ্রীশ্রী মায়ের অনুমতি না নিয়ে বা তাঁর খেয়ালের বিরুদ্ধে কখনই করতেন না। মায়ের ইচ্ছা ও নির্দেশ তিনি সর্বোপরি ভাবতেন। এমন কি কোনও অপ্রীতিকর উচিত কার্যও অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে নিতে দ্বিধা করেন নি। শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে কাউকে দেখলে পরে ধমক দিয়ে বলতেন, “তোদের এত বড় দুঃসাহস যে মায়ের কথা অমান্য করছিস।” সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বা শ্রীশ্রী মায়ের বাণী ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। পরে এই ডায়েরী গুলি পুঁথি রূপে ছাপান হয়। মাতৃ সন্তানদের কাছে এই বইগুলি এক অমূল্য সম্পদ।

একবার কাশীর আশ্রমে দিদি এসেছেন শুনে দেখা করতে গেছি। দিদির ঘরে গিয়ে দেখি যে তিনি একা একটি মোড়ার উপর বসে আছেন এবং তিনি যেন স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত। যাওয়া মাত্রই বললেন, “আরে শোন আমার লেখা মায়ের বইয়ের এক অংশ আমাকে পড়ে শুনিয়েছে— শুনে আমার সমস্ত শরীর শিহরণ হচ্ছে।” দিদি প্রকাশ করলেন বইতে লেখা

আছে যে তিনি শ্রীশ্রী মাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁরা সৌভাগ্য ক্রমে তাঁদের জীবনে শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গ লাভ করতে পেরেছেন, কিন্তু যাঁরা মায়ের কাছে আসবার সুযোগ পান নি বা পরে মায়ের অনুপস্থিতিতে যাঁরা মায়ের বিষয়ে জানতে পারবেন তাঁদের কি উপায় হবে? শ্রীশ্রী মা পরিষ্কার দিদিকে বলে ছিলেন— “যারা এই শরীরের কাছে এসেছে বা দর্শন মাত্র পেয়েছে, তাদের পতন নেই। এমন কি যারা এই শরীরের ছবি দেখেছে অথবা কেবল স্মরণ করেছে তাদের ও পতন হবে না।” দিদি আরও বললেন যে শ্রী শ্রী মায়ের এই অভাবনীয় আশ্বাস বাণী তিনি যে তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সে কথা তাঁর মনেই ছিল না। তাই তাঁরই লেখা বই থেকে উপর্যুক্ত মায়ের বাণী শুনে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়েছেন। এতেই বোঝা যায় যে দিদির কত আগ্রহ ছিল যে সকল ভক্ত শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্য পেয়ে বা তাঁর কথা পড়ে অথবা শুনে এবং তাঁর ছবি দেখে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাক।

কাশীর এত বড় আশ্রম, কন্যাপীঠ, মাতৃ মন্দির, হাসপাতাল ইত্যাদি দিদির বিশেষ পরিশ্রম ও উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। কখনও কখনও শ্রীশ্রী মাকে বলতে শুনেছি, ‘দিদি তুমি কত কষ্ট করে এই আশ্রম বানাতে, তাতে কত লোকের উপকার হল।’ গুরুপ্রিয়া দিদি তক্ষুনি অস্বীকার করে শ্রীশ্রী মাকে বলতেন, ‘হ্যাঁ মা, ঝরে কাক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে।’ দিদি সর্ব্বক্ষণ অনুভব করতেন যে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা বা খেয়াল না হলে কোনও কাজ সফল হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীশ্রী মা দিদিকে দিয়ে কত বড় ও সব মহৎ কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে আত্ম প্রশংসার ভাব বা ব্যক্তিগত অধিকার প্রদর্শন দেখা যায় নি। শেষের দিকে অনেক সময় তাঁকে ব্যস্ত হয়ে বলতে শুনেছি— ‘আরে মা থাকতে থাকতে যতটা কাজ করে ফেলা যায় করে নেওয়া, পরে কি হয় কে জানে।’

একবার কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের মন্দির নির্মাণের সময় শ্রীশ্রী মায়ের ঘরে দিদির সঙ্গে মন্দির সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। শ্রীশ্রী মা চুপটি হয়ে বিছানার উপর বসে ছিলেন। মনে হচ্ছিল, মন্দির সংক্রান্ত কথাবার্তার প্রতি শ্রী শ্রী মা সম্পূর্ণ উদাসীন। হঠাৎ শ্রীশ্রী মা বললেন, “দিদি মন্দিরের ঘরটিতে রাধাকৃষ্ণ ও রাম সীতার বিগ্রহও বসালে পারিস।” গুরুপ্রিয়া দিদি তক্ষুনি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, ‘না মা, ওখানে শুধু মায়ের মূর্তিই বসবে।’ শ্রীশ্রী মা হেসে বললেন যে, “কত মন্দিরে সৌন্দর্য্যের জন্য লতা পাতা ইত্যাদি একে বা খোদাই করে দেওয়া হয়, আমার জন্য ঠাকুরের মূর্তিও না হয় সেই ভেবে বসান হল। না হয় দরজার দুই দিকের দেয়ালে পদ্মফুলের উপর কাঁচের আলমারী বানিয়ে হলঘরের দিকে মুখ করে রাধাকৃষ্ণ ও রামসীতার বিগ্রহ বসালে হয়।” কিন্তু দিদি ভাল করেই জানতেন যে শ্রীশ্রী মা সব সময় নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে চান। সম্ভবতঃ দিদি চাইতেন যে শ্রীশ্রী মা যে সেই পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ এই পরিচয় জানতে গিয়ে ভক্তেরা দিগ্ভ্রমিত না হয়ে পরেন। তাই কাঁদ কাঁদ হয়ে কোনমতেই শ্রীশ্রী মায়ের এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি এবং উপস্থিতদের বেশ জোর দিয়েই বললেন যে মায়ের শ্রী শরীর থাকতে মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের বিগ্রহ বসান হবে না। মায়ের ইচ্ছানুসারে আপাততঃ বেদীর উপর চন্দনের সিংহাসনটি

রেখে গোপালকে তার উপর বসান হবে। পরে গোপালকে মন্দিরের দোতলায় মায়ের শোবার ঘরে স্থানান্তরিত করে মন্দিরের বেদীর উপর শ্রীশ্রী মায়ের চারটি আলাদা ভাবের (বুদ্ধ, শংকর, ব্রহ্মচারিণী ইত্যাদি ভাবের) বিগ্রহ বসান হবে। গুরুপ্রিয়া দিদি স্পষ্ট ভাবে বললেন যে তিনি হয়ত সেই সময় অবধি থাকবেন না, তাই এই ব্যবস্থার কথা উপস্থিতদের জানিয়ে রাখা হল। এই কথার পর শ্রীশ্রী মা হাসিমুখে দিদির দিকে চেয়ে রইলেন — আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। দিদির ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীশ্রী মায়ের তিনটি বিগ্রহ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই তিন মূর্তিই দিদি তৈরী করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। চতুর্থ মূর্তির অভাবে এখনও প্রতিষ্ঠা কার্য অপেক্ষিত।

শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি দিদির সমর্পণ ভাব এত প্রবল ছিল যে নিজের কঠিন রোগের সময়েও আরোগ্য হবার ইচ্ছা ভেতরে জাগতে দেন নি। চির স্মরণীয় শ্রীশ্রী হরিবাবা একবার গুরুপ্রিয়া দিদির সুস্থ হবার জন্য অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান করালেন। কিন্তু দিদির কঠিন রোগের উপশম না হতে দেখে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে দিদির মধ্যে শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি সমর্পণ ভাব এত প্রবল যে নিজের শরীর সুস্থ হোক এই ইচ্ছাও তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর ভাবটি ছিল যে মা যেমনটি রাখেন তেমনিই থাকা।

কাশীতেই শ্রীশ্রী মায়ের মন্দির সংলগ্ন বাড়ীর দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম ঘরটিতে গুরুপ্রিয়া দিদি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পবিত্র শরীরটিকে মণিকর্ণিকা ঘাটের সন্নিকটে মধ্য গঙ্গায় সলিল সমাধি দেওয়া হয়। প্রবাহের পরে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে যাওয়া মাত্রই বললেন, ‘প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল।’ শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান সহচরী গুরুপ্রিয়া দিদির সম্বন্ধে মা কি ইংগিত করলেন আমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।



গুরুপ্রিয়া স্তুতি

— ডা० চিত্ততোষ চক্রবর্তী

পরম গুরুর অশেষ দয়া

তাই তো তুমি গুরুপ্রিয়া

ধন্য তোমার মানব জনম

হোয়েছিলে মায়ের ছায়া ॥

ধর্মযোগী হোয়েও

তুমি কর্মযোগীর নিদর্শন

বারাণসীর গঙ্গাতীরে

পেতে গেছে মায়ের আসন ॥

তোমার স্বপ্ন কন্যাপীঠ

আদর্শে আজ শ্রেষ্ঠ পীঠ

দাদাভাই নামটি তাই

সবার মুখে ঘুরছে সদাই ॥

আবালবৃদ্ধ সবার প্রিয়

তোমার গুণের তুলনা নাই

শতবর্ষ জন্মদিনে

আমরা সবাই প্রণাম জানাই ॥

দিদি ডাকে মুগ্ধ সবাই

সমর্পিতা দেখতে পাই

মায়ের লীলা সঙ্গিনী তাই

তোমায় সবাই প্রণাম জানাই ॥



শতবর্ষের আলোয় শ্রীগুরুপ্রিয়া দিদি

— শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ভীষ্মপুরা আশ্রমে রয়েছেন। এক নাপিত শ্রীশ্রী মায়ের নখ কাটার প্রার্থনা জানায়। কিন্তু ভক্তদের অসম্ভব ভিড়ের জন্য নাপিতের সুযোগ হল না। শ্রীশ্রী মা বিক্ষাচলে চলে আসার জন্যে চান্দো স্টেশনে এলেন। নাপিতও ছুটে এল। নাপিতের ঐকান্তিক আগ্রহ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে একজন নাপিতকে মায়ের নখ কাটার অনুমতি দেন। নাপিত ট্রেনের কামরার মধ্যে মায়ের নখ কাটতে থাকে আর দেবদুর্লভ কণ্ঠে এক অপূর্ব গান গাইতে গাইতে শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে থাকে। গানের প্রতিটি শব্দ সকলকে মুগ্ধ করে।

“রুখ না সকো তো যাও মা তুম যাও
এক মগর হাম সব কী হ্যায় ফরিয়াদ
কভী হমারী ভী কর লো ইয়াদ।
হাম তো তুমহে ন ভুল সকেঙ্গে
রুখ না সকো তো যাও মা তুম যাও।
তুম চাহে তো বিখরাও। মা তুম যাও।
যানে কে তো মিলে পুরানী মাঈয়া, জানে কভ মিলে
জানে কভ মিলে আনন্দী মাঈয়া।
আজ ভী ছোড়নেকে পহলে
তুম একবার মুসকারো, মা তুম যাও।”

[মা তুমি যদি অপেক্ষা করতে না পার তবে মা তুমি যাও। কিন্তু আমাদের সবারই একটা আর্জি আছে যে আমাদের কখনও কখনও মনে করো। আমরা তো তোমাকে ভুলতে পারবো না, তুমি যদি ভুলে যেতে চাও যেও। পুরানো মাতো যেতেই পারে কিন্তু না জানি কবে মিলবে আনন্দময়ী মাকে। তাই আজ বিদায়ক্ষেণে আমাদের ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে একবার সেই হাসি ছড়িয়ে দাও মা।]

গান গাইছে আর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরে পড়ছে। উপস্থিত অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে লাগল। (আনন্দময়ী মা, প্রথম ভাগ: কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পৃ. ৪৮)

সেদিন নাপিতকে যিনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন শ্রী গুরুপ্রিয়া দিদি। গুরুপ্রিয়া দিদি যদি নাপিতকে সুযোগটি না দিতেন এই অসাধারণ গানটি অজানা থেকে যেত।

গুরুপ্রিয়া দিদির সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি শ্রীশ্রী মায়ের এক তথ্যনিষ্ঠ, সুচিন্তিত, অসাধারণ সুবহুং জীবনী রচনা করে গেছেন। গুরুপ্রিয়া দিদির লেখা আনন্দময়ী মায়ের জীবনী এক অনবদ্য

সাহিত্য গ্রন্থ। তিনি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরেছেন।



একদিন গুরুপ্রিয়া দিদি বিজ্ঞাচলে মাকে ভক্তদের লেখা চিঠিগুলি পড়ে শোনাচ্ছেন। কিন্তু মা তখন মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে গান গাইছেন। গুরুপ্রিয়া দিদির রাগ হল। তিনি মাকে বললেন, ‘এত কথা পড়লাম কিন্তু তুমি ত যেমন হাততালি দিয়ে গান করছ। হয়ত কিছুই শুনলে না।’

মা হেসে বললেন, ‘কি করব বল? তোরা ত জানিস, মা কত ব্যবস্থা করে। খাই, দাই আছি, ঘুরি ফিরি। তোদের ইচ্ছা হয় যেতেও না হয় না দিলি।’ দিদি বললেন, ‘তোমার ভাব ত বরাবরই দেখে আসছি। এতগুলি আশ্রম হয়েছে একটা ব্যবস্থা করবার লোক ত চাই। না হয় একজন তৈয়ার কর যে সব ব্যবস্থা করতে পারে। নতুবা কাজ চলে কি করে?’

মা অমনি উত্তর দিলেন, ‘তোদের আশ্রম তোরা জানিস। আর লোক ঠিক করব কি? এমন একজন সব দেখছেন যে ভাল ভাবে চলবি, ভাল থাকবি। বিপথে চললে ঠোকা খাবি। আগুনে হাত দিবি হাত পুড়বে না? তিনি সব দেখছেন, ঠিক ঠিক সব চলছে। কে কোথায় যাবি! তাঁর দৃষ্টি এড়াবার, কারও কোথাও যাবার উপায় নাই। সব ঠিক ঠিক চলছে, চলবে।’



শ্রী শশাংকমোহন মুখোপাধ্যায় অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাক্তার। তাঁর অতি আদরের কন্যা — নাম খুকুনী। খুকুনী মাকে প্রথম দেখেই মায়ের চরণে আত্ম সমর্পণ করেন। এই খুকুনী দিদিই পরবর্তী কালে শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী রূপে মায়ের ভক্তদের দিদি হয়েছিলেন। আর তাঁর বাবা ডাক্তার শশাংকমোহন হন শ্রীশ্রী মায়ের অন্যতম পার্শ্ব স্বামী অখণ্ডানন্দজী।

শ্রীশ্রী মা প্রথম পরিচয়ের দিন গুরুপ্রিয়া দিদিকে বলেন, ‘তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এখন এই শরীর দিয়া সব কাজগুলি যেন ঠিক হয় না। তাই সাহায্য করিবার জন্য ভগ্না তোমাকে নিয়া আসিয়াছেন। (অন্য একদিন) আজ তোমাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে আমাকে তুমি খাওয়াইয়া দিবে।’

শ্রীশ্রী মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় দিদি বলেছিলেন, ‘মা আমি পূজা জানিনা।’ মা বলেন, ‘তুমি যে ভাবে দিবে তাহাতেই পূজা হইবে।’

শ্রীশ্রীমা একদিন দিদিকে বলেন, ‘ধৈর্যই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ধৈর্য ধরা চাই। ব্যস্ত হইও না। আমি কতবার বাহির হইয়াছি। তোমরা এইরূপ ব্যস্ত হও বলিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। আমাকে নিজের ভাবে চলিতে দাও। তোমরা বাধা দিলে আমি পারি না। দেখ, প্রথম দিন যখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম আমি বলিয়াছিলাম, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তারপর এই যে সকলেই

প্রায় বলে আমার তোমার চেহারার মিল আছে। অনেকে মনে করে তুমি আমার ছোট বোন। এই সব কথার কি কোন অর্থ নাই মনে কর? এসব কথার অর্থ আছে।’

(মা নিজের গলার সোনার পৈতাটি দিদির গলায় পরাইয়া দেন ও বলেন) ‘গলায় রাখিও। এই পৈতা যে দেওয়া হইল ইহা খেলার কথা নয়। তোমার আদর্শ ব্রহ্মচারিণী হওয়া চাই। তুমি খাওয়া দাওয়া সবই পৈতার সময় যেমন করিতেছ এইরূপেই করিবে।’

‘যখন পৈতা দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্মচারী করা হইয়াছে, সেই ভাবেই আছ। আর সারাজীবন এইভাবেই কাটাইলে। এখন সব বন্ধন ফেলিয়া পুরুষের মত চলিতে আরম্ভ কর।’ (মায়ের কথায় মা: সমর্পিতা পৃ. ২২-২৩)



গুরুপ্রিয়া দিদির তখন খুব অসুখ। শ্রীশ্রী মা দিদির খোঁজ নিয়েছেন। কি কি খাবার দেওয়া হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু গুরুপ্রিয়া দিদির মহাপ্রয়াণ হল।

বৃন্দাবনে ভাগবত হচ্ছিল। মা ছিলেন। কৃষ্ণ-জন্ম ও আরতির পর মা বলে উঠলেন, “দিদি চলে গেল। (ঐ ক্ষণেই দিদি কাশীতে ব্রহ্মলীন হন)। ভাইজীর মত দিদিও পেয়েছিল এই শরীরের মুখ থেকে আপনা হতেই। সন্ন্যাস মন্ত্র বের হয়েছিল। তা দিদি নিয়ে নিয়েছে। আর বলেছে যে আমার হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম যে গুরুপ্রীতি বলব? না গুরুপ্রিয়া? প্রীতি ও প্রিয়া ত একই কথা। তা বলল, না মা। প্রিয়াই থাকুক। নাম হল গুরুপ্রিয়া আনন্দগিরি। দিদি লোকের সামনে নিজেকে বড় করতে চাইত না। ওই নামটা না বলে গুরুপ্রিয়া এই নামই রইল। দিদি এই শরীর থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র পেয়েছিল। তোমরা যে রকম ঠিক মনে কর সন্ন্যাসের মত করো।”

“প্রতিমা বিসর্জন হল।” কন্যাপীঠের মেয়েদের বলছেন, “কাঁদছিস কেন? তোদের দিদি রেখেছে, দিদি রেখেছে, তোরা ত দিদিরই সৃষ্টি। তোদের মধ্যেই তো দিদিকে দেখতে পাচ্ছি।”

শ্রীশ্রী মা বলেন, “মেয়েদের মধ্যে এরকম কর্মী দেখা যায় না। বাসন্তী দেবী (সি.আর. দাস এর পত্নী) এই মেয়েকে চেয়েছিল। অনেকেই এই রকম কর্মী মেয়ে দেখে নিতে চেয়েছিল। দিদির কাজ দিদি করে গেছে। সাধুদের জন্য আশ্রম। কন্যাদের জন্য বিদ্যার স্থান। কন্যাদের কল্যাণ চাইত দিদি।” (মায়ের কথায় মা: সমর্পিতা পৃষ্ঠা. ২৭-২৮)



আমাদের দিদি গুরুপ্রিয়া

— সন্ন্যাসিনী মৈত্রী পুরী

বর্তমান বর্ষ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী গুরুপ্রিয়া দেবীর শততম জন্মবর্ষ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী, বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সনের ৩০শে মাঘ আসামের শিলচর শহরে এই মহীয়সী মহিলার আবির্ভাব ঘটে। মহাসমারোহে তাঁহার শততম জন্মবর্ষ পালিত হইতেছে।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী পরিবারে তথা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে “দাদাভাই” আখ্যার অন্তরালে যে ব্যক্তিত্বময়ী নারী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসমা ভাস্বরমানা তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদি। ক্রমাগত ঘর্ষণে চন্দন হইতে যেরূপ সুগন্ধ বাহির হইয়া চতুর্দিকে প্রকাশিত হইয়া পড়ে সেইরূপ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সন্নিধানে আসিয়া মাতৃচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্বক আপনাকে মাতৃসেবায় পূর্ণোদ্যমে নিয়োজিত করিয়া এই নারী এরূপভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন যে তাঁহার চরিত্রের অশেষ গুণাবলী প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই অদ্যাপি শ্রীশ্রী মায়ের একান্ত অনুগতা প্রধান সেবিকা ও লীলাসহচরী অগণিত গুণময়ী গুরুপ্রিয়া দেবী আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় স্থল-স্থল করিতেছেন।

মাতৃলীলা যখন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল এবং শ্রীশ্রী মা অনুক্ষণ ভাব সমাধিতে বিভোর অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, ঠিক সেই পরম লগ্নে মাতৃলীলা সহচরীরূপে গুরুপ্রিয়াদেবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনিও যেরূপ শ্রীশ্রী মায়ের মধ্যে এক সর্বাত্মক রূপ সন্দর্শনে অভিভূত ও আশ্চর্য্যস্থিত হইয়া পড়েন শ্রীশ্রী মাও সেরূপ যেন আপন উপযুক্ত পূর্বদৃষ্ট সাথীকে পুনরায় দর্শন করিতেছেন এরূপভাবে বলিয়া উঠেন, “তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?” এইভাবে পরস্পরের সহিত মিলনের পর সেইদিন হইতেই গুরুপ্রিয়া দেবী শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সহিত এক স্বর্গীয় ও পবিত্র অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং শ্রীশ্রী মা ও মাতৃ পরিবারের একজন অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হইয়া পড়েন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উক্ত বন্ধন একদিনের তরেও শিথিল হয় নাই।

‘গুরুপ্রিয়া’ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রদত্ত নাম, পিতৃদত্ত নাম ছিল ‘আদরিণী’। পিতামাতার তথা আত্মীয় স্বজনের পরম আদরের ছিলেন বলিয়া পিতা ঢাকার সিভিল সার্জন শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় কন্যার এই নাম রাখিয়াছিলেন। অত্যন্ত সার্থকনায়ী ছিলেন এই মহিলা। একদিকে গুরু শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী যেরূপ তাঁহার অত্যন্ত ও একান্ত প্রিয় ছিলেন সেরূপ গুরুপ্রিয়া দেবীও শ্রীশ্রী মার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ভাবময়ী শ্রীশ্রী মায়ের একমাত্র উপযুক্ত সেবিকা ছিলেন এই গুরুপ্রিয়া দিদি। এমনই মাতৃগতা ও মাতৃময়ী ছিলেন যে শ্রীশ্রী মা ব্যতীত কোন কিছুতেই আকর্ষণ ছিল না। এইভাবে পিতামাতার ‘আদরিণী’ শ্রীশ্রী মায়ের ‘খুকুনী’ কখন মাতৃভক্ত পরিবারের ‘দিদি’ হইয়া পড়িয়াছেন। তদবধি তিনি সকলের নিকট গুরুপ্রিয়া দিদি রূপে পরিচিতা।

এই গুরুপ্রিয়া দেবী এমনই এক ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন যাহা সকলকে আকৃষ্ট

করিত এবং তাহাই তাঁহাকে খ্যাতির চরম শিখরে উন্নত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার চরিত্রে সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল তাঁহার অকৃত্রিম ও অক্লান্ত সেবাভাব ও মধুর আচরণ। সহজাত সেবাপরায়ণতা তাঁহার মধ্যে শৈশব হইতেই মুকুলিত হইয়াছিল এবং মাতৃসান্নিধ্যে আসিয়া তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কেবল শ্রীশ্রী মায়ের সেবাই নয়, মাতৃ আদেশে ও সহজাত সেবাভাব বশতঃ অন্যান্যদেরও নিষ্ঠার সহিত আন্তরিকভাবে সেবা করিতেন। তিনি ছিলেন সেবার প্রতিমূর্তি। তাঁহার এই সেবাভাব আদর্শস্বরূপ ও শিক্ষণীয় ছিল। এমন মধুর ব্যবহারের সহিত অক্লান্তভাবে তিনি সেবা করিয়া গিয়াছেন যাহা বিরলদৃষ্ট।

দিদি ছিলেন প্রতিটি কর্মে নিপুণা ও নিষ্ঠাবতী কমিনী। তিনি নিজেও যেরূপ নিপুণতার সহিত কর্ম করিতেন সেরূপ কর্ম করিতে অপরকেও প্রেরণা দিতেন। গুরুপ্রিয়াদিদের প্রতিটি কাজই তাহা মাতৃ সেবাই হউক অথবা অন্য কোন কাজই হউক নিখুঁত ছিল। রন্ধন, সূচী শিল্প, পূজা-অর্চনা বিভিন্ন উৎসবাদিতে বিভিন্ন প্রকার কর্ম তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করিতেন যে কর্মগুলি সুসম্পন্ন ও সকলের রুচিসম্মত হইত।

আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন আমাদের গুরুপ্রিয়া দিদি। ইহা তাঁহার মধ্যে সহজাত ছিল এবং শৈশব হইতেই প্রকটিত ছিল। সকলের জন্য অক্লান্ত ভাবে কর্তব্যপালন করিয়া যাইতেছেন কিন্তু আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত নাই। আপনার সামান্যতম সুখের চিন্তা বা সুযোগ গ্রহণের ইচ্ছা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। সারাক্ষণ কর্মই করিয়া যাইতেছেন, নিজের সময়ানুযায়ী পূজাপাঠ, খাওয়া-দাওয়া, স্নান বা বিশ্রাম এ সকলের প্রতি লক্ষ্যপমাত্র নাই। অপর সাধারণ নারীর ন্যায় তিনি অলংকারাদির দ্বারা সাজসজ্জা করিতে পছন্দই করিতেন না। বিবাহিত সাংসারিক জীবনে তাঁহার আদৌ রুচি ছিল না। তাই নির্জিহ্বা বিবাহিত জীবন ও পতি ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বশুরালয়ে থাকিতে যখন শরীরে ও মনে অস্বস্তিবোধ করিতেছেন ও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তখন সকলের বিবেচনায় তাঁহাকে পিত্রালয়ে লইয়া আসা হইলে তিনি মহাস্বস্তিতে ও শান্তিতে তথায় থাকিতে লাগিলেন। স্বশুরগৃহে পুনরায় যাইবার ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করিলেন না। এইরূপ অবস্থায় পতিগৃহ ও পতি ত্যাগের প্রশ্ন দেখা দিলে তিনি নিভীকভাবে উত্তর দিলেন, “যাঁকে গ্রহণই হয় নি, তাঁকে ছাড়ার প্রশ্নই বা কোথায়”? এমনই দৃঢ়চিত্তসম্পন্ন ছিলেন গুরুপ্রিয়াদিদি।

গুরুপ্রিয়াদিদি অত্যন্ত কর্মঠা ও প্রখরবুদ্ধিমতী ছিলেন, কোন কাজেই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না এবং তাহা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত সুসম্পন্ন করিতেন। বড় বড় উৎসবাদি ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে আশ্রম, বিদ্যালয়, হাসপাতালাদি প্রতিষ্ঠার ন্যায় বিশাল বিশাল কর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহাদের সুসম্পাদন গুরুপ্রিয়াদিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার সহিত নিখুঁত ভাবে কর্মকরিবার ও কর্মপরিচালনা করিবার সহজাত শক্তির ফলে সম্ভবপর হইয়াছে। গুরুপ্রিয়াদিদের অফিস-আদালতাদির কর্মেও বুদ্ধি ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদির এই সকল কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া তৎকালীন পুরুষগণ পর্যন্ত আশ্চর্যবোধ করিতেন।

গুরুপ্রিয়াদিদের কর্মজীবনের সর্ববিশাল ও দুরূহ কর্মসম্পাদনটি ছিল শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যখেয়ালে

শ্রীশ্রীমা কর্তৃক আদিষ্ট “অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞ” সম্পাদন। কর্মযোগিনী দিদির জীবনে এ যেন এক বিশাল কর্মসাধনা। দিদির না ছিল অর্থবল, না জনবল। কেবল শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি অগাধ ও দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিই ছিল তাঁহার সম্বল। এমন কি শ্রীশ্রী মাও যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কি প্রকারে এককোটি গায়ত্রী মন্ত্রে আস্থি প্রদান রূপ বিশাল যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন তখনও দিদির এই প্রকারে নিতীক উত্তর, “মা তুমিই আমার একমাত্র সম্বল।” যাহা হউক, গুরুপ্রিয়াদিদির অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি একান্ত আস্থা এই বিশাল কর্মকে সুসম্পাদিত করিয়া তুলিয়াছিল।

গুরুপ্রিয়াদিদির অশেষ গুণাবলী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য রচনা উভয়ক্ষেত্রেই উৎসুক ছিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের জীবনী লইয়া তাঁহার অমর সাহিত্যকৃতি “শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী” ভক্তসমাজে সমাদৃত।

গুরুপ্রিয়াদিদির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ স্থাপনা। গুরুপ্রিয়াদিদির চরিত্রের বিভিন্ন দিক এই কর্মটির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং ইহার জন্যই তিনি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে প্রখ্যাত হইয়াছেন। কন্যাপীঠের জনয়িত্রী গুরুপ্রিয়াদিদি। যদ্যপি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য খেলালে ইহার উদ্ভব, তথাপি দিদিই এই প্রতিষ্ঠানের সর্বস্ব। কন্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সম্মালিকারূপে গুরুপ্রিয়াদিদি সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইহার জন্যই কীর্তিময়ীও অমর হইয়া আছেন। কন্যাপীঠের হোত্রীস্বরূপা দিদির প্রীতি, ভালবাসা, আন্তরিকতা, শুভেচ্ছা, অক্লান্ত পরিশ্রম, চিন্তা-ভাবনা এই প্রতিষ্ঠানটির মূল ইমারত। এই প্রতিষ্ঠানের সুসংগঠন ও সুসংবহনের জন্য গুরুপ্রিয়াদিদিকে ভিক্ষা করিতে পর্যন্ত হইয়াছে। কন্যাপীঠের কন্যাদের তিনি সন্তান জ্ঞানে পালন করিতেন। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার সদাই দৃষ্টি থাকিত। ইহাদের কল্যাণ ও পুষ্টি বিধানের জন্য চিন্তা ভাবনা করিতেন।

ব্রহ্মস্বরূপা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর ত্রিযাশক্তি স্বরূপিনী গুরুপ্রিয়া দেবী যে কন্যাপীঠের জন্ম দান করিয়া আপন আদরনীয় সন্তানসম ইহাকে লালিত পালিত করিয়া গিয়াছেন অদ্যপি তাহা ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়া স্বমহিমায় বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দরতর রূপে ও সাবলীলগতিতে অগ্রসরিত করিয়া লইয়া যাইবার দায়িত্ব আগামী প্রজন্মের তথা সকলেরই। এই দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনই তাঁহাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও সম্মান প্রদর্শন করিবার প্রকৃষ্টতম পন্থা। সবশেষে কন্যাপীঠের তথা সমগ্র সংঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী মায়ের রাতুল চরণে প্রণতি জানাইয়া ও প্রতিষ্ঠাত্রী ও কর্ণধারিনী গুরুপ্রিয়াদিদির চরণে প্রণাম ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া প্রার্থনা জানাই —

কন্যাপীঠ অমর রহে,
গুরুপ্রিয়াদিদি অমর রহে।



আমাদের ব্রহ্মচারী মা

— শ্রীমতী গীতা চ্যাটার্জী

অনেক পুরানো দিনের কথা। শ্রীশ্রী মা গুরুপ্রিয়া দিদির দেখিয়ে আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন — “তোমরা ঝুঁকে কি বলে ডাকো?” আশ্রমে সবাই দিদি বলতেন সুতরাং আমরাও তাই বললাম। মা বললেন “না, তোমাদের ব্রহ্মচারী মা হন। তোমরা ‘ব্রহ্মচারী মা’ বলবে।”

কিশোরী বয়সে ব্রহ্মচারী মায়ের পিতা মাতা বিবাহ সংস্কার করান অতি অবশ্য প্রয়োজন বোধে। তাঁর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা-মা অশেষ গুণবান, পরম ধর্মপরায়ণ শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পরই নিজের সংকল্পে অটল থেকে ব্রহ্মচারীর আদর্শ অনুসরণ করে ব্রহ্মচারী মা নিজের পিত্রালায়ে সহজ বৈরাগ্যভাব নিয়ে পিতামাতার সেবায় দীর্ঘদিন কাটান।

১৯২৬ সালে ঢাকায় তাঁর পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রী মায়ের সাক্ষাৎ পান এবং ঐ সময় থেকে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়।

শ্রীশ্রী মা যখন শুনলেন যে তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং উনি সংসার করেন নি বলে তাঁরই পিতামার ইচ্ছায় আমার পিতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বিবাহ করেন শ্রীশ্রী মা তাঁদের ডেকে পাঠান এবং এই সূত্রেই আমার গর্ভধারিণী মা অমলা দেবীও শ্রীশ্রী মায়ের পরম ভক্ত হয়ে সব পরিবারটিকে ভক্ত পরিবারে পরিণত করেন। ব্রহ্মচারী মা তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছিলেন। আমার দীক্ষার ব্যাপারে মায়ের যা দেবার দিয়ে বললেন ব্রহ্মচারী মায়ের কাছে গিয়ে বাকীটা বুঝে নিতে। এমন কি শ্রীশ্রী মা সামনে বসে থেকে কিছু কিছু ক্রিয়াও ব্রহ্মচারী মাকে দিয়ে করিয়েছেন। ১৯৭৭ সালে ব্রহ্মচারী মা যখন খুব অসুস্থ তখন পালা করে সব রাত জাগতো। তখন আমারও একবার সুযোগ হয়ে ছিল ব্রহ্মচারী মায়ের সেবা করবার।

শ্রীশ্রী মা কৌতুকময়ী ছিলেন। অনেক পুরানো দিনের কথা। মা তখন কলকাতায় বিড়লা মন্দিরে উঠেছেন। শিব রাত্রির পরের দিন সকালে ব্রহ্মচারী মা প্রসাদ বিতরণ করছেন। আমাদের পিতা ঐ সময় শ্রীশ্রী মায়ের দর্শনে গিয়ে প্রসাদের আশায় দুই হাত একত্র কোরে বসেছিলেন। মা বলে উঠলেন, ‘ঐ হাতটারে প্রসাদ দে না।’ বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও আমার পিতা আশ্রমে গেলে ঐ কঠোর চেহারায়ও সামান্য লজ্জাভাব যেন দেখা যেতো। তবে ওর ডায়েরীতে ডেরীঅন-সোন স্টেশনে শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে আমার দাদার উপস্থিতির কথায় ‘শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র’ বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৪০ সালে আমাদের পিতার কেনা নূতন বাড়ীতে ব্রহ্মচারী মা ও অন্যান্য ভক্ত সহ শ্রীশ্রী মা এক মাস ছিলেন। পূর্বাশ্রমে যিনি স্বশুর ছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী অখণ্ডানন্দজী

রূপে তিনিই আমার পিতার মন্ত্র গুরু ছিলেন। আমাদের গর্ভধারিণী মা অমলাদেবীকে ব্রহ্মচারী মা খুবই ভালো বাসতেন। ‘স্নেহের বোন অমলা’ বলে লেখা চিঠি এখনও সযত্নে আমাদের কাছে রাখা আছে। আমাদের মা অমলাদেবীও ব্রহ্মচারী মাকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং সুযোগ পেলেই সেবা করতেন। প্রসাদ থাকলে ব্রহ্মচারী মা বলতেন, “অমলার জন্য একটু রাইখ্যা দে।” আমরা অবশ্য ব্রহ্মচারী মাকে একটু ভয়ই পেতাম। বাইরের কঠোরতার অন্তরালে অবশ্য একটা স্নেহকোমল মন ছিল যা বাইরে থেকে বোঝা বড় কঠিন ছিল।

পুরুষ মানুষের মতো তাঁর কাজের ক্ষমতা ছিল। হলদে কাপরের সঙ্গে ফতুয়া পরতেন। ফতুয়ার পকেটে কাগজপত্র টাকা পয়সা নিয়ে মাথায় শিখা বাঁধা শক্ত চেহারায় পায়ে হেঁটেও অনেক কাজ করছেন যে কাজ দশজন পুরুষ মিলে হয়তো করতে হতো। পুরানো যত আশ্রমের প্রতিষ্ঠার কাজ এই ব্রহ্মচারী মাই করতেন, অবশ্য মায়ের খেয়াল সঙ্গে থাকতো। শ্রীশ্রী মায়ের সব সেবা কাজও একা হাতে করতেন। সেই সঙ্গে রান্নাও করতেন যে রান্নার তুলনা মেলা ভার। তার সঙ্গে চলতো প্রতিদিনের ঘটনা ও মায়ের বাণী সম্বলিত ডায়েরী লেখা, যে মহান কাজ আজকের ভক্তদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। যা শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র সম্বলিত অমৃত কথার কাহিনী সতেরো খণ্ডে লিখিত। কাশীধামের এই কন্যাপীঠ শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে ব্রহ্মচারী মায়ের এক অভিনব অবদান। তাঁর সমর্পিত ভাব, ব্রহ্মচর্য্য, পূজা, পাঠ, একনিষ্ঠ সেবাভাব কন্যাপীঠের কন্যাদের সব সময়ের অনুপ্রেরণার মূল ছিল। কন্যাপীঠ একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা এখনও সুন্দরভাবে শ্রীশ্রী মায়ের এবং ব্রহ্মচারী মায়ের নির্দেশিত পথে চলছে। তাঁদের প্রিয় দাদাভাইএর আদর্শকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এবং শ্রীশ্রী মায়ের প্রিয় লীলা সঙ্গিনীর জীবন চরিত্র সবার মাঝে প্রচার করার জন্য এই শত বার্ষিকীর আয়োজন।

শ্রীশ্রী মায়ের সেবা করার তো তুলনাই ছিল না। ‘ভাইজী’র মৃত্যুশয্যায় যে সেবা তিনি করেছিলেন তার নজীরও বিরল।

শ্রী রাধার ললিতা সখীর মতই শ্রীশ্রী মায়ের লীলাসঙ্গিনী ললিতা সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে ধরাধামের লীলা সাদ্ধ করে অমৃতময় ধামে প্রস্থান করেন। শ্রীশ্রী মায়ের কাছে সন্ন্যাস মন্ত্রও পেয়েছিলেন, কিন্তু সকলের কাছে গুপ্ত ছিল। গুরুপ্রিয়া মায়ের যে কত প্রিয় তার সাক্ষ্য বহন করছে নামটি।

তাঁর চরণে অধম এই সন্তানের অপুষ্ট ভাষায় লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলিটুকু নিবেদন করা হল।



দিদি গুরুপ্রিয়ার অবদান

— শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালিকা শ্রীশ্রী গুরুপ্রিয়াদেবীকে (দিদিকে) প্রথম দর্শনেই মা বলিয়াছিলেন, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিয়াছেন।

দিদি ও তাঁহার পিতা শশাঙ্কমোহন মুখার্জী (স্বামী অখণ্ডানন্দগিরি) গৃহস্থশ্রম ত্যাগ করিয়া উভয়ে ১৯২৬ সনে মার আশ্রিত হন। মাকে কাজে সাহায্য করার জন্যই যেন ভগবান দিদিকে মার নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রথম দর্শনের পর একদিন এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মা দিদিকে তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার দিলেন। তাহার পর হইতে দিদি প্রতি অমাবস্যায় মার পায়ে অঞ্জলি দিতেন।

গুরুপ্রিয়াদিদি স্বয়ং এক ধার্মিক সংস্কৃতিসম্পন্ন বংশের কন্যা। তাঁহার পিতৃগৃহে প্রতি বৎসর স-বলি দুর্গাপূজা হইত। তিনদিনই পাঁঠাবলি দেওয়া হইত। শশাঙ্কমোহন বাবুর নিজের কল্যাণার্থে একটি অতিরিক্ত বলি হইত। একবার মার উপস্থিতিতে এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের দুর্গাপূজার পাঁঠাবলি বন্ধ হইয়া যায়।

মূলতঃ শাহবাগের (ঢাকা) যে যজ্ঞাগ্নি কানীর আশ্রমে রক্ষিত হইতেছে তাহা প্রথমতঃ শাহবাগে দিদি ও তাঁহার পিতাই স্বয়ং রক্ষার ভার লইয়াছিলেন। আশ্রমের ব্রাহ্মণ কুমারীদের মধ্যে মায়ের খেয়ালে তারাপীঠে সর্বপ্রথম উপবীত ধারণ করেন গুরুপ্রিয়াদিদি এবং মরণীদিদি। দিদি ও ভাইজী (জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) সর্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন মার লীলা সহচর রূপে।

শ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতে মাকে চিনিয়াছিলেন তিন চারজন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম 'আদরিণী দেবী' খুকুনী, সকল মাতৃভক্তদের দিদি গুরুপ্রিয়া। মায়ের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল খুকুনীর ধ্যেয় বস্তু।

আশ্রমে বিশেষতঃ কন্যাপীঠে কুমারীদের সাধনার সহায়তায় দিদি গুরুপ্রিয়ার অবদান অতুলনীয়। কন্যাপীঠের কুমারীদের প্রথম দীক্ষাদান আরম্ভ হওয়ার সময় মার উপস্থিতিতে গুরু নিয়োগের বিষয়ে আশ্রমস্থ সাধুদের মধ্যে আলোচনাশ্রমে মতভেদ দেখা দিলে গুরুপ্রিয়া দিদির প্রস্তাবানুসারেই দিদিমার নিকট হইতে দীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথম জীবনে দিদি ছিলেন মার নিত্য সহচরী একমাত্র সেবিকা। মার রান্না করা, মাকে খাওয়ান ইত্যাদি সবই দিদি করিতেন। তদুপরি দিন-পঞ্জি লিপিবদ্ধ করিতেন, যাহাকে ভিত্তি করিয়া “শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী” নামক সপ্তদশ খণ্ডে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। দিদির দ্বারা গড়া কন্যাপীঠে কুমারীদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ মার খেয়ালে এবং দিদিরই নির্দেশে চলিত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান

উদ্দেশ্যই হইল চরিত্রগঠন। প্রাচীন পদ্ধতিতে সাধনার ধারার ন্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহুর্তে শয্যা ত্যাগ, কীর্তন, পূজা, ব্যায়াম, বেদাভ্যাস, শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা, শ্রীশ্রী চণ্ডী, রামায়ণ পাঠ ইত্যাদি নিত্য পালনীয় বিষয়। ইহা ব্যতীত কন্যাপীঠের কন্যাদের দ্বারা রন্ধনকার্য্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতাদিরও অভ্যাস করান হয়। প্রভাতের রাগিনীসুরে গাওয়া হয়— “ভজ মা আনন্দময়ী জপ মা আনন্দময়ী লহ মা আনন্দময়ীর নাম রে।” সন্ধ্যায় গাওয়া হয়— “জয় হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী শ্রী আনন্দময়ী মা” (ভাইজী রচিত)। শয্যা গ্রহণের পূর্বে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়— “মায়ের হাতে খাই পরি, মা নিয়েছেন সকল ভার, ভাবনা কি আর আছে আমার।”

মার এই একনিষ্ঠ সেবিকা ও শরণাগত ভক্তের অক্লান্ত পরিশ্রমেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রম, কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ এবং চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেবা ও সাধনার অঙ্গ যেমন রোগরূপী জন জর্নাদন সেবা। শাস্ত্রে কথিত আছে, সেবা ধর্ম: পরমগহনো যোগীনাংপ্যগম্য:। বিভিন্ন সংস্থার পরিচালনায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সর্বদা মার সেবার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিত। মার সেবাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। নিজের সুখ-সুবিধা ভুলিয়া মার এবং তাঁহার আশ্রিত সন্তানদের সুখ-সুবিধার খেয়াল রাখিতেন। আশ্রমের বিশেষ উৎসবাদিতে কুমারী পূজাসহ পারায়ণ পাঠ আদি ও নিত্য পূজায়ও যাহাতে কোন ত্রুটি না হয় সেদিকেও পর্যাাপ্ত লক্ষ্য ছিল। মার নির্দেশে সাধু-মহাত্মা, অতিথি-অভ্যাগতদের সেবাও যথাযথরূপে পালন করিতেন। মার খেয়ালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাহা চরিতার্থ হয় সে বিষয়ে ও নজর দিতেন। ইচ্ছাময়ীমায়ের ইচ্ছা পূরণে দিদির নিষ্ঠা অনন্য। মার বাণী, মার ইশারা সকলের চিন্তাধারার মধ্যে তিনি সহজেই বিতরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী সদা কর্মব্যস্ততার। তিনি তাঁর সুখ-দু:খ, পাপ-পুণ্য মার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল মার আশীর্বাদে জীব-জগৎ কৃতার্থ হোক।

কাশী আশ্রমে ইংরাজী ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ সনের পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ সংকল্পিত এক কোটি গায়ত্রী মন্ত্র সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দশ হাজারেরও অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যতীত অসংখ্য সাধু-মহাত্মাদের বিবিধ প্রকারে আদর, আপ্যায়ণ এবং নানাবিধ আনন্দোৎসব পালিত হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে দিদি অপূর্ব ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মার হীরক জয়ন্তী উৎসব (তুলাদানসহ) এবং প্রতি বৎসরের সংযম সপ্তাহ মহাব্রতে দিদির কঠোর পরিশ্রমপূর্বক সেবার অবদান উল্লেখনীয়।

কাশী আশ্রমের আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মাতৃ মূর্তিগুলি দিদিরই ভাবচক্ষে দর্শিত মূর্তি (চতুর্থ মূর্তিটি বিশেষ কারণ বশত: এখনও স্থাপন করা হয় নাই)।

দিদি যেমন মার খেয়াল চরিতার্থ করিতেন তেমনি দিদির প্রতিও মার অশেষ স্নেহের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। আগরপাড়া আশ্রমে মার অশীতিতম জন্মোৎসবের তিথি পূজার দিন (২৮-৫-১৯৭৫) দিদি তাঁহার অস্তিম্ব ইচ্ছা প্রকট করিয়া বলিয়াছিলেন যে যেখানে মার

জন্মোৎসবের প্যাণ্ডেল হইয়াছে সেই স্থানেই মার এক মন্দির নির্মিত হোক। মা তিথি পূজার রাত্রেই (রাত্রি ২.৩০ মি:) স্বরূপানন্দজীকে ডাকাইয়া দেখাইলেন, “দিদি যে মন্দিরের কথা বলেছে তা এখানে করা।”

অবশেষে ১৪ই মে ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার আবির্ভাব শতবার্ষিকী উৎসবে উক্তস্থানে নির্মিত ‘আনন্দ ধ্যানপীঠে’ মার মূর্তি স্থাপিত হয়।

যোগীগণেরও অগম্য সেবামূলক সাধনার যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত গুরুপ্রিয়াদিদি মাতৃভক্তদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন আশাকরি আশ্রমবাসীগণ বিশেষত: তাঁহার কীর্তিস্তম্ভরূপ কন্যাপীঠের সদস্যাগণ সেই সুপথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না।



সন্তুৰামি যুগে যুগে

— শ্রীমতী স্মৃতি মুখার্জী

ভগবান যুগে যুগে লীলা করতে আসেন তাঁর লীলা সঙ্গীদের সাথে নিয়ে। শ্রীশ্রী মায়ের আবির্ভাবের সাথেও দিদি গুরুপ্রিয়া এ ধরামে এসেছিলেন তাঁর লীলা সঙ্গী হয়ে। শ্রীরামচন্দ্রের হনুমানজী, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন ও শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সঙ্গী দিদি গুরুপ্রিয়া। এই নামও মায়েরই প্রদত্ত।

শোনা যায় দিদির মধ্যে অল্প বয়স থেকেই একটি বিশেষ বৈরাগ্যের ভাব ছিল সাংসারিক বিষয়ে। ওনার বাবা স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন মুখার্জী তৎকালীন সিভিল সার্জন ছিলেন। সেই কারণে প্রাচুর্যের মধ্যেই উনি মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও রকম ভোগবিলাসিতা ওনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমনকি কোনও উৎসব উপলক্ষে সাজসজ্জার প্রয়োজন হলে উনি তা করতেন তো নাই উপরন্তু অপরিস্ফুট জায়গায় নাকি গিয়ে বসে থাকতেন।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ওনার বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহটা ওনার জীবনে ছিল কেবলমাত্র সংস্কার পূরণ। সে বিষয়েও শোনা যায় যে স্বামীর সঙ্গে বাক্যলাপতো দূরের কথা সামনেও কোনওদিন বেরোতেন না। ওনার স্বামী কন্মক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পর উনি সংসারের সব কাজ সম্পন্ন করে স্বামী বাড়ী ফিরে আসার পূর্বেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকতেন। এমন কি খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমত করতেন না। ফলে শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ হয়। তখন তিনি বাধ্য হয়ে ওনার ভাইকে চিঠি দেন। দিদির দাদা পত্র পেয়ে আসামাত্র উনি দাদার সঙ্গে ঢাকায় পিত্রালয়ে চলে যান এবং তারপর আর স্বামীর সংসারে ফেরেন নি। পিত্রালয়ে বাবা, মায়ের সেবা নিয়েই তিনি থাকতেন। কিছু বছর পর দিদির মাতৃ বিয়োগ হয়। ওনার মন তখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। সেই সময় কিছু দিন পর দিদির বাবা স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন মুখার্জী (পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দজী) ঢাকায় শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন পান এবং এর অল্পদিন পর তিনি দিদিকে নিয়ে মায়ের দর্শনে যান। সেই সময় থেকেই দিদি ক্রমশঃ মায়ের সান্নিধ্যে আসতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীশ্রী মায়ের সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। ক্রমশঃ এমন ভাবে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব মায়ের সেবায় বিলিয়ে দেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা একেবারেই অকল্পনীয়। স্বকীয়তা বোধই ছিল না। এমন কি শরীর ধারণের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন সেটাও সম্পূর্ণ ভাবে ছিল ওনার মাতৃ নির্ভর।

শ্রীশ্রী মা ছিলেন দিদির একমাত্র উপাসনা। নিজের ভাবে যখন যেটা মা বলতেন দিদি সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিখুঁত ভাবে পালন করতেন। একবার কন্যাপীঠের একটি কাজ শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী করা হলো, তারপর মায়ের খেয়ালে সেটা অন্যভাবে করতে বলা হলো, দিদি সঙ্গে সঙ্গে সেটা পালন করলেন। মায়ের বহুদিনের পুরানো ভক্ত মনাদা সেই কাজের ভার নিয়েছিলেন। তিনি দিদির কথা মত মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি পুনরায় সম্পন্ন করেন।

সেই সময় তিনি দিদিকে বলেছিলেন — দিদি তোমার ভক্তিতা কি রকম জানো, মা যদি কয় দিদি সূর্য্যটা আজ পশ্চিম দিকে উঠছে, তুমি কইবা হ' মা সত্যই। সঙ্গে সঙ্গে দিদি হাতজোর করে বললেন, দাদা, আশীর্বাদ করেন যেন তাই হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিয়োগ ও কর্মযোগের অপূর্ব্ব সমন্বয় দিদির মধ্যে প্রকাশ পায়।

দিদির অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তিনি ছিলেন “বজ্রাদপি কঠোরানি কোমলানি কুসুমাদপি।” দিদি যখন যাকে শাসন করতেন সেটা কঠোর মনে হলেও সেটা তাদের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু তাঁর স্নেহ ছিল অতুলনীয়। যারাই তাঁর সান্নিধ্যে গেছে তারাই সেই অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় পেয়েছে। যদি কেউ দিদির কাছে গিয়ে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন একান্তে পাওয়ার প্রার্থনা জানাতেন দিদি প্রত্যেককে যে ভাবে হোক শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাতেন। একবার পুণাতে স্বর্গীয় দিলীপ রায় মহাশয় দিদিকে বলেছিলেন — “দিদি, তুমি হচ্ছে স্বর্গের সিঁড়ি, মার কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার রাস্তা।” দিদির জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল সবাইকে যথাসাধ্য শ্রীশ্রী মাতৃ সান্নিধ্যে নিয়ে আসা। দিদির প্রতিটি কাজই ছিল নিখুঁত। ওনার হাতের রান্না যাঁরা খেয়েছেন মনে হয় জীবনে তাঁরা সেটা ভুলতে পারেন নি।

দিদির কর্মযোগের একটি বিশেষ নিদর্শন বারাণসীর এই কন্যাপীঠ। এর গঠনমূলক কাজে দিদির যে অবদান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম যা কোন মানুষের পক্ষে বিশেষতঃ একজন নারীর পক্ষে অকল্পনীয়। এক কথায় তিনি ছিলেন ‘অঘটন ঘটন পটিয়সী’ এবং তার মূলে হচ্ছে মাতৃকৃপা - মাতৃশক্তি, ভক্ত ও ভগবানের লীলার একটি অঙ্গ। আমাদের কন্যাপীঠের বোনেরা তাদের অশেষ সুকৃতির ফলে ভক্ত ও ভগবানের এই লীলা দর্শন করে ধন্য হয়েছে। আজ শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় দিদির এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমাদের কন্যাপীঠের বোনেরা শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মক্ষেত্রে তাদের কুশলতার বিশেষ পরিচয় দিচ্ছে, যা আজকের জগতে বিরল বলা চলে। এই কন্যাপীঠে থেকে তারা উচ্চমানের বিদ্যা অর্জন করেছে ও করছে, এমন কি ডক্টরেট উপাধি পর্যন্ত লাভ করেছে। ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও এই কন্যাপীঠের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের পক্ষে দিদির সম্বন্ধে আলোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তাই আজ অশ্রুজলে সেই মহানের স্মৃতি তর্পণ করা ছাড়া আর আমার কিছু করার নেই।



আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

[দিদি গুরুপ্রিয়া স্মরণিকা]

— প্রতিভা কুমার কুণ্ডু

ভাইজী তো বলেইছেন, ‘কখনও ভুলেও আমাদের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা মিলাইবার প্রয়াস করিবে না।’ ভাইজী আমাদের জন্য এই পরম সত্য উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদি তাঁর মাতৃদর্শনের প্রারম্ভ থেকেই এই কথাটি সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে সারাটি জীবন পালন করে গেছেন। মাতৃশরণে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। আমরা জানি, গুরুপ্রিয়া দিদি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের নিত্য সহচরী সেবিকা ছিলেন, কন্যাপীঠ স্থাপনা করেছিলেন, কাশীতে হাসপাতাল নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, আমাদের অনেক আশ্রম নির্মাণে এবং রক্ষণাবেক্ষণে নিরলসভাবে সক্রিয় ছিলেন, নিজস্ব দিনপঞ্জী অবলম্বনে অপূর্ব সুসংহত ও যথাযথ মাতৃজীবনী রচনা করে গেছেন। দিদির রচিত এই মাতৃজীবনী থেকে আমরা যুগপৎ শ্রীশ্রী মায়ের তত্ত্ববাণী ও লীলাকথা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। আজও দিদির রচিত এই মাতৃজীবনীর কোনো বিকল্প পুস্তক নেই।

গভীরভাবে থেকে সরে এসে আমরা যদি দিদির জীবনের হাস্কা দিকটা স্মরণ করি, তাহলে অন্য প্রকৃতির রসাস্বাদনের উপলব্ধি আমরা করতে পারি। দিদির নানারকম পুরুষোচিত পুরুষকার ছিল। তাঁর চোখেমুখে প্রায় সব সময়ই কিছু না কিছু কাজের অগ্রিম ভাবনা চিন্তার ছাপ থাকতো এবং সকলকেই কোনো না কোনো আদেশ নির্দেশ দেবার ভাবটুকু লক্ষ্য করা যেত। যে নির্দেশটুকু পাবার জন্যে আমরা সকলেই সদা সর্বদা ব্যগ্র থাকতাম। আমাদের আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা, ব্রহ্মচারিণীরা, কন্যাপীঠের মেয়েরা এবং আমরা গৃহীরা গুরুপ্রিয়া দিদিকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম এবং যথেষ্ট ভয়ও পেতাম। যে জন্য দিদি, ‘দাদাভাই’ রূপেই কন্যাপীঠে পরিচিতা ছিলেন, ‘দিদিভাই’ নয়।

দিদির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই কথিকা। স্মরণিকাও বলা যায়। তাঁর লৌকিক ব্যবহারে যেটুকু দেখেছি এবং পেয়েছি, সেটুকুই স্মরণ করা।

স্বামী পরমানন্দজীর বুকপকেটে যেমন টাকাপয়সার ট্রেজারী থাকতো, ঠিক তেমনিই গুরুপ্রিয়া দিদির বটুয়ায় খুচরো টাকাপয়সার ট্রেজারী থাকতো। ১৯৭৪ সনের যোধপুর পার্কের ভাগবত সপ্তাহেও চাওয়ামাত্রই দিদি রুমালে বাঁধা অনেক খুচরা টাকা আমাকে দিয়ে দিলেন। তার মধ্যে অনেক বহু পুরানো নোট দিদির জমানো ছিল। ঠিক সময় মত এবং প্রয়োজন মত খরচ হয়ে গেল।

শ্রীশ্রী মায়ের শিক্ষায় দিদি ও সবাইকে খাওয়াতে ভালো বাসতেন। রন্ধনকার্য যে সত্য সত্যই একটি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম, দিদি সেটি হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। বাঁধাকপি (ছোট

গোলাকার) কাঠি দিয়ে আটকিয়ে অথবা সূতা দিয়ে বেঁধে কড়াইতে বেক করা, কিম্বা চালকুমড়োর একপিঠে পুর লাগিয়ে একরকম ডেভিল ভাজা, এইরকম অদ্ভুত অদ্ভুত রন্ধনপদের সৃষ্টি করতেন দিদি। ১৯৬৫ সনে কালীতে দীক্ষার পর সেইদিনই কন্যাপীঠের একতলার বারান্দায় মোড়াতে বসে দিদি লেখককে কত যত্ন করে, কিছুটা জোর করেও যা খাওয়ানো খাইয়েছিলেন, সেকথা আজ চৌত্রিশ বছর পরও ভুলতে পারিনি।

সঙ্ঘের বা আশ্রমের কাজে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল স্বামী পরমানন্দজীর সঙ্গে। তেমনভাবে দিদির সঙ্গে কাজকর্ম করবার সুযোগ পাইনি। কিন্তু দিদির জীবনের শেষ ইচ্ছা একটি ছিল, যেটি যথাযথভাবে পূরণ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। দিদির শেষ ইচ্ছাটি ছিল আগরপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের মন্দির নির্মাণ। সেই মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং সেটির নামকরণ হয়েছে ‘আনন্দ ধ্যানপীঠ’। আনন্দ ধ্যানপীঠে মাতৃমূর্তিও স্থাপিত হয়েছে। দিদির জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিদির অন্তিম ইচ্ছা পূরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু এই ক্ষুদ্র কথিকায় উদ্ধৃত করে দেবার প্রয়োজন আছে মনে করি।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দজী লিপিবদ্ধ করেছিলেন—
“১৯৭৫ সনের মে মাস। শ্রীশ্রী মায়ের জন্মজয়ন্তী উৎসব কলকাতার আগরপাড়া আশ্রমে অতি জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রীশ্রী মার আশীতম জন্মজয়ন্তী উৎসবান্তে রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় হঠাৎ মার ডাক এল। গিয়ে প্রণাম করতে মা বললেন, দিদি কোথায় মন্দির করার কথা বলেছে? মা আমাকে নিয়ে গেলেন গেষ্ট হাউসের সামনে। সঙ্গে ছিলেন (স্বর্গীয়) মাখন ঘোষ এবং নন্দুবেন। গেষ্ট হাউসের সম্মুখে যেখানে উৎসবের সময় প্যাণ্ডেল হয়েছিল সেই মাঠের একটি স্থানে দাঁড়িয়ে মা বললেন, দিদি যে মন্দিরের কথা বলেছে তা এখানে করতে পার।

“এর কয়েকদিন পর মা কনখলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। গুরুপ্রিয়া দিদি ওখানেই থেকে গেলেন। গুরু পূর্ণিমার পূর্বে দিদি আমাকে জোর করে কনখল পাঠিয়ে দিলেন, পাঁচখানা ইঁট যেগুলি মন্দিরের শিলান্যাসে দরকার হবে সেগুলি মার স্পর্শ করে আনবার জন্য। এলাম কনখল। গুরু পূর্ণিমার দিন এক অতীব শুভলগ্নে কনখলের গেষ্ট হাউসের এক নং ঘরে সেই ইঁটগুলির উপর মার শ্রীচরণ রেখে পূজা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

“এর মধ্যে মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “সময়টা ঠিক আছে তো?” পঞ্জিকা দেখে এসে বললাম, “হ্যাঁ মা, সময় ঠিক আছে।” পূজান্তে সে কয়খানা ইঁট ও ফুলগুলো নিয়ে রেখে দিলাম ও পরে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সুরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থাও হলো। এর পর ঝুলন জন্মাষ্টমীতে সোনার বাস্তুসাপ ও পঞ্চরত্নাদি নিয়ে বৃন্দাবন পৌঁছলাম। মা পছন্দ করতেন বসা অবস্থার সাপ। বৃন্দাবনে ছলিয়া মন্দিরের পিছনে মার হাতে সোনার সাপটি দিতেই মা আংটি করে সেটি পরলেন। আর পঞ্চরত্নগুলিও ভালভাবে দেখে নিয়ে ফেরৎ দিলেন। এর পর মা কেন যেন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমাকে বললেন, “স্বরূপ, মন্দির এখন নয়, পরে।” যদিও

আগরপাড়ার মন্দিরের মডেল আদি হয়ে গিয়েছিল, টাকাও কিছু কিছু জোগার হয়েছিল, তবুও মার কথায় তখনকার মত সব স্থগিত রইল।”

মধ্য রাত্রে আড়াইটার সময় এখন যেখানে আনন্দ ধ্যানপীঠ নির্মিত হয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে মা স্বরূপদাকে বলেছিলেন, দিদি যে মন্দিরের কথা বলেছে তা এখানে করতে পার।

২৮/৫/৭৫ তারিখে শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ‘আজ মায়ের অশীতিতম জন্মোৎসবের তিথি পূজায় আমার ইচ্ছা যে মায়ের যেখানে জন্মোৎসবের প্যাণ্ডেল হয়েছে, ঐ স্থানে মায়ের একটি মন্দির হয়। তোমরা আশাকরি আন্তরিকভাবে সাহায্য করবে। এই গুপ্ত কথাটি এখন স্বরূপ, মাখন ও উর্মিলা গোয়েন্ধার পরিবারকে জানানো হল। এই সব কথা প্রাইভেটে আমার মায়ের সঙ্গে হয়েছে।’

আনন্দ ধ্যানপীঠ শ্রীশ্রী মায়ের ব্যক্ত নির্দেশেই নির্মিত হয়েছে এবং পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে। সেজন্য আগরপাড়া আশ্রম চিরধন্য। শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণকমলে আমরা শতকোটি প্রাণিপাত নিবেদন করি এবং দিদির চরণে ভক্তিনশ্র ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।



শত বরষের লহ গো প্রণাম—

— ব্রহ্মচারিণী গীতা

মহাজনের জীবন-জ্যোতিকে কোনো কালের পরিধির মধ্যে সীমিত করা যায় না। কারণ সেই মহাজীবনের জ্যোতির্ময় আলোকে আলোকিত হতে থাকে আরোও বহুজীবন আবহমান কালধরে। তবুও তাঁর সেই পুণ্যময় আবির্ভাবরূপটিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে, তাঁর অমরকীর্তির গুণগান করে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে, তাঁর ভক্তি জ্ঞানগঙ্গার অমলধারায় অভিষিক্ত হয়ে মানব চির উত্তরণের পথে আরোহণ করে। তাই বছরে বছরে মহাসমারোহে মহাজনের সেই পুণ্যময় আবির্ভাব তিথি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় দেশে-দেশে নগরে-নগরে।

এমনই এক মহাজনের শতবরষের আবির্ভাব জয়ন্তী সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হল। চিরস্মরণীয় সেই নাম দিদি গুরুপ্রিয়া। যতদিন ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের নাম অমর হয়ে থাকবে, ততদিন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে দিদি গুরুপ্রিয়ারও নাম। মায়ের দিব্যজীবন বিভায়ে বিভাসিত হয়েছিল দিদি গুরুপ্রিয়ার জীবন এবং সংরচিত হয়েছিল একটি সুদৃঢ় আলোকবর্তিকা। সেই আলোকবর্তিকা হতে আলোকিত হয়েছিল বহুজীবন। সেই দীপ্ত আলোকের সমুজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে আগামী দিনে তাতে আলোকিত হবে আরোও বহুজীবন। গুরুপ্রিয়া, ওগো মাতৃপ্রিয়া, শতবরষের লহগো প্রণাম।

একবার দিদির জন্মদিনে কন্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধানাচার্য্যা শ্রদ্ধেয়া কুমারী সতী দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীমাকে গিয়ে বললেন, ‘মা, আমরা দিদির জন্মদিন পালন করব। কিন্তু কিভাবে করব?’ মা বললেন, ‘দিদির জীবন সংযমময়। তোমরা দিদির জন্মদিনে সংযম পালন করবে।’ সময়টা ছিল পঞ্চাশের দশকের পূর্বার্ধ। ১৯৫৪ বা ১৯৫৫ সন হবে। দিদি তখন অসুস্থ। শ্রীশ্রী মায়েরই খেয়ালে শ্রদ্ধেয়া সতীদির মনে হয়েছিল জন্মদিন পালন করলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। তাই এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত।

মাতৃনির্দেশেই দিদির প্রথম জন্মদিন পালিত হয়। কাশী আশ্রমে কন্যাপীঠের নীচের বারান্দায় দিদিকে চেয়ারে বসিয়ে নতুন বস্ত্র, ফল, মালা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। সেদিন আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী বড় মেয়েরা ও কন্যাপীঠের মেয়েরাও দিদির সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলেন। দিদি তো মা ছাড়া কিছুই জানতেন না এবং মায়ের আদর্শই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কথা। মাতৃ নির্দেশে জন্মদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুতরাং হাত জোড় করে চুপ করে বসে রইলেন। পরে মেয়েদের বললেন, ‘তোরা আবার একি আরম্ভ করলি?’ কন্যাপীঠে সেদিন সংযম পালিত হল। এইভাবে দিদির প্রথম জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এরপর প্রতি বছরই দিদির উপস্থিতিতে এবং পরে দিদির মহাপ্রয়াণের পরও তাঁর জন্মদিনে

কন্যাপীঠের মেয়েরা সকালে বেদপাঠ করে দিদির ছবিতে মালা দিয়ে ফলমিষ্টি ভোগ দিয়ে আরতি করে। সেদিন সংযম পালিত হয়।

কিছু বছর ধরে কন্যাপীঠে দিদির জন্মদিন ‘সংস্থাপিকাদিবস’ রূপেও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং এই উপলক্ষ্যে কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতিবছরই দিব্যজীবন সংঘের অধ্যক্ষ পরম পূজ্য স্বামী চিদানন্দজীর শুভাগমন হয়।

এ বছর দিদির শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্ণ হল। কাশীর আশ্রম ও কন্যাপীঠ দিদির অমরকীর্তি। সুতরাং কাশীতে কন্যাপীঠে দিদির শতবর্ষের জন্ম জয়ন্তী মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হবে সকলেই এই কথা অনুমোদন করলেন। উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় একবছর ধরেই চলছিল। সঙ্গে কন্যাপীঠের হীরক জয়ন্তী মহোৎসব যেন সুবর্ণ সংযোগ। দিদির সঙ্গে কন্যাপীঠ যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তারই সূচনা পরিলক্ষিত হল এই দুইটি উৎসবের একই সঙ্গে সাড়ম্বরে সানন্দে অনুষ্ঠানের সমায়োজনায়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী হতে ২১শে ফেব্রুয়ারী উৎসব নয় দিন ধরে আয়োজিত হবে সুনিশ্চিত হল।

উৎসবের শুভবার্তা নিয়ে সমাগত হল ১৯৯৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তির পুণ্য তিথি। দিদির শুভ জন্ম তিথিতে ‘সংযম দিবস’ পালিত হল। সংযমের অনুরূপ প্রাতে ও অপরাহ্নে কীর্তন, ধ্যান, মৌন সমবেত ভাবে আনন্দজ্যোতির্মন্দিরের হলঘরে পালিত হল। তারপর শ্রীশ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা হল। পূজা করলেন কন্যাপীঠের প্রধানাচার্য্য ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য। পূজার সময় গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণ মাতানো কীর্তন ভজনে অপূর্বভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। এদিন ভোগের ব্যবস্থাও সংযমের অনুরূপই ছিল। মধ্যাহ্নে দিদির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে কাশী নরেশ ডাঃ বিভূতি নারায়ণ সিংহজী ‘মা আনন্দময়ী করুণা’র শাখা প্রতিষ্ঠান ‘শিশুকল্যাণ’ দ্বারা আয়োজিত কার্যক্রমে মুখ্য অতিথি রূপে ১০০ জন বালক বালিকাদের বস্ত্র ও ফলমিষ্টি প্রদান করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী হতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিনই সকালে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, কীর্তন, ভজন, সমবেত গীতা চণ্ডীপাঠ ও ভাগবত পাঠ হত। ভোগের পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন বিকালে স্তব রামায়ণ পাঠ, সংসঙ্গ প্রবচন, দিদির সম্বন্ধে আলোচনা ও সাঙ্ঘ্যকীর্তন, ভজনের পর অনুষ্ঠানের সমাপন হত।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বিকালে প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা শ্রী রমেশভাই ওঝা ও বিহারের প্রসিদ্ধ সন্ত শ্রদ্ধেয় শ্রী মামাজী এলেন। দুজনেই ভাগবতী কথা ও রামায়ণী কথা সরসভাবে শোনালেন। শ্রী রমেশ ভাই ওঝা তাঁর মাতৃদর্শন সম্বন্ধে ও গুরুতত্ত্বের উপর খুব সুন্দর বললেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহে শ্রীশ্রী মহাশিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হল। পূজার সময় মেয়েদের সঙ্গে ছবিদির কীর্তন গানে সকলে আনন্দিত হলেন। চণ্ডী মণ্ডপের বারান্দা, চণ্ডী মণ্ডপ, অন্নপূর্ণা

মন্দির, গোপাল মন্দির, দিদিয়ার মন্দির সর্বত্রই শিবের পূজার বাহার। সম্পূর্ণ আশ্রমই যেন সেদিন রাত্রিতে শিবের পূজায় মেতে উঠেছিল। বহুভক্ত সমবেতভাবে শিব পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতা হতে আগত প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য্য রাত্রিতে পূজার সময় অল্পপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ ধ্রুপদ গেয়েছিলেন। এদিন পূজা, সংসঙ্গ, প্রবচন প্রভৃতি অনুরূপভাবেই হয়েছিল। শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষ্যে বাইরে থেকে বেশ কিছু ভক্তের সমাগম হয়।

প্রসিদ্ধ রামায়ণী ডাঃ শ্রীনাথ মিশ্রজী এসে অপূর্ব সুন্দর রামায়ণের কথা শোনালেন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিকালে। তার আগে কলকাতা হতে সমাগত সংগীতশিল্পী শ্রীতারক পাল ধ্রুপদ ও শ্যামা সংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মাতৃভক্ত সুধীপ্রবর ডাঃ নলিনী ব্রহ্মের সুযোগ্য পুত্র শ্রীগুরু প্রসাদ ব্রহ্ম গুরুপ্রিয়া দিদির সম্বন্ধে দুইদিন প্রাণম্পর্শী ভাষায় খুব সুন্দর ভাষণ দেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী বিকালে ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রদ্ধেয় স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ হরিদ্বার হতে এসে পৌঁছালেন। তাঁকে এই উৎসবে বিশেষ করে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী হতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে মায়ের পূজা, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত পাঠের পর শ্রদ্ধেয় দেবানন্দজীর ভাষণ রাখা হয়েছিল। তাঁর বিদগ্ধতাপূর্ণ ভাষণে ও ভাবময় ভজনে সকলেই আনন্দিত হতেন। তাঁর আগে প্রতিদিন সকালে আশ্রমের বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজীর ভাষণের জন্য কিছু সময় রাখা হয়েছিল। ভাস্করদাও দিদির সম্বন্ধে সুন্দর বলেন।

আদিগুরু শংকরাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য শ্রীতোটকাচার্য্যের গুরুভক্তির কাহিনী শ্রবণ করিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কুলপতি প্রোফেসার শ্রী বেক্টাচলম্জী মহাশয়। তাঁর ভক্তিপূর্ণ ভাষণে সকলেই অভিভূত হন। এদিন বিকালে শ্রদ্ধেয় দেবানন্দজীরও ভাষণ ছিল। শ্রী বেক্টাচলম্জী আসেন ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিকালে। দিব্যজীবন সংঘের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী চিদানন্দজী মহারাজের শুভাগমন ঘটে ১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে।

উৎসবের প্রাণকেন্দ্র দিবস ছিল ১৯শে ফেব্রুয়ারী। এদিন সকালে যথাবিধি মাতৃপূজা, সংসঙ্গ প্রবচনের পর ১০০ জন সাধুভোজন দর্শনীয় ছিল। কন্যাপীঠের দ্বিতলের হল, বারান্দা ও নীচের বারান্দায় সাধু ভাণ্ডারার ব্যবস্থা হয়। শ্রীশ্রী মায়ের নিদেশিত পন্থায় প্রতিটি সাধুকে মালা, চন্দন, বস্ত্র, দক্ষিণা, ফল ও প্রসাদী রুমাল সহ ভোজন করানো হয়। প্রতি সাধুকে একটি করে ‘বিবেক চূড়ামণি’ গ্রন্থ দেওয়া হয়। সাধুদের আরতি করা হয়। মহামণ্ডলেশ্বর দেবানন্দ সরস্বতীজীও কন্যাপীঠের হল ঘরে এদিন সাধুদের সঙ্গেই ভোজন করেন।

অপরাহ্নে ৩:৩০ মিনিট হতে বিশেষ কার্যক্রমের অনুষ্ঠান হয় আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরের হল ঘরে। এদিন সভার সভাপতি ছিলেন মহামহিম কালী নরেশ। বিশিষ্ট অতিথি রূপে দিব্য

জীবন সংঘের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজ, ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজী, সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডাঃ মণ্ডন মিশ্রজী মঞ্চ সমাসীন ছিলেন। মহারাজকুমার শ্রী অনন্তনারায়ণ সিংহজী এবং মহারাজকুমারীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সর্বপ্রথমে কন্যাপীঠের মেয়েদের বেদধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে পূজনীয় স্বামী চিদানন্দজী ও মহামহিম কাশীনরেশ দিদি গুরুপ্রিয়ায় দুইটি চিত্র অনাবরণ করে বিশেষ কার্যক্রমের উদঘাটন করেন। দশ জন মেয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করে। বেদধ্বনির মধ্যে চিত্রের অনাবরণের অনুষ্ঠানটি অনবদ্য হয়েছিল। একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর বিশিষ্ট মহাত্মারা ও মাননীয় অতিথিরা গুরুপ্রিয়াদিদির চিত্রে মাল্যার্পণ করেন। আশ্রমের পক্ষ হতে আশ্রমের ব্যোজ্যেষ্ঠ বরিষ্ঠ সাধু স্বামী ভাস্করানন্দজী ও শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীগোবিন্দনারায়ণজীর পক্ষ হতে সংঘের Additional General Secretary ডাঃ দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায় গুরুপ্রিয়া দিদির চিত্রে মাল্যার্পণ করেন। কন্যাপীঠের অধ্যক্ষা ডাঃ বীথিকা মুখার্জীর পক্ষ হতে কন্যাপীঠের Secretary ব্রহ্মচারিণী কান্তি গুটু ও প্রধানাচার্য্যা জয়া ভট্টাচার্য্য মাল্যার্পণ করেন। স্বাগত ভাষণ করেন ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য। পূজনীয় মহাত্মাগণ ও মাননীয় অতিথিদের মাল্যার্পণ করা হয়। এর পর মেয়েরা ‘শুভ্রসমুজ্জ্বল’ এই নজরুল গীতিটি উদ্বোধন সংগীতরূপে পরিবেশন করে। কন্যাপীঠের অধ্যাপিকাদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় সংরচিত ও সুরসংযোজিত গুরুপ্রিয়া দেবী বন্দনা গীত হয় কন্যাপীঠের ছোটমেয়েদের দ্বারা। তারপর মেয়েদের বিবিধ ভাষায় গুরুপ্রিয়া দিদির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রস্তুতি খুবই প্রশংসনীয় হয়। বিবিধ দেশীয় ভাষা যথা—সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, কন্নড়, তামিল, নেপালী এবং বিদেশী ভাষা ইংরাজী, জার্মান, ল্যাটিন ভাষায় মেয়েরা দিদির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

গুরুপ্রিয়া দিদির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত ‘ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া’ এই নামে একটি সচিত্র জীবনী-গ্রন্থের বিমোচন করেন শ্রদ্ধেয় স্বামী চিদানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ। এই গ্রন্থটির প্রকাশন নৈপুণ্যের সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রবুদ্ধ সাহিত্যিক হিন্দী ভাষায় দিদির সংক্ষিপ্ত জীবনীর আলোচন ও যথাযথ চিত্র সংকলনে প্রকাশনায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বইটি মাতৃভক্তদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

গ্রন্থবিমোচনের পর গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র সংগীত ও কন্যাপীঠের অধ্যাপিকার দ্বারা হিন্দী ভাষায় বিরচিত একটি ভজন গান করে গুরুপ্রিয়া দিদিকে সশ্রদ্ধ সংগীতাঞ্জলি অর্পণ করেন। এরপর শ্রীশ্রী মা ও বিশিষ্ট মহাত্মাদের এবং মাননীয় অতিথিদের ‘শ্রীগুরুপ্রিয়াদেবী স্মৃতি চিহ্ন’ অর্পণ করা হয়। দিদি গুরুপ্রিয়ার জন্মশতবার্ষিকী ও কন্যাপীঠের হীরকজয়ন্তীর পুণ্যময় অবসরে কন্যাপীঠের বিবরণ প্রস্তুত করেন কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা। শ্রদ্ধেয়া ভজনানন্দজী (পুষ্পদি) দিদির প্রিয়গান কবিগুরুর প্রসিদ্ধ সংগীত ‘আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে’ মেয়েদের সঙ্গে গান করে গুরুপ্রিয়াদিদির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। মাননীয় অতিথিদের

মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রাধ্যাপক ও ডিন ডা: রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী ও কন্যাপীঠের প্রাধ্যাপক শ্রী দ্বারকা প্রসাদজী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

মুখ্য অতিথির পদ হতে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডা: যশুদেব মিশ্রজী ভাষণ দেন। সমবেত বিশিষ্ট মহাত্মাগণেরা গুরুপ্রিয়া দিদির সম্বন্ধে বলেন। স্বামী ভাস্করানন্দজীও একটু বলেন। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী গোবিন্দনারায়ণজীর চিঠি ডা: দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাঠ করে শোনান। সভাপতির পদ হতে কাশী নরেশ গুরুপ্রিয়া দিদি সম্বন্ধে চমৎকার বলেন। মাতৃস্তব গানের দ্বারা এদিনের সভার সমাপন হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে যথারীতি মায়ের পূজা সংসঙ্গ প্রবচনের পর এদিনের বিশেষ কার্যক্রম ছিল ১০০ জন কুমারীর বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভোজন। কন্যাপীঠের দ্বিতলের হলঘর ও বারান্দাতেই কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা হয়। কুমারীদের আরতি হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বামী চিদানন্দজী, স্বামী দেবানন্দজী, স্বামী ভাস্করানন্দজী, স্বামী নিগুণানন্দজী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রঙ বেরঙের ওড়না ও মালা চন্দনে ভূষিতা ছোট ছোট কুমারীদের দর্শনে ফুলপরীদের দেশের কথা মনে হচ্ছিল।

এদিনও ৩:৩০ মিনিট হতে আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভাপতি ছিলেন মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী দেবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ ও মুখ্য অতিথি ছিলেন স্বামী চিদানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ। মেয়েদের বেদধ্বনির সঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ। স্বাগত ও মাল্যার্পণের পর মাতৃবন্দনা। তারপর শ্রী শৈলেশ ব্রহ্মচারী বিরচিত দিদি শীর্ষক কবিতাটির আবৃত্তি করে কন্যাপীঠের ছাত্রী ব্রহ্মচারিণী জ্যোৎস্না রায়। এদিনের বিশেষ কার্যক্রম ছিল কন্যাপীঠের জ্যেষ্ঠা ব্রহ্মচারিণীদের দ্বারা দিদির প্রতি শব্দ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ। ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধা ব্রহ্মচারী নিব্বাণানন্দজীর দিদির সম্বন্ধে লেখা একটি চিঠি পাঠ করে এই অনুষ্ঠানের আরম্ভ করেন। শব্দ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণে অংশ গ্রহণ করেন কন্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধানাচার্য্য ব্রহ্মচারিণী চন্দন, কন্যাপীঠের বর্তমান প্রধানাচার্য্য ব্রহ্মচারিণী জয়া, ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধা, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী ভজনানন্দজী (পুষ্পদি), শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী নরেন চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা দিদির স্নেহধন্যা মন্ত্র শিষ্যা কুমারী মণি চৌধুরীও দিদির সম্বন্ধে খুব সুন্দর বলেন। মায়ের সেবিকা ও দিদির বিশেষ স্নেহের পাত্রী ব্রহ্মচারিণী অনুসূয়া বস্বে হতে ফোনের মাধ্যমে দিদির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে স্বরচিত কবিতা লিখে জানান। সেই কবিতাটি পাঠ করে কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী। কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী গীতা দিদির প্রতি শব্দ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এই অনুষ্ঠানের সমাপন করে। এরপর মেয়েরা দিদির প্রিয় গান ‘এ গর্বভরা মস্তক মেরা’ এই হিন্দী ভজনটি গান করে।

কন্যাপীঠে সর্ব প্রথম আচার্য্য ও এম.এ পাশের জন্য ব্রহ্মচারিণী চন্দন ও ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধাকে শ্রী গুরুপ্রিয়াদেবীর স্মৃতিতে স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করা হয়। কন্যাপীঠে উৎকৃষ্ট অধ্যাপন সেবাপ্রদানের জন্য কন্যাপীঠের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের ‘শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী স্মৃতিচিহ্ন’ প্রদান করা হয়।

শ্রদ্ধেয় মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ দিদি গুরুপ্রিয়ার সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লেখা ‘শ্রদ্ধার্থ’ পুস্তকটির বিমোচন করেন।

মুখ্য অতিথির পদ হতে স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ দিদির সম্বন্ধে খুব সুন্দর বলেন। সভাপতির আসন হতে স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ দিদির সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দিদির প্রিয়গান শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিরচিত ‘পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে মা’ এই গঙ্গা মহিমার গান করে সভা সমাপিত হয়।

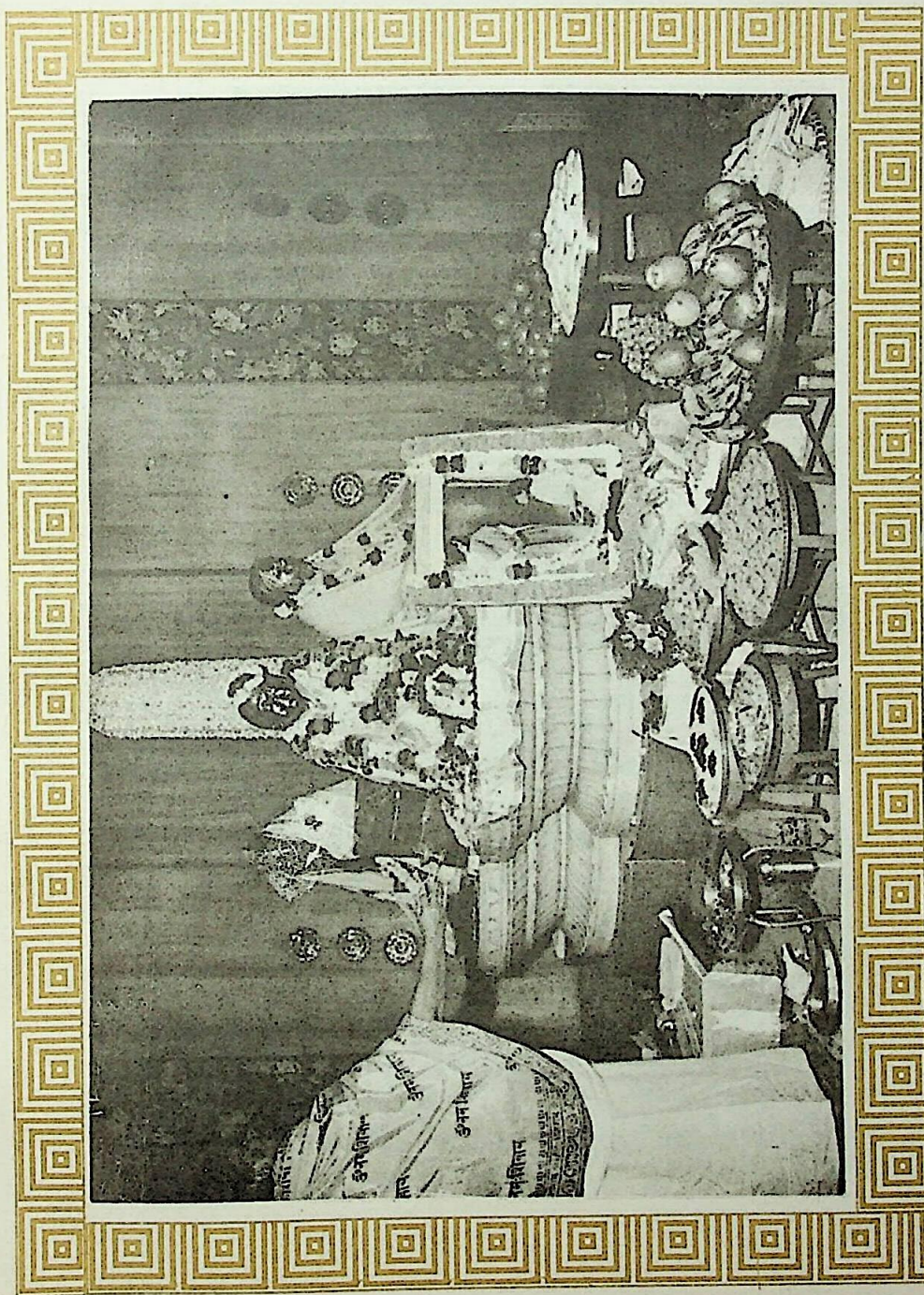
উৎসব সমাপনের সূচনা নিয়ে এল ২১শে ফেব্রুয়ারী। এদিন প্রাতে যথারীতি শ্রীশ্রী মায়ের নিত্যপূজা ও আরতি, পাঠ ও প্রবচনের সময় মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দজীর ভাষণের পর গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সুন্দর কীর্তন করেন।

এদিন মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে শ্রদ্ধেয় স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ ও মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দজী মহারাজের করকমলের দ্বারা প্রতিটি রোগীকে প্রসাদরূপে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ডাক্তার ও কর্মচারী বৃন্দকেও প্রসাদ দেওয়া হয়। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে দরিদ্রনারায়ণ সেবা উপলক্ষ্যে ১০০ জন দরিদ্রনারায়ণকে ভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

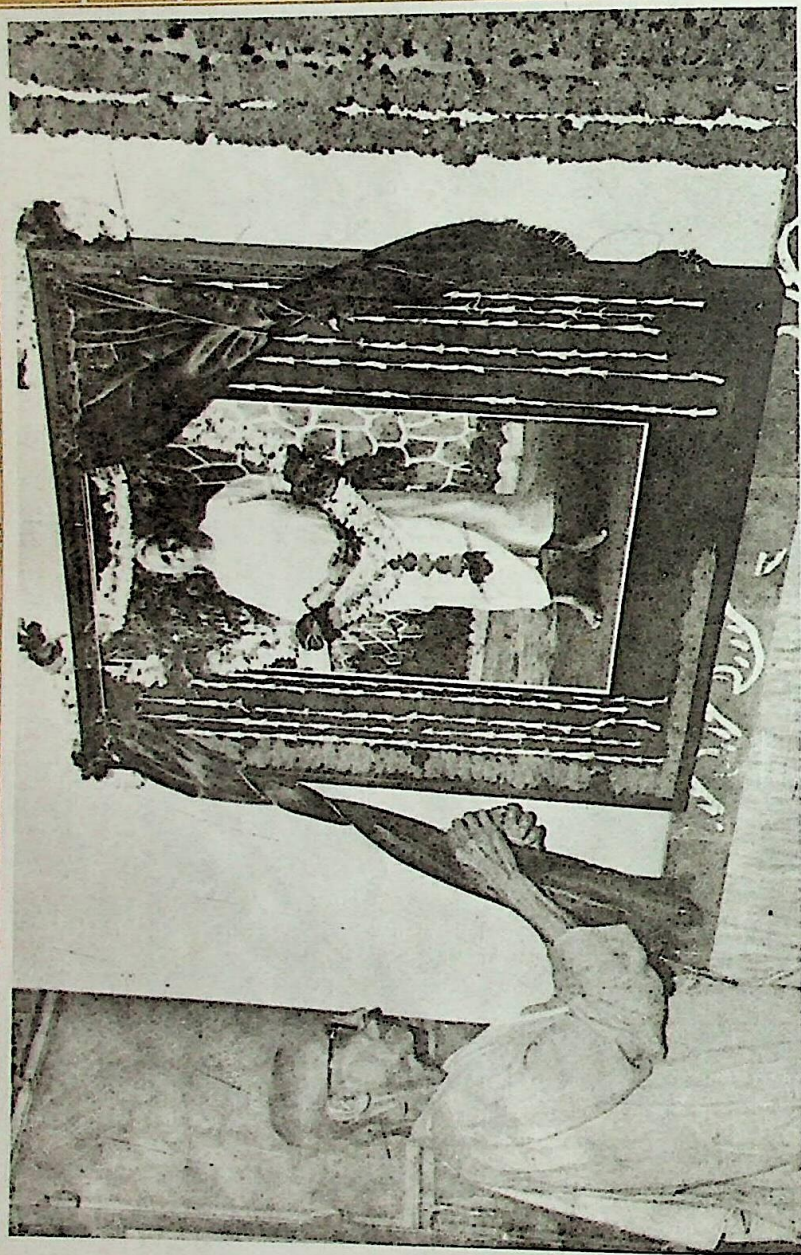
অপরাহ্নে ৩:৩০ মিনিট হতে বিশেষ কার্যক্রম আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসবও ছিল। শ্রদ্ধেয় চিদানন্দ স্বামীজী সভাপতি ছিলেন।

সর্ব প্রথম মেয়েরা বেদধ্বনি ও সরস্বতী বন্দনা করে সভার উদ্বোধন করে। স্বাগত ভাষণ ও মাল্যার্পণের পর কুলগীতি হয়। কন্যাপীঠের ছাত্রী ব্রহ্মচারিণীদের দ্বারা বিবিধ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। যথা ভারত বন্দনা, ইংরাজী কবিতার গান, ‘মমচিন্তে নিতি নৃত্যে’ এই রবীন্দ্র সংগীতটি ছোট মেয়েদের দ্বারা গীত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত হতে গোপীগীত সংস্কৃত ও নেপালী ভাষায় মেয়েরা গান করে।

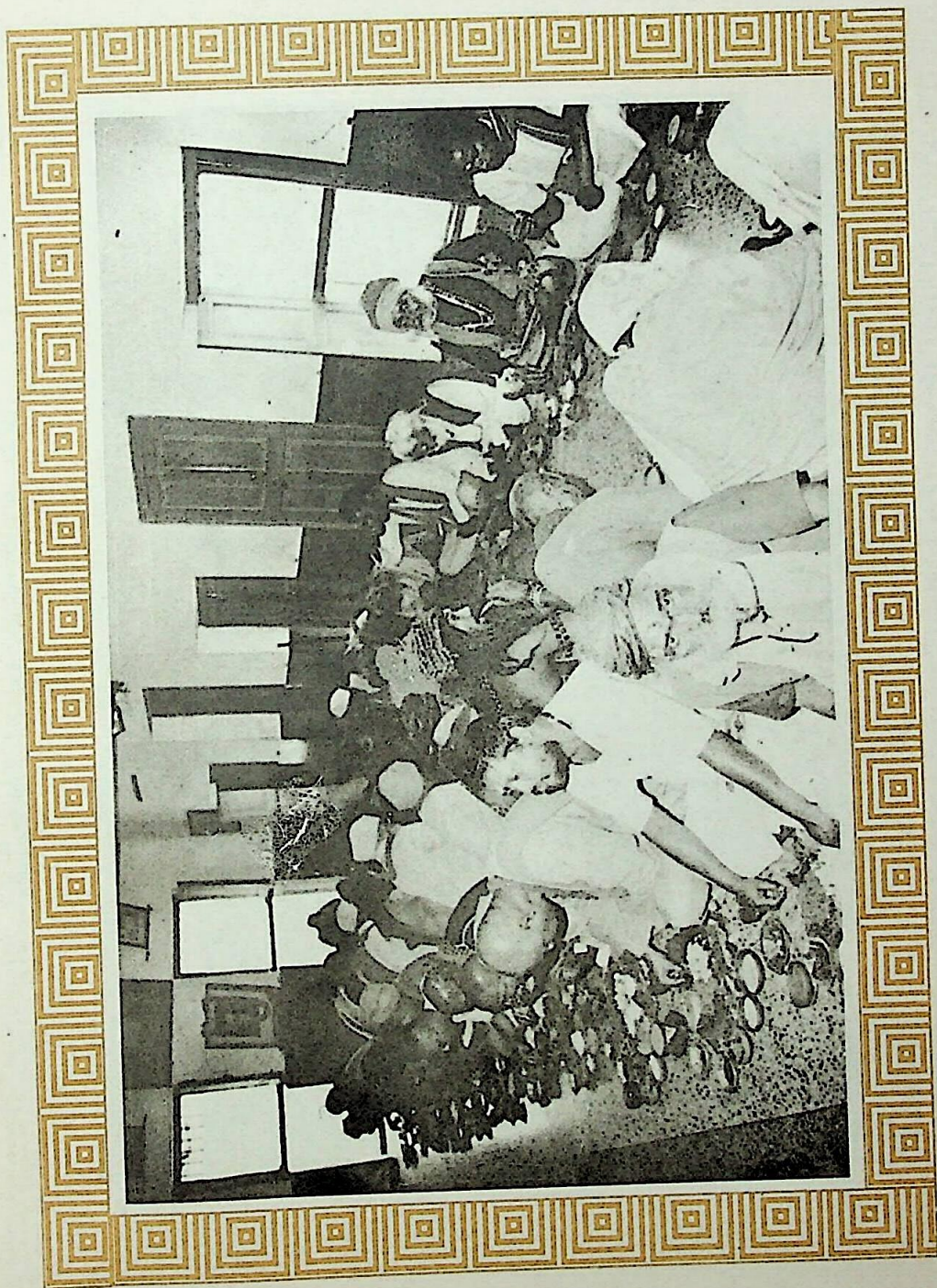
দিদির সম্বন্ধে মেয়েরা নিবন্ধ প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাতে দুইটি বর্গ রাখা হয়েছিল (১) কনিষ্ঠ (২) বরিষ্ঠ বর্গ। তার মধ্যে কনিষ্ঠ বর্গে ব্রহ্মচারিণী সিদ্ধিদাত্রী ভরদ্বাজ প্রথম স্থান অধিকৃত করেছিল এবং বরিষ্ঠ বর্গে প্রথম স্থান অধিকৃত করেছিল ব্রহ্মচারিণী প্রতিভা ভরদ্বাজ। তারা দুজনেই নিজদের নিবন্ধ হতে কিছু অংশ পাঠ করে। বিশেষ স্থানাদিকৃত ব্রহ্মচারিণী শিপ্রা মিশ্রও নিজের নিবন্ধের কিছু অংশ পাঠ করে শোনায়। জন মিল্টনের প্রসিদ্ধ কবিতা On his blindness কবিতাটি আবৃত্তির পর মেয়েদের ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয়ে বাদবিবাদ হয়। দেশগীতির পর শাস্ত্রীয় সংগীত ও সামূহিক স্বরাঞ্জলি পরিবেশন করে। শাস্ত্রীয় সংগীতে প্রথমে দেশ রাগে বন্দিশ গেয়ে তান আলাপের পর তরানার প্রস্তুতি। এর পর ‘মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি’ এই রবীন্দ্র সংগীতের পর মালকোস রাগে ‘নমো নমো ওগো গুরুপ্রিয়া ওগো মাতৃ প্রিয়া’ কন্যাপীঠের অধ্যাপিকার দ্বারা বিরচিত এই গীতটি পরিবেশন করে মেয়েদের কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি হয়।



Special puja of Ma being held in Ananda Jyoti Mandir
on 13th February, 1999, Didi Gurupriya's 100th birthday.



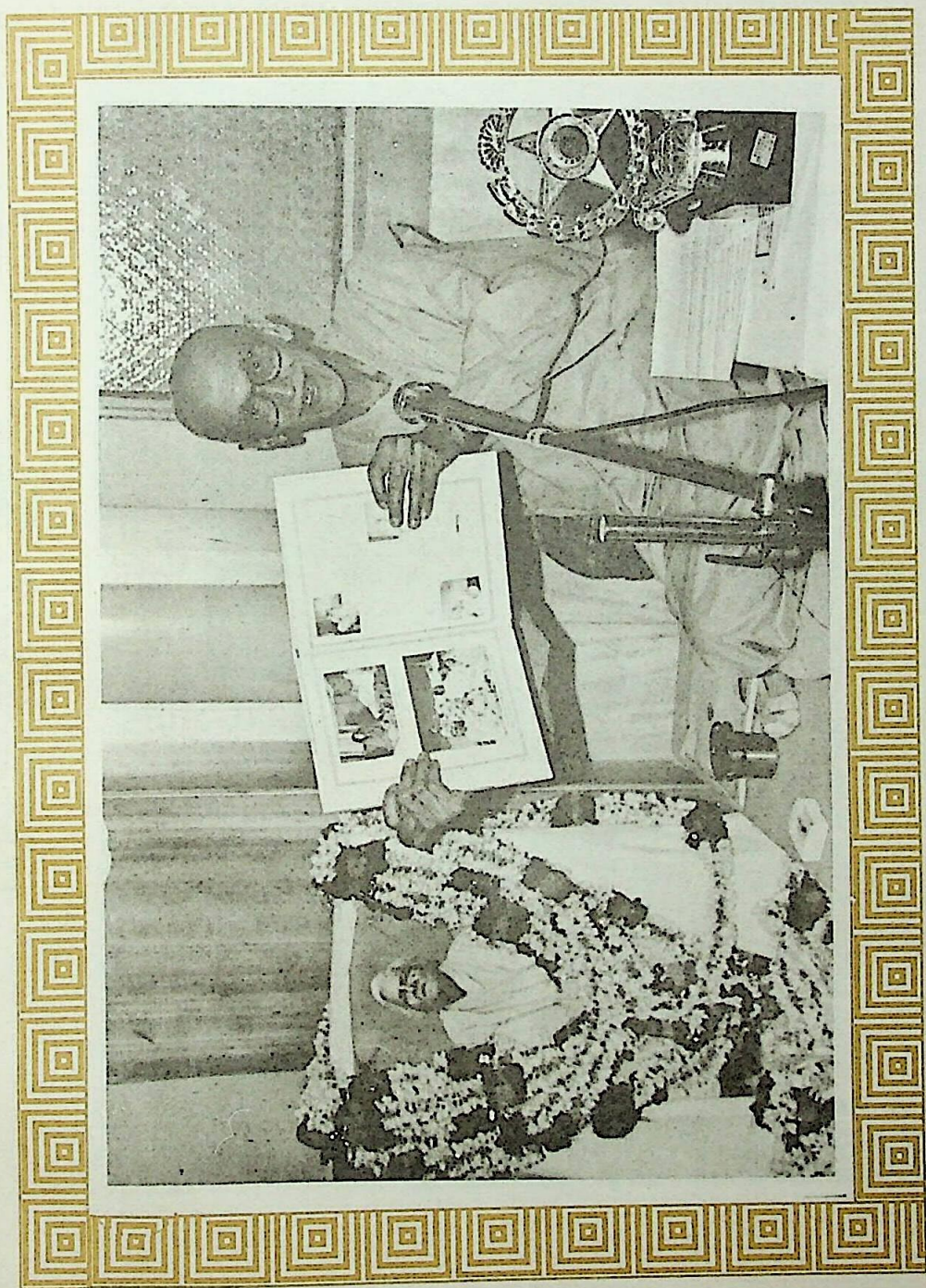
Unveiling of Didi Gurupriya's Photo by
Puja Swami Chidanandaji Mahara' - on 19th February, 99



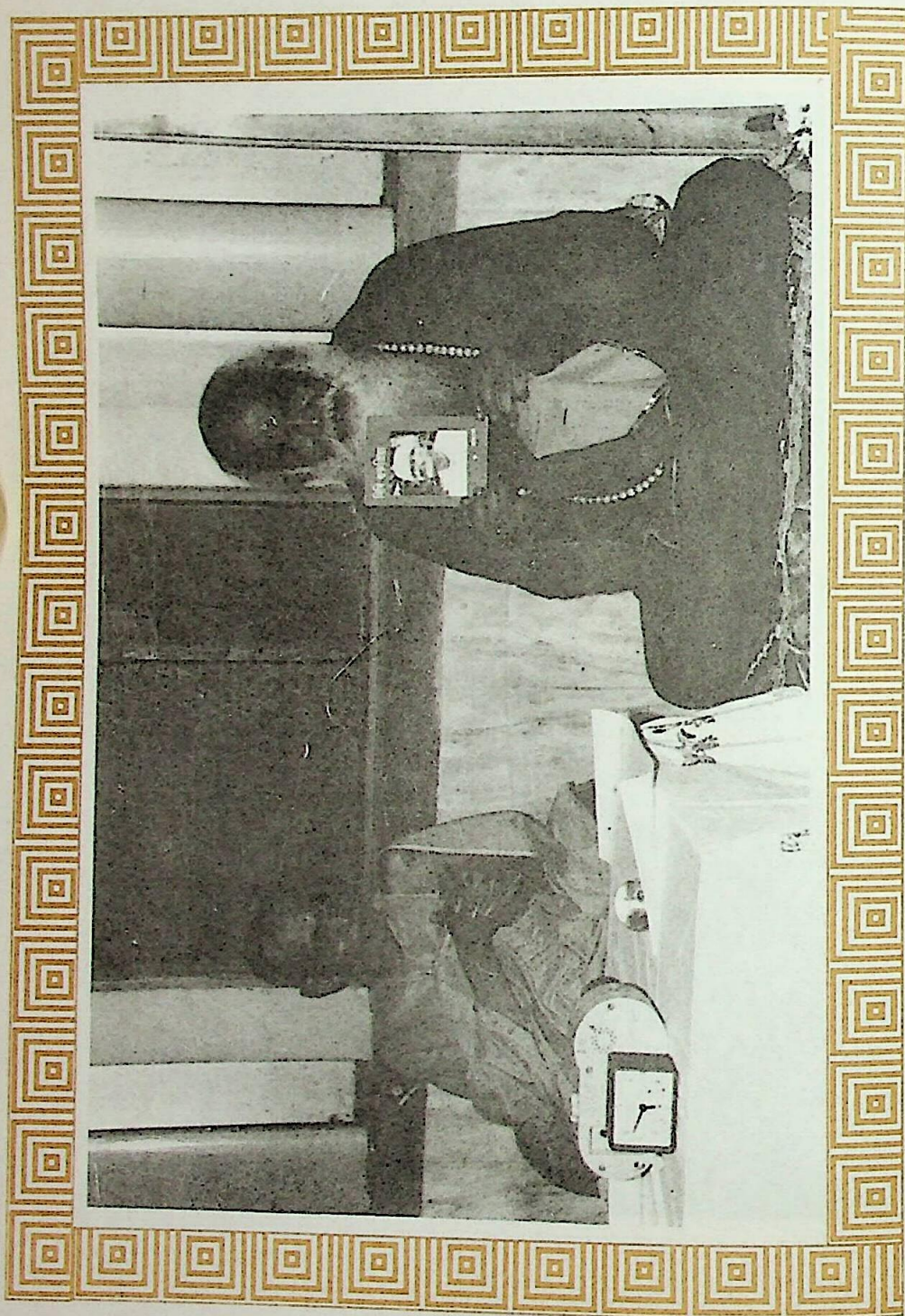
A view of the sadhu bhandara on the occasion of
Didi Gurupriya's birth centenary celebration - 19th February, 99



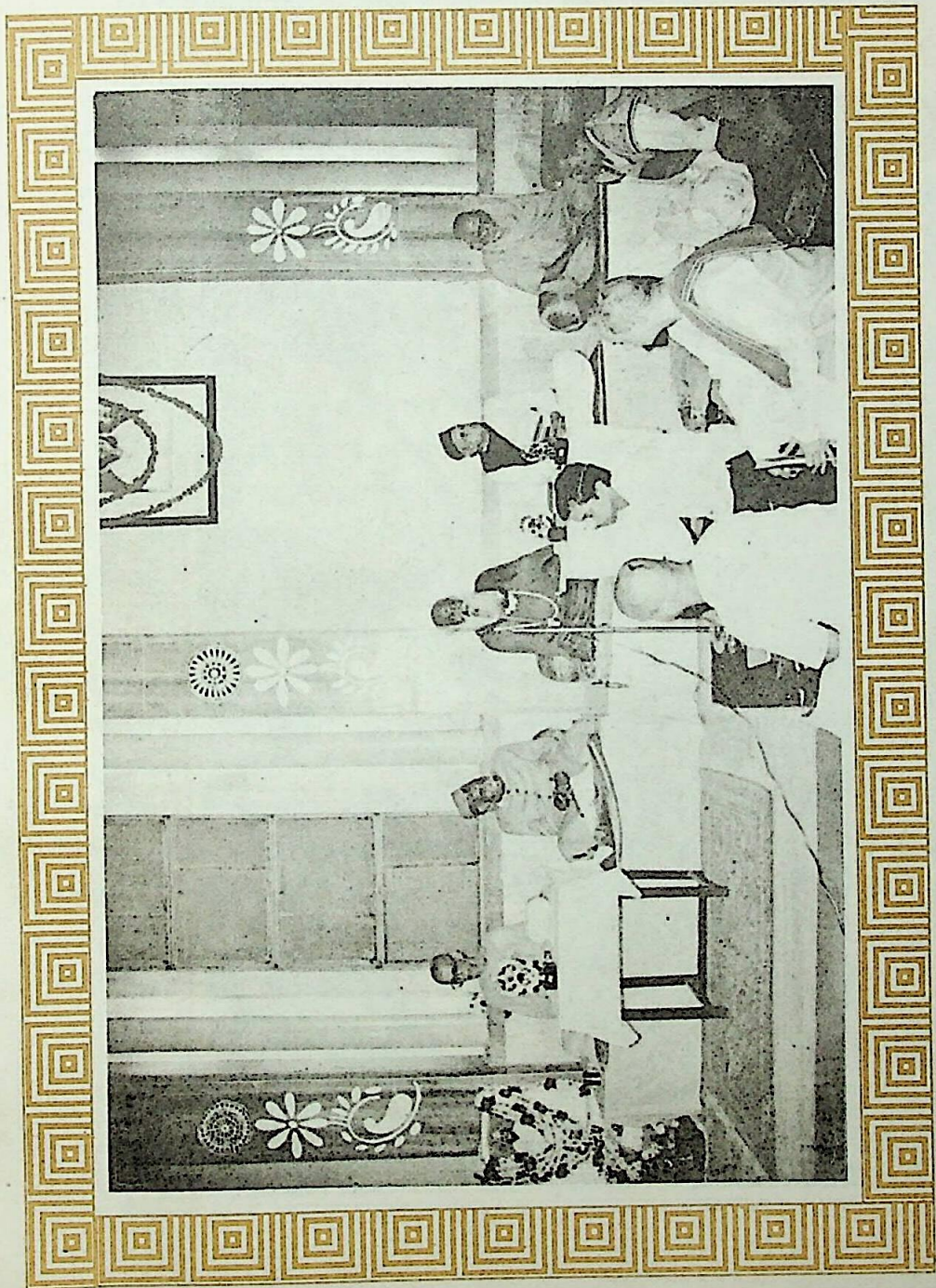
Kumari bhojan on the same occasion - 20th February, 99



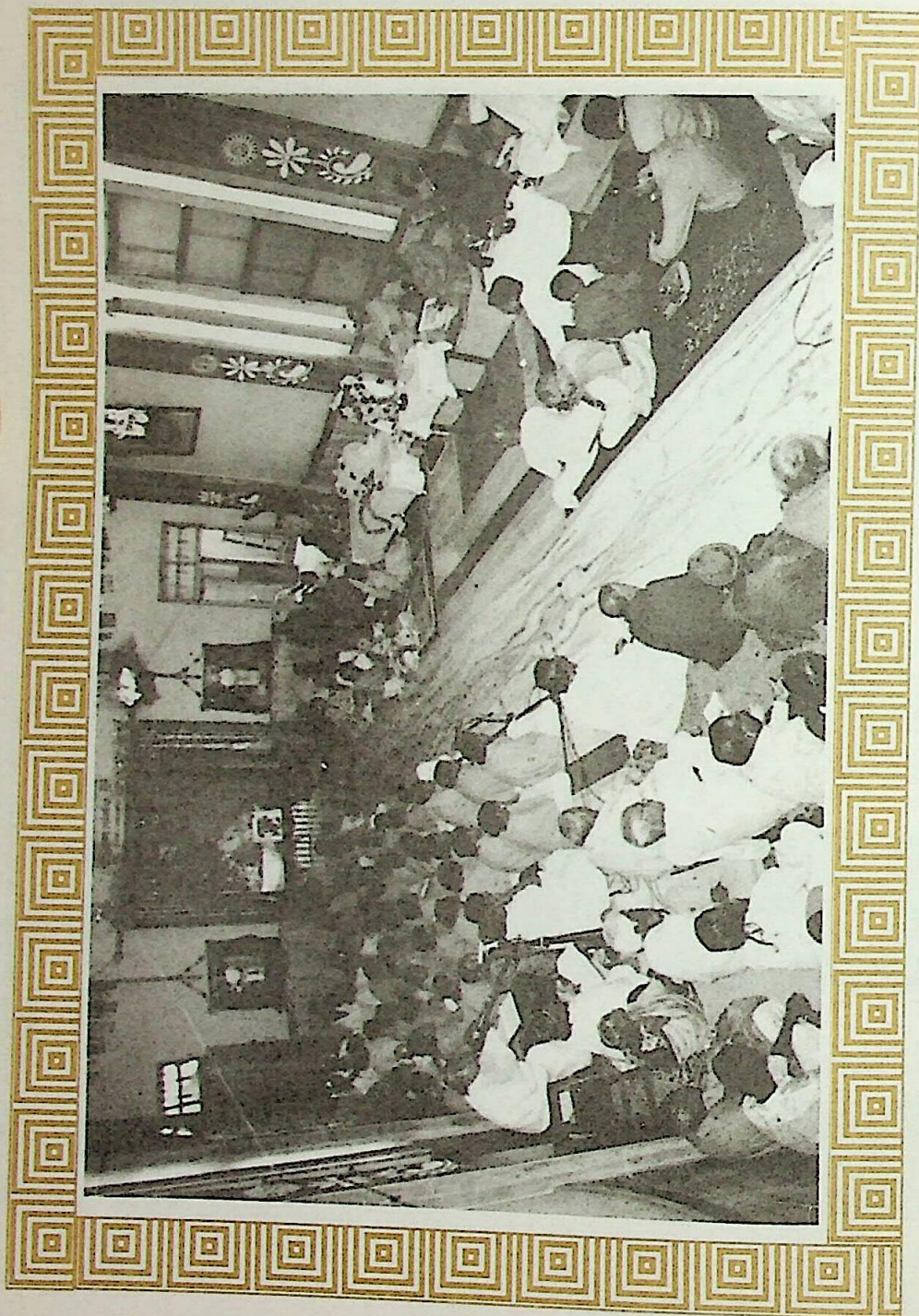
The pictorial biography of Didi Gurupriya being released by
Pujiya Swami Chidanandaji Maharaj -19th February, 99



A book on Didi Gurupriya being released by
M.M. Swami Devanandaji Saraswati -20th February, 99



A scene from the inaugural centenary function on 19th February, 1999 in the Ananda Jyoti Mandir.
M.M. Swami Devananda Saraswati addressing the audience with Pujya Swami Chidanandaji and Maharaja Benares on his right
and Dr. Mandan Mishra, V.C., Sampurnananda University and Swami Bhaskaranandaji on the left.



A view of the inaugural function in the Ananda Jyoti Mandir -19th February, 1999.

এর পর কন্যাপীঠের বার্ষিক পত্রিকা ‘আদরিণীর’ বিশেষাঙ্কের স্বামীজী বিমোচন করেন। কন্যাপীঠের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রস্তুতির পর মেয়েদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এদিন মুখ্য অতিথি ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কাশী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন কুলপতি পদ্মভূষণ ডাঃ বিদ্যানিবাস মিশ্রজী। তাঁর ভাষণের পর খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী বেটিনা বমার হিন্দী ভাষায় দিদির সম্বন্ধে চমৎকার বলেন।

সভাপতির পদ হতে স্বামী চিদানন্দজীর ভাষণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও মাতৃনাম কীর্তনের দ্বারা অনুষ্ঠানের সমাপন হল। এরই সঙ্গে নব দিবস ব্যাপী অনুষ্ঠিত গুরুপ্রিয়াদিদি শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী মহোৎসবের সমাপন হল।

গুরুপ্রিয়া দিদি মাতৃ অমরগাথার অমর রচয়িত্রী। তাই দেশ বিদেশের সকল মাতৃ ভক্তরাই তাঁর কাছে শ্রী। এই উৎসবে দেশ ও বিদেশের অনেক মাতৃ ভক্তরাই স্বক্রিয় সহযোগ প্রদান করে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেছেন। ফ্রান্স হতেও কয়েকজন বিশিষ্ট মাতৃভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। আমরা সকল মাতৃভক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে মা ও দিদির চরণে এই প্রার্থনাই জানাই, তাঁদের উপর শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাবারি বর্ষিত হোক সতত।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রী জগদীশ্বর পাল এই উৎসবে যোগদান করে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, “বিংশ শতাব্দী মহাজনদের আগমন উপলক্ষ্যে জন্মশতাব্দী হিসাবে স্বর্ণাঙ্করে লিখিত থাকবে ইতিহাসে। ১৯৩৬ সালে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। ৫০ এর দশকে শ্রী মা সারদার শতবার্ষিকী, ৬০ এর দশকে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী, ৭০ এর দশকে শ্রী অরবিন্দের, ৮০ র দশকে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের, আর ৯০ এর দশকে আমরা উদ্‌যাপন করেছি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী এবং তাঁর লীলাসহচরী ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়াদিদির। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম লীলা সহচর ছিলেন বিবেকানন্দ। আর শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের লীলা সহচরী গুরুপ্রিয়াদিদি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ আর শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের তথা বিভিন্ন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তথা রূপকার গুরুপ্রিয়া দিদি। গুরু প্রিয়াদিদিকে জানতাম স্নেহময়ী দিদি আদরিণী দিদি হিসেবে। দিদির জন্মশতবার্ষিকী তথা কন্যাপীঠের হীরক জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত না থাকলে আনন্দময়ী সংঘের বিরাট যজ্ঞহোত্রী তথা রূপকারের চিত্র অজানা থেকে যেত।”

শ্রদ্ধেয় চিদানন্দ স্বামীজী এই উৎসব কি ভাবে অনুষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে একটি প্রারূপ রচনা করে ও নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাদের উদ্ধুদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

উৎসবের আদি হতে অন্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের অমোঘ খেয়াল অপার করুণা অনুভূত হয়েছে। মায়ের খেয়ালেই উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। উৎসবের রূপ হয়ে উঠেছে সর্বোৎসাহ

সুন্দর। শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা-কল্লতরু শ্রীচরণে ভক্তি নম্রচিহ্নেপ্রণাম নিবেদন করছি।

যে পুণ্যময় পূর্ণ সমর্পিত অহংভাববর্জিত মহাজনের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল, তাঁর চরণে এই প্রার্থনা জানাই, আমাদেরও জীবন যেন মায়ের চরণে পূর্ণ সমর্পিত হয়, অহংভাবের লেশও যেন আমাদের মধ্যে না দেখা দেয়। মায়ের বাণী কুসুমকলি যেন আমাদের জীবন উপবনে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

গুরুপ্রিয়া ওগো মাতৃপ্রিয়া শতবরষের লহ গো প্রণাম।

উৎসব সমাপনে মেয়েদের কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল এই অমর গীতি —

নমো নমো গুরুপ্রিয়া, ওগো তুমি মাতৃপ্রিয়া,
আমরা তোমার, তুমি আমাদের, তোমার তরে মোদের হিয়া।
আজি তোমার শতেক বরষে বাজুক শঙ্খ হরষে হরষে।
লহ গো প্রণাম, লহ গো প্রণাম, লহ গো প্রণাম, বরষে বরষে।

“শ্রী মায়ের শুভ জন্মদিন আসছে” —

— সঞ্জিতা সেনগুপ্ত

শ্রীমায়ের শুভ জন্মদিন আসছে,
শীত, বসন্ত, দুই ভাই চলে যাচ্ছে।
আমপাতা, নিমপাতা, বেলপাতা ঝড়ে গেছে,
সুন্দর নতুন কচিপাতা হয়েছে গাছে।
পাতা নানা রং এর মিষ্টি সবুজ,
দেখে মন হয়ে যায় অবুঝ,
কিছুক্ষণের মধ্যে কাল বৈশাখী আসবে,
তারপর কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ উঠবে।
মা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখবে আম গাছ,
মায়ের আশ্রমগুলোতে হবে নতুন নতুন সাজ।
স্বামিজীদের চিন্তা, মায়ের জন্মদিনে ভক্তদের কি খাওয়াবে,
দিদিদের চিন্তা, কেমন করে ফুল দিয়ে সমাধি সাজাবে।
আমি কিন্তু কোন চিন্তা করবনা, মায়ের কথা ভাববো —
খাবো, দাবো, হাসবো, ঘুড়ে বেড়াবো, আর —
সবাইকে ভালবাসবো।

আশ্রম-সংবাদ

১. আগরপাড়া —

গঙ্গাতীরে সুরম্য পরিবেশে অবস্থিত কলকাতা-স্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আগরপাড়া আশ্রমে এই বৎসরও শারদীয়া উৎসব সকল মহানিষ্ঠার সহিত এবং ধুমধামের সহিত পালিত হয়। শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রী কালীপূজা এবং অন্তকূট উৎসব সমূহে প্রায় পাঁচ হাজার মাতৃভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐ সকলদিনে দুবেলা বিশেষ সংসঙ্গ এবং ভক্তি গীতির অনুষ্ঠান পালিত হয়।

গত ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী আগরপাড়া আশ্রমের বাৎসরিক নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান পালিত হয়। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিবাসের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ। শ্রীশ্রী মায়ের আগরপাড়া আশ্রমে যে সব মহিলা নিত্য বৈকালিক সংসঙ্গ করেন, তাঁরা এবং অন্যান্য মাতৃভক্ত মহিলারা সারারাত্রি নাম রক্ষা করেন। পরদিন সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কয়েক শত মাতৃভক্ত নামে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রতিদিন এখানে বিকালে মাতৃভক্ত মহিলারা সংসঙ্গ করেন। এ ছাড়া প্রতি মাসের দ্বিতীয় রবিবারে অখণ্ডনাম এবং বিকালে ধ্যানপীঠে বিশেষ সংসঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। প্রতি রবিবার শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশ মত অখণ্ড জপ হয়।

বন্যাপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে আগরপাড়া আশ্রমের পক্ষ হতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সভাপতির হাতে ২০,০০০/- টাকার চেক, প্রায় ৭০টি শাড়ী এবং এক কুইন্টল চাল, ডাল তুলে দেন আশ্রমের সভাপতি শ্রী অনিল রঞ্জন দেওয়ানজী। অনুষ্ঠানে আগরপাড়া আশ্রমের কার্যকারী কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

মাঘী সংক্রান্তির পূণ্য পর্বে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পরমাদরগীয়া শ্রী গুরুপ্রিয়াদেবীর জন্মশতাব্দী মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা ও ভোগ, আরতি, কুমারী পূজা ও ভোজন, সাধুভোজন, ভাণ্ডারা, বিশেষ সংসঙ্গ এবং সংকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মহা শিবরাত্রি ব্রত প্রতি বছরের মত অনুষ্ঠিত হয়।

২. দেৱাদুন —

দেৱাদুনে কিশনপুর আশ্রমে গত ২২শে জানুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীর পূণ্যতিথিতে শ্রীশ্রী সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভোগের পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী কিশনপুর আশ্রমে সাড়ম্বরে গুরুপ্রিয়াদেবীর শতবার্ষিকী পালিত হয়।

৩. তারাপীঠ —

বীরভূম জেলার মহা পূণ্যভূমি তারাপীঠে মায়ের আশ্রমে অনাবিল এক আনন্দধারায় পূর্ণব্রহ্ম

শ্রীশ্রী মায়ের মাঘী পূর্ণিমা উৎসব মহা সমারোহে (গত ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৯) প্রায় সাড়ে পাঁচশো ভক্তের মহামিলনে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্বামী নির্মলানন্দজীর উপস্থিতি এবং দুই দিবস ব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবচন। তৎসহ গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্প্রদায় কর্তৃক দুই দিবস ব্যাপী নাম কীর্তন, ধর্মীয় ভক্তিমূলক গান সুললিত আকর্ষণীয় মনোমুগ্ধকারী কণ্ঠে সমগ্র মাঘী পূর্ণিমা উৎসব ঈশ্বরীয় প্রেমের এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। ৩১শে জানুয়ারী ভাবগন্তীর পরিবেশে মহারুদ্র যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী এই দুই দিবস ব্যাপী মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী সোমবার সাধুভাণ্ডারা হয়। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এবং সাধুগণের মুক্তকণ্ঠে জয়গুরু জয় মা ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ঘটে মহামিলনের উৎসবের পরিসমাপ্তি।

৪. পুণা—

শ্রীশ্রী মায়ের অশেষ কৃপায় পুণা আশ্রমে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী মহা শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষ্যে মহারুদ্র পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে শুক্রবার ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ছয়টি লঘু রুদ্র পূজা, ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্রের জপ, পূজা, আরতি এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শনিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে পাঁচটি লঘুরুদ্র পূজা, ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্রের জপ, পূজা, আরতি এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রবিবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে শ্রীগণপতি পূজা, নবগ্রহদেবতার পূজা, রুদ্র হোম, পূর্ণাহুতি, আরতি এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা মার্চ দোল উৎসব উপলক্ষ্যে উদয়াস্ত নাম কীর্তন হয়। প্রাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৫. দিল্লী—

দিল্লীর কালকাজী স্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে শ্রীগুরুপ্রিয়াদেবীর জন্মশতাব্দী মহোৎসব গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাতে মাতৃ পূজা, ভজন, কীর্তন সম্পন্ন হয়। বৃন্দাবন আশ্রমের ব্রহ্মচারী স্বরূপজী শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগুরুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে মাতৃ ভক্তরা ভাষণ দেন। তুলসী রামায়ণের সুললিত কণ্ঠে গান করেন শ্রীমতী নন্দিনী ভট্টাচার্য্য। ভোগের পর ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উদয়াস্ত নাম কীর্তন হয়।

গত ১লা ও ২রা মার্চ দোলপূর্ণিমার পুণ্য পর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে অখণ্ড নাম যজ্ঞ সম্পাদিত হয়।

দিল্লী আশ্রমে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং অস্তিম্য শনিবারে বিকালে ৪:০০ টা হতে ৬:০০টা পর্যন্ত হনুমান চালিশা পাঠ হয়।

৬. বৃন্দাবন —

বৃন্দাবন আশ্রমে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রী গুরুপ্রিয়াদেবীর জন্মশতাব্দী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, কুমারী পূজা, ভজন, কীর্তন, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত পাঠ, ভোগ এবং শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর সম্বন্ধে ভাষণ হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষ্যে চতুঃপ্রহর শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের বিশেষ পূজা ও অন্যান্য ভক্তদের ও সমবেত ভাবে ব্যক্তিগত পূজা করার ব্যবস্থা করা হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী হতে ১লা মার্চ পর্যন্ত প্রখ্যাত রাস পার্টি দ্বারা রাসলীলা সম্পন্ন হয়। ২রা মার্চ দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে উদয়াস্ত অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি পূজা এবং সাধুসেবা সম্পন্ন হয়।

শ্রীশ্রী মায়ের অশেষ কৃপায় রাসরসেশ্বরের ভূমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে মায়ের আশ্রমে ২৪শে মার্চ হতে ১লা এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ আয়োজিত হয়েছে। বৃন্দাবনের আচার্য্য শ্রী ১০৮ স্বামী শ্রীরাধাব্রজেশ শরণ দেবজী মহারাজ ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করেন।

৭. কনখল —

কনখলে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ২২শে জানুয়ারী মহাসমারোহে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রী গুরুপ্রিয়াদেবীর জন্মশত বার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।

৮. বারাণসী —

মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে গত ২২শে জানুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১শে জানুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য পর্বে আশ্রমে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শ্রদ্ধেয়া শ্রীগুরুপ্রিয়া দিদির জন্মশত বার্ষিকী মহোৎসব ও কন্যাপীঠের হীরক জয়ন্তী মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের বিশদ বিবরণ পত্রিকাতে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

২রা মার্চ দোল উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী গোপালের স্নান, অভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, ভজন, কীর্তন, ভোগ, আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৩শে মার্চ হতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে নানা স্থান হতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল।

আগামী ৩রা ও ৪ঠা মে শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

শোক-সংবাদ

১. শ্রীমতী লক্ষ্মী মাধব —

শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী লক্ষ্মী মাধব গত ১২ই জুন, ১৯৯৮ সন্ধ্যানে মাতুলোক প্রয়াণ করেছেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী মাধব এবং তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত পী.পী. মাধবজী ১৯৭০ সনে পুণা আশ্রমে দিদিমার কাছে দীক্ষালাভ করেন। তাঁরা উভয়েই প্রতিবছর মার জন্মোৎসবে কনখলে আসতেন। জন্মোৎসবের পর গুরুপূর্ণিমা, দুর্গাপূজা এবং সংযম সপ্তাহ করে বাড়ী ফিরতেন। এই কয় মাস তাঁরা কনখলে আশ্রমবাস করতেন। গত বছরও তাঁরা মার জন্মোৎসবের পর গুরুপূর্ণিমা পর্যন্ত আশ্রমবাস করবেন সংকল্প করেছিলেন। ১২ই জুন সকালে শ্রীমতী লক্ষ্মী শ্রীশ্রী মায়ের সমাধি মন্দিরে আরতি দর্শন করেন এবং শ্রীশ্রী মাকে ফুল বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি অর্পণ করেন। বিকালে তাঁর হাটের ব্যাথা ওঠে। তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মাতৃচরণে চিরতরে আশ্রয় লাভ করেন। প্রয়াণের পূর্বে তিনি ‘মা মা মা’ তিনবার মাতৃনাম উচ্চারণ করেন।

আমরা মাতৃচরণে প্রয়াত শ্রীমতী লক্ষ্মীজীর আত্মার উদ্ধরণ ও তাঁর পরিবার বর্গের জন্য সাধুনা কামনা করি।

২. শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় —

গত ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সোমবার শেষ রাত্রিতে শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধ্যানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁর স্বামী ছিলেন শ্রী ডাঃ কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী অমিয়া দেবী শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি অতিশয় ভক্তি সম্পন্না মহিলা ছিলেন। মাতৃচরণে তাঁর আত্মার চির শান্তি ও পরিবার বর্গের সাধুনা কামনা করি।

৩. শ্রীমতী শান্তি ঘোষ —

গত ৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ১.২০ মিনিটে অমৃতযোগে কলিকাতাবাসী প্রাচীন ভক্ত শ্রীমাখনলাল ঘোষের পত্নী শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সন্ধ্যানে সাধনোচিত ধামে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে বিলীন হয়েছেন।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি ও পরিবারজনের সাধুনার জন্য মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই।

৪. শ্রী বি.বি. রায়চৌধুরী —

ধানবাদবাসী শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী বি.বি. রায়চৌধুরী গত ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৯ এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করে চির অমৃতের পথে প্রয়াণ করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

৫. শ্রীমতী নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় —

শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় অধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ই জানুয়ারী গীতা পাঠরতা অবস্থায় সজ্জানে ৭১ বৎসর বয়সে মাতুলোকে গমন করেছেন। তাঁর অমর আত্মা মহানির্ব্বাণ লাভ করুক শ্রীশ্রী মায়ের চরণে এই প্রার্থনাসহ তাঁর পরিবার বর্গের শান্তি কামনা করি।

৬. শ্রী হরিহর চক্রবর্তী —

বারাণসী আশ্রম স্থিত আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে শ্রীশ্রী মা ও শ্রীশ্রী গোপালের পূজক হরিহরদা গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমায়ের কোলে চির শান্তি লাভ করেছেন। হরিহরদা আজ প্রায় ১৪ বছর ধরে একনিষ্ঠ ভাবে শ্রীশ্রী মায়ের ও শ্রীশ্রী গোপালের পূজা করে আসছেন। গায়ত্রী যজ্ঞশালায় প্রতিদিন হোম ও অগ্নিরক্ষার কাজও তিনি অতি শ্রদ্ধা সহকারে দায়িত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর ধ্যান, জপ, আরাধনা যা কিছু সব ঐ মায়ের পূজা ও গোপালের পূজা যথা সময়ে সম্পন্ন করা ছিল। সময়ানুবর্তিতা তাঁর আদর্শ ছিল।

কিছুদিন ধরেই তিনি গলায় খুব ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করছিলেন। পরে ডাক্তার পরীক্ষা করে দুরারোগ্য ক্যান্সার বলেন। হরিহরদা মায়ের হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন। উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত শ্রদ্ধেয় চিদানন্দ স্বামীজী ও শ্রদ্ধেয় দেবানন্দ স্বামীজী হাসপাতালে গিয়ে হরিহরদাকে স্পর্শ করেন ও প্রায় ঘাঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই হরিহরদাকে দিয়ে শ্রদ্ধেয় চিদানন্দ স্বামীজী অনেক মন্ত্র পাঠ করালেন। মায়ের কৃপায় হরিহরদাকে বেশী কষ্ট পেতে হয়নি। স্বামীজীদের গমনের একদিন পরেই করুণাময়ী মা তাঁর এই প্রিয় সেবকটিকে তাঁর অভয় কোলে চিরতরে আশ্রয় দিলেন।

আমরা শ্রীশ্রী মায়ের চরণে হরিহরদার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

৭. ডা० প্রফুল্ল চন্দ্র দত্ত —

চন্দন নগর নিবাসী শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত প্রফেসার প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত গত ১০ই মার্চ ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চির আশ্রয় লাভ করেছেন। প্রফেসার প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বোটানিতে ডি.এস.সি উপাধি লাভ করেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। বহু বছর তিনি ‘আনন্দ বার্তার’ সম্পাদনা করেছেন।

আমরা তাঁর প্রয়াণে মমাহত। মায়ের চরণে তাঁর আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি এবং তাঁর পরিবারজনের সাধুনা কামনা করি।



**STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT
NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE - AMRIT VARTA"
AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF
THE PRESS AND REGISTRATION ACT.**

Title of Newspaper : MA ANANDAMAYEE - AMRIT VARTA

Place of Publication : SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE SANGHA,
BHADAINI, VARANASI-1

Periodicity of Publication : QUARTERLY

Printer's Name : PANU BRAHMACHARI

Whether citizen of India : YES

Address : SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM,
BHADAINI, VARANASI-1

Publisher's Name : PANU BRAHMACHARI

Whether citizen of India : YES

Address : SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM,
BHADAINI, VARANASI-1

Editor : PANU BRAHMACHARI

Whether citizen of India : YES

Address : SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM,
BHADAINI, VARANASI-1

I, Panu Brahmachari hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

March, 1, 1999

Panu Brahmachari
Publisher.

With best compliments from :

“যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে। তাহলেই
কর্মের আসবে পূর্ণতা।”

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES.

Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD.

25, SWALLOW LANE,
CALCUTTA - 700001

FACTORY AT: DUM DUM & BARODA.

BARODA CITY OFFICE-

D. WREN INTERNATIONAL LIMITED,
ALKAPURI, BARODA - 390007

With best compliments from:

“সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কৰ্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কৰ্ম করবে তাহাই
সত্য এবং খাঁটি হবে।”

— শ্রী শ্রী মা

A.R. Dewanjee & Co.

**MANUFACTURERS OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD
EXPORTERS & IMPORTERS
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA - 700001**

**Phone : 220-9739
Offi. : 220-4746
Fax : 220-8472
Factory : 477-9239
Resi. : 473-3157**

শুভ কামনা সহিত :

“যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে নেবে পূর্ণাঙ্গীণ রূপে
চেষ্টা করা দরকার।”

— শ্রী শ্রী মা

দি এশিয়াটিক অক্সিজেন এণ্ড অ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড

৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব)

কলিকাতা - ৭০০০০১

ফোন : ২২০৪২৪৭/২২০৪২৫৯/২২০৪৪৮৭

With best compliments from :

“শুভমতি দিয়ে কর্ম করে কর্মের ভিতর দিয়েই
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা।”

— শ্রী শ্রী মা

ORISSA AIR PRODUCTS LTD.

Head Office : 8, B.B.D. Bag East
CALCUTTA - 700001

Regd Office : Gundichapada
Dhenkane : 759013

Phones : 220-4247/2204-259

At the Lotus feet of Ma



Kalipada Dutta

35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta—700 005

With best compliments from:

“প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।”

— শ্রী শ্রী মা

SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY

87/5, Block E, New Alipore

Calcutta-700053

Phone : 478-3545

“মা আছেন কিসের চিন্তা?”

With best Compliments from:

Amrita Bastralaya

157-C Rashbehari Avenue

Ballygunje, Calcutta-700029

Phone : 464-2217

*Suppliers of Quality Sarees,
Woollen and Readymade Garments
and School Uniforms.*

*** WE HAVE NO OTHER BRANCH**

“হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।

আমি তোমার, তুমি আমার।

আমি তোমার, তুমি আমার।

আমি তোমার, তুমি আমার॥”

— শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

- শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত ক্যাসেট “আনন্দ সংগীত” নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ :

- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
- মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

With Best Compliments from

"Try to grasp the significance of 'all is His', and you will immediately feel free from all burdens."

—Ma Anandamayee



RISHI GASES (P) LTD

Head Office : 8, B. B. D. Bag East

CALCUTTA-700001

Phones : 220-4247 / 4259

Factory : Industrial Estate

P.o. Tifra

Bilaspur-495223 (M.P.)

Phones : 4233, 4675

With best compliments from :

Khadim's



Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD. 29A, Rabindra Sarani, Calutta - 700 073

Phone : 27-8220, 27-0806, 27-5226, 26-4639, 26-6063, 26-2318

Fax : 033-215-3387

* Branch Ashrams *

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 327835)
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P.
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 310054+311794)
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel: 05442-64343)
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97



Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বাঁতা



SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

● Branch Ashrams ●

- 1. AGARPARA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhati, Calcutta-700 058 (Tel : 553 1208)
- 2. AGARTALA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799 001, West Tripura
- 3. ALMORA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263 602, U.P.(Tel : 23313)
- 4. ALMORA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263 881, U.P.
- 5. BHIMPURA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391 105,(Tel 33208)
- 6. BHOPAL** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram
P.O. Bairagarh, Bhopal-462 030 M.P. (Tel : 521 227)
- 7. DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248 009
U.P. (Phone : 684 271)
- 8. DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road
P.O. Rajpur, Dehradun-248 009, U.P.
- 9. DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248 010
- 10. DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
- 11. JAMSHEDPUR** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831 005, Bihar
- 12. KANKHAL** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal, Hardwar-249 408, U.P.(Tel : 416 575)
- 13. KEDARNATH** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246 445, U.P.
- 14. NAIMISHARANYA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261 402, U.P.

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবানী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ — ৩

জুলাই, ১৯৯৯

সংখ্যা — ৩

*

সম্পাদক মণ্ডল

- ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
- ডঃ শুকদেব সিংহ
- কুমারী চিত্রা ঘোষ
- কুমারী গীতা ব্যানার্জী
- ব্রহ্মচারিণী গুণীতা

কার্যকারী সম্পাদক

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

*

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা

বিদেশে — ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

- * ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতি ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয়।
- * প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলাবিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।
- * প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যিক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।
- * অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা "Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/c " এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।
- * পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে -
 Managing Editor,
 Ma Anandamayee - Amrit Varta
 Mata Anandamayee Ashram
 Bhadaini, Varanasi - 221 001

*

*

*

*

*

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম :-

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- - বাৎসরিক।

অর্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- " "।

১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- " "।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২, কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক - শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচী পত্র

১. মাতৃ-বাণী	...	সংকলন চিত্রা ঘোষ	১
২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	...	শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	৩
৩. মৃত্যুর মৃত্যু চাই	...	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৯
৪. তাত্ত্বিক দর্শনের পূর্ণতা	...	ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়	১৪
৫. মাতৃ স্বরূপামৃত	...	শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	১৯
৬. আনন্দ (কবিতা)	...	ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী	২২
৭. ভাইজীর বাণীর মনন	...	শ্রী জয় মুখার্জী	২৩
৮. যতো মানুষ তত পথ	...	শ্রী জগদীশ্বর পাল	২৭
৯. শেষ প্রণাম	...	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	২৯
১০. আমার মা আনন্দময়ী	...	'বিগুদ্রা'	৩৪
১১. শ্রীশ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য যাত্রা	...	শ্রী শিবানন্দ	৩৭
১২. আশ্রম সংবাদ	...		৪০
১৩. শোক সংবাদ	...		৪৩



নূতন প্রকাশন

দিদি গুরুপ্রিয়া — শ্রদ্ধার্থ্য

পরমশ্রদ্ধেয়া দিদি গুরুপ্রিয়ার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি অপূর্ব গ্রন্থ। শ্রী শ্রী মায়ের লীলাসঙ্গিনী, "শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী" গ্রন্থের প্রণয়িত্রী এবং শ্রী শ্রী মায়ের বহু প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকর্ত্রী দিদি গুরুপ্রিয়ার সম্পূর্ণ জীবনী বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। এই দৃষ্টিতে এই পুস্তকটি মাতৃভক্তদের নিকট একটি অমূল্য সম্পদ। এই পুস্তকে দিদি গুরুপ্রিয়ার বিশেষ গুণমুগ্ধ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক লেখিকারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

— মূল্য ২৫ টাকা।

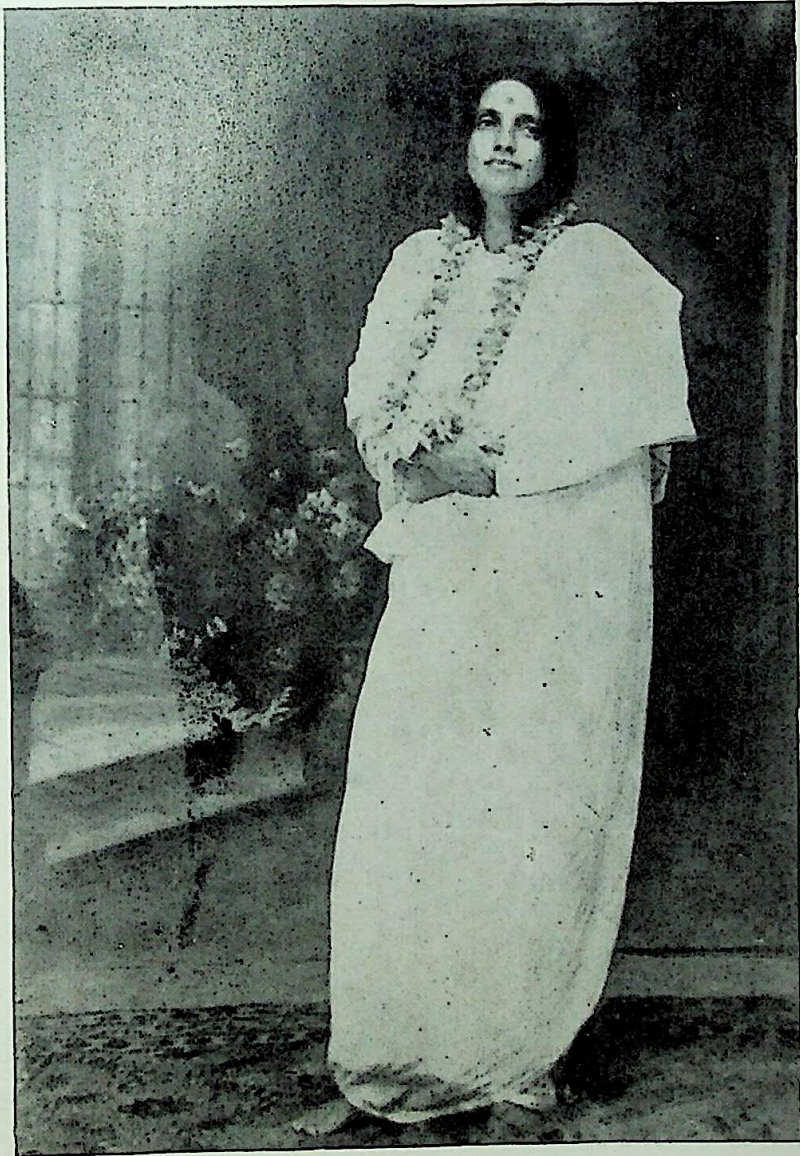
ব্রহ্মচারিনী গুরুপ্রিয়া— সচিত্র জীবনী

দিদি গুরুপ্রিয়ার একটি অতুলনীয় সচিত্র জীবনী গ্রন্থ। অর্টি পেপারে ১৩৪ টি দুর্মূল্য চিত্র সম্বলিত এবং প্রবুদ্ধ সাহিত্যিক হিন্দী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য প্রকাশন। মাতৃভক্তদের বিশেষ মূল্যে পরিবেশিত করা হচ্ছে।

— মূল্য ১০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ,

ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১



মাতৃ - বাণী

সংকলন - চিত্রা ঘোষ

যাহা হ'তে শ্বাস বিগত হয়েছে, অর্থাৎ সংশয় চলে গিয়ে প্রাণে দৃঢ়তার ভাব জাগ্রত হয়েছে, তাহাই বিশ্বাস।

*

* যিনি মহত্বাদি সর্বগুণালঙ্কৃত, পূর্ণ ও পবিত্র, তিনিই আদর্শ, এই হিসাবে আদর্শ একমাত্র পরমেশ্বর।

*

* সকলেই শান্তি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু একথা খুব কম লোকেই ভাবে যে "তিনি" হৃদয়ে না জাগলে পূর্ণশান্তি কিছুতেই পাওয়া যায় না।

*

* যারা ভগবৎ-চরণের আশ্রয়ে সংসার করে তাদের জীবন শত শত অভাব অভিযোগের ভিতরও শান্তিপূর্ণ হয়। জগৎ যখন নিত্য গতিশীল সব সুখ দুঃখ নিত্য ক্রিয়ার মত মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

*

* "ধর্ম মানি" কেবল এ কথাতে কোন লাভ নেই। ভাবে ও কাজে ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। ব্রত, উপবাস, জাগরণ বা তদুপ ক্লেশকর সাধনের দ্বারা কর্মের উপর ভর করে চলি, অথচ ভাবের অভাব, তাতে শুধু কর্ম-সংস্কারই পুরণ করা হয়। ভিতরে নিজেকে ভাল করে দেখ, সেখানে যে খুঁত দেখতে পাস, সেগুলি সরাবার চেষ্টা কর, এরূপে যে স্তরে আছিস, তদুপযোগী কাজ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'। তা' হ'লে সময়ে কর্ম ও ভাব সংযুক্ত হ'লে প্রকৃত ধর্মলাভে সমর্থ হবি।

*

* যখন আমিত্ব লোপ হয়ে যাবে, তখন জগতের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকবে।

*

* প্রঃ- গুরুকে আমরা যতটা ভালবাসি, গুরুর তাহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসা উচিত নয় কি ?

মা - "যিনি তোমাকে পরমার্থ কল্যাণের দিকে যাত্রা করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান সেটাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা।"

*

* প্রঃ- অনেকেই বলেন যে শীঘ্রই জগতের আমূল পরিবর্তন হবে। সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

মা - "এ জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ শরীর কিছু বলে না। তবে এ শরীরের কথা এই যে কালের মধ্যে থেকে যে বলা, তা অনেক সময়ই মেলে না। কালের অতীত না হলে পরে যা কিছু বাধা আসতে পারে, তা দেখবার

ক্ষমতা থাকে না, তাই হয়ত হল না।"

* * *

তুমি জগতের এই রকম শিশু হইতে চাও কেন ? এমন শিশু হও যাহাতে আর বদলাইবে না। শিশুত্ব বদলাইবার কারণই হইল যে বাসনা। সংসঙ্গ ও গুরুর আদেশ পালন ইহাতেই আপনা হইতে সেই পরম শিশু-ভাব ফুটিয়া উঠিবে।

* * *

দেখ একটা গাছ যখন ছোট থাকে, কত ভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হয়, পরে সেই গাছ যখন বড় হইয়া যায়, তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। তখন তাহার নীচে যদি ছোট গাছ থাকে ঐ বড়গাছটিই ছোট গাছটিকে রক্ষা করে। যেমন ঝড়-ঝাপটা যাহাই আসুক বড় গাছটির উপর দিয়াই সব যায়, ছোট গাছটির উপরে আর কোন ধাক্কা লাগে না।

এই রকম ধৈর্য্য ধরিয়া সব সহ্য করিবে, আর যতই সহ্য করিবে ততই শক্তি বৃদ্ধি হইবে। শক্তি বৃদ্ধি হইলে নিজের ত উপকার হয়-ই, অপরকে ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়।

* * *

জগতে সকলে এক পরম পিতারই সৃষ্ট বলে কাহারো সহিত কেহ ভিন্ন নয়। যেকোন এক পরিবারে বহু ছেলে মেয়ে হ'লে জীবনযাত্রা নির্বাহের সুবিধার জন্য দশ রকম ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন ক'রে দশ খানি বাড়ী ক'রে তারা বসবাস করে, তেমনি মূলে সকলে এক হ'লেও কৰ্ম্মশৃঙ্খলার বশবর্তী হ'য়ে বহুভাবে বহুরূপে দলবদ্ধ হ'য়ে সবাই রয়েছে মাত্র।

* * *

এক লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া, বাধা বিঘ্নে নিরাশ না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিয়া যাও। শুধু ব্যবসাদারের মত পুনঃ পুনঃ হিসাব না লাগাইয়া নিজের কর্তব্য-কর্ম করিয়া যাও, তবেই প্রকৃত শান্তির আশা।

*

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

১৪ই ফাল্গুন, বুধবার (ইং ২৭।২।৫২) আজ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মাকে এখানকার মিশন হইতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তদনুসারে মা বেলা ১০।।টার সময় মিশনে গেলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে দোতলার এক ঘরে ভিন্ন ভিন্ন আসনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, সারদাদেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ফটো ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মাসীরা এখানে পূজা করিতেছেন। বারান্দায় যজ্ঞের আয়োজনও হইতেছিল। শ্রী শ্রী মা প্রায় এক ঘন্টা এখানে ছিলেন। এখান হইতে আসিবার সময় মা পূর্বোক্ত ফটো স্পর্শ করিয়া আসিলেন। কেহ যে মাকে উহা স্পর্শ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা নয়, কিন্তু দেখিলাম যে মা নিজ হইতেই হাসিতে হাসিতে গিয়া উহা স্পর্শ করিলেন। সাধুরা আমাদিগকে প্রসাদী ফল দিলেন।

বিকালবেলা মাকে করণপুরের কোন এক বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। মা আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। সেখানেও কীর্তনাদি হইল এবং মাকে ভোগ দেওয়া হইল। যখন আশ্রমে ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা।

সন্ধ্যাকীর্তনে একটি ৫।৬ বৎসরের নেপালী বালক উপস্থিত ছিল। সে তাহার মায়ের সঙ্গেই এখানে আসিয়াছিল। কীর্তনের সময় দেখা গেল যে তাহার শরীর স্থির হইয়া গিয়াছে, ধ্যানস্থ ভাব। শ্রীশ্রীমা তাহার গলায় একটি মালা পরাইয়া দিলেন। প্রায় এক ঘন্টাকাল সে একাসনে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। ছেলোটর মায়ের নিকট শুনা গেল যে গত ১০।১৫ দিন যাবৎ তাহার এইরূপ হইতেছে। ১০।১৫ দিন পূর্বে তাহাদের বাড়ীতে এক পূজা হয়। সেই দিন এই ছেলোটর নাকি এক স্ত্রীমূর্তির দর্শন পায়, ঐ মূর্তির চার হাত, লম্বা চুল এবং পরিধানে লাল রং এর শাড়ী। দেবীর এক হাতে বর্ষা, এক হাতে শঙ্খ এবং এক হাতে ফুল, ইহার পর হইতেই কীর্তনাদিতে ছেলোটর এইরূপ ধ্যানস্থ অবস্থা হয়। মা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে সে কীর্তনে আনন্দ পায়, তবে তাহার কিছু দর্শন হয় না। দেবীকে সে কি ভাবে দেখিয়াছিল তাহা দেখাইতে বলিলে সে দাঁড়াইয়া তাহা দেখাইল এবং দেবীর বর্ণনা করিল। মা তাহার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে চোখে রক্তিম আভা আছে। যাহা ধ্যানেরই লক্ষণ, নিদ্রার নয়। আরও শুনা গেল ছেলোটর আহারে এবং খেলা ধুলায় বিশেষ অনুরাগ নাই। মা বলিলেন, "যাহারা এই পথে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পথে চলে তাহাদের এইরূপ লক্ষণই প্রকাশ পায়। আমি আরও একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম যাহার মধ্যে এই জাতীয় সুন্দর সুন্দর লক্ষণ প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব লোপ হইয়া গেল।"

১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।২।৫২) আজই আমরা দেৱাদুন হইতে দিল্লী রওনা হইব। আগামী

কল্যা দিল্লী হইতে বৃন্দাবন যাওয়া হইবে। টিহিরীর রাজমাতা মাকে যে মোটর গাড়ী দিয়াছেন তাহাতে মা দিল্লী যাইবেন। স্টেশন ওয়াগনের মত আরও একখানা গাড়ী যাহা রাজমাতা মাকে দিয়াছেন তাহাতে মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ যাইবে।

সকালবেলা মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। শীটী ঘোষ মহাশয় মায়ের আশ্রমের জন্য যে জমি কিনিয়াছিলেন সেইখানে গেলেন। এখানে এখন ব্রহ্মচারী সদানন্দ থাকে। অনেকদিন হয় কন্ট্রাক্টর সামন্তবাবু মায়ের জন্য ঐ জমির উপর একখানি ঘর করিয়া দিয়াছেন। উহার নিকটই পঞ্চবটী করা হইয়াছে। এই জমির উপর আরও একখানি ঘর আছে যাহাতে শীটীবাবুর ভগ্নী থাকিতেন। এখন সেখানে ব্রহ্মচারী সদানন্দ থাকে। এখানে অনেক ফল ফুলের গাছ করা হইয়াছে। সোলনের রাজা সাহেব এই জন্য এখানে মালী রাখিয়া দিয়াছেন।

আমরা সকলে গিয়া পঞ্চবটীতে বসিলাম। মা বাঁধানো জায়গাটার উপরে বসিলেন। আমরা সকলে মাকে ঘিরিয়া নীচে বসিলাম। যেখানেই মা উপস্থিত থাকেন সেখানে লোকের অভাব হয় না। কিষণপুরের এদিকটা জনবিরল হইলেও এখানেও ভক্তদের অভাব দেখা গেল না। দেরাদুন হইতে অনেকেই ফল ফুল হাতে করিয়া মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা যে ফুল আনিয়াছিলেন তাহা দিয়া আমরা শ্রী শ্রী মায়ের চরণে অঞ্জলি দিলাম। মা আবার ঐ ফুল হইতে দুই একটি করিয়া লইয়া আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। ফলগুলিও আমাদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল।

হরিবাবার তিতিক্ষা

মা হরিবাবার কথা উঠাইলেন। মা বলিলেন, "এখান হইতে কিছুদূরে সহস্রধারা বলিয়া একটি স্থান আছে। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী একবার এখানে ভাগবত সপ্তাহ করিয়াছিল। সেই সময় আমাকে সে এখানে লইয়া যায়। আমার সঙ্গে পরমানন্দ ছিল। ঐ সহস্রধারাতে হরিবাবা এবং অবধূতজীর সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। তাহারাও ভাগবত সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছিল। পরমানন্দের সহিত অবধূতের পরিচয় পূর্বেই ছিল। এই দেখার পর হইতে হরিবাবার সহিত মাঝে মাঝে দেখা হইত। এই সময় হইতেই সে বলিতে আরম্ভ করিল, "মা, যেদিন তোমার সহিত আমার প্রথম দেখা হইয়াছে সেই দিন হইতেই দোলের একটা মাস তুমি আমাকে দিয়াছ।" অর্থাৎ দোলের সময় তাহার নিকট একমাস থাকিব বলিয়া সম্মত হইয়াছি। তাই দোলের সময় সে আমাকে তাহার নিকট লইয়া যায়। হরিবাবা এবং উড়িয়াবাবা এরা দুইজন বন্ধু। বৃন্দাবনে মহাপুরুষ বলিয়া ইহাদের সুখ্যাতি আছে। হরিবাবা এ দেহের জন্য অস্থির হইলেও, উড়িয়াবাবা প্রথম প্রথম এ দেহকে বিশেষ গ্রাহ্য করিত না। আমি যখন "বাবা" "বাবা" বলিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতাম সে গম্ভীর ভাবে একটা জায়গা দেখাইয়া শুধু বলিত "বৈঠ"। হরিবাবাকে আমার প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া বৃন্দাবনে অনেকেই তাহার নিন্দা করিত, কারণ তাহার মত একজন মহাপুরুষ একজন স্ত্রীলোককে এত সম্মান করিবে ইহা তাহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু তাহারা যতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে লাগিল,

হরিবাবাও ততই বেশী এ দেহের কাছে যাতায়াত করিতে এবং থাকিতে আরম্ভ করিল। উড়িয়াবাবার এ দেহের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নাই দেখিয়া হরিবাবা যখন বৃন্দাবনে থাকিত তখন এদেহের সম্বন্ধে যে সকল বই লেখা হইয়াছে উহা পাঠ করিয়া সকলকে হিন্দীতে বুঝাইয়া দিত। এই সকল পুস্তকে আমার বিভিন্ন ভাবের কথা শুনিয়া উড়িয়াবাবা অনেক সময় অবাক হইয়া যাইত। ধীরে ধীরে এ দেহের প্রতি তাহার ভাবও বদলাইয়া গেল। শেষ দিকে যখন তাহার সহিত দেখা হইয়াছে তখন সে সর্বদাই এ দেহকে জড়াইয়া ধরিয়া কাছে বসিয়া থাকিয়াছে। আমি হরিবাবাকে "বাবা" "বাবা" বলিয়া এত আদর যত্ন করি দেখিয়া তোমাদের উহা ভাল লাগে না। কিন্তু কেন যে এরূপ করি তাহাত তোমরা জান না। এই বৃদ্ধ বয়স, অথচ সংসঙ্গ কীর্তন ইত্যাদি তাহার সমস্ত কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া চলিয়াছে। বয়সের জন্য অনেক সময় সে ঘুমে কাতর হইয়া পড়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা জয় করিবার জন্য তাহার কত চেষ্টা! সাধারণভাবে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিলে নিদ্রা আসিতে পারে বলিয়া সে প্রথমে হাটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু যখন দেখে যে তাহাতেও ঘুম আসিতেছে, তখন সে পুস্তক হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। দাঁড়াইয়া পড়িতে পড়িতে যখন দেখে যে তাহাতেও ঘুমের আবেশ হইতেছে, তখন সে পুস্তক হাতে করিয়া একপায়ে দাঁড়াইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। সহজভাবে পুস্তকের উপর দৃষ্টি রাখিলে ঘুম আসিয়া পড়িবে বলিয়া যে পুস্তকখানি ডান বা বাঁদিকে সরাইয়া ধরিয়া বক্রভাবে উহাতে দৃষ্টি দিয়া পাঠ আরম্ভ করে।"

কিভাবে হরিবাবা এসব করেন মা তাহা অনুকরণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আমরা উহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম। মা আমাদের হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা হাসিতেছ, কিন্তু এখানেও তোমাদের শিক্ষা নিবার কিছু আছে। সে কি ভাবে তিতিক্ষা অভ্যাস করে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। হরিবাবা বড়লোকের ছেলে। আই. এ পাশ। ডাক্তারি পড়িতে পড়িতে বৈরাগ্যের জন্য সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। কাহারও নিকট বিধি পূর্বক সন্ন্যাস লইয়া সে গৈরিক ধারণ করিয়াছে তাহা নয়। নিজে নিজেই গৈরিক বস্ত্র পরিয়াছে। পাঞ্জাবী দেহ, আবার দেখ চৈতন্যদেবের ভক্ত।

আমি। শুনিয়াছি হরিবাবা চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়া ছিলেন ?

মা। হ্যাঁ, শুধু দর্শন নয়, আরও কিছু তাহার নিকট হইতে পাইয়াছে।

আজ সকালবেলাটা মা হরিবাবার কথা বলিয়াই কাটাইলেন। শেষে নিজ হইতে বলিলেন, "বাবার কাছে যাইতেছি কিনা তাই তাহারই কথা হইতেছে।" বেলা ১০ । টার সময় আমরা আমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। আজ রওনা হইতে হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আহালাদি শেষ করিয়া লইলাম।

বহু লোক মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। সোলনের রাজা সাহেব, টিহরীর রাজমাতা, অবধুতজী প্রভৃতি আসিয়াছেন। দেরাদুন শহর হইতেও অনেক লোক আসিয়াছে। বেলা ২টার সময় মা মোটরে রওনা হইলেন। সঙ্গে গেলেন খুকুনীদিদি এবং নারায়ণ স্বামী। মেয়েরা যে গাড়ীতে যাইবে উহা মেরামত করিতে

দেওয়া হইয়াছে। উহা আশ্রমে আসিয়া পৌছিল বেলা ৪টার সময়। মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ তখনই ঐ গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইল। আমার স্ত্রী ও ছোট মেয়ে ঐ গাড়ীতে গেল। পুরুষদের মধ্যে প্রহ্লাদ (চাকর) কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতার এ.সি.মিত্র ঐ গাড়ীতে গেলেন। এবার রাজগীরে মিত্রমহাশয়ের সহিত শ্রী শ্রী মায়ের প্রথম পরিচয় হয়। শুনলাম মাই নাকি তাঁহাকে চিঠি দিয়া হরিদ্বারে আনিয়াছেন। ইহারা চলিয়া গেলে আমরাও একটি বাস আনিয়া উহাতে মাল পত্র বোঝাই করিয়া স্টেশনে রওনা হইলাম। আমাদের গাড়ীর সময় রাত্রি ৮।।, দেবাদুনে অবশ্য গাড়ীতে তেমন ভিড় ছিল না, কিন্তু হরিদ্বারে যখন পৌছিলাম তখন গাড়ীতে অসম্ভব ভিড় হইল। যাহা হউক অতি কষ্টে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া ভোর ৫টায় দিল্লী পৌছিলাম।

স্টেশনে শ্রীযুক্ত অমল সেন মহাশয়, শ্রীমান রণ প্রভৃতিকে দেখিলাম। কিছুক্ষণপর খুকুনীদিদি সহ আমার স্ত্রী, মেয়ে, শ্রীমতী বুনী, খুকী, বেলুদিদি প্রভৃতিকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা সকলেই আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে বৃন্দাবন যাইবে। ইহাদের নিকট শুনিতে পাইলাম যে, যে মোটর গাড়ীতে মেয়েরা দিল্লী রওনা হইয়াছিল উহা রাস্তায় উন্টাইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কেহই গুরুতর রূপে আহত হন নাই। গাড়ী উন্টাইয়া যাওয়ার একটু পরেই একটি ট্রাক্টর ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। উহার সাহায্যেই মোটর গাড়ীকে পুনরায় খাড়া করান হয়। গাড়ীরও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মেয়েরা আর ঐ গাড়ীতে উঠিতে সাহস পাইল না। তাহারা দিল্লীগামী একটা ট্রাকে উঠিয়া রাত্রি ২টার সময় দিল্লী গিয়া পৌছিয়াছিল। ইহারা ডাঃ জে.কে.সেনের বাসায় পৌছান মাত্রই তাঁহার ছেলে, যিনি নিজেও একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার, ইহাদের আঘাত পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন, শ্রী শ্রী মা নিজে দুধের সহিত বিগুন্ধ গব্যঘৃত এবং হলদি গুড়া মিশ্রিত করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছিলে বলিয়াই বৃন্দাবনচন্দ্র তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা না হইলে যা' কিছু হইতে পারিত।"

বৃন্দাবনে

আজ বেলা ৮।।টার সময় মথুরা রওনা হইলাম। মথুরা পৌছিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। সেখান হইতে টাঙ্গা করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় বৃন্দাবনে উড়িয়াবাবার আশ্রমে পৌছিলাম। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা মা আমাদিগকে দেবালয় দর্শন করিতে বলিলেন। সন্ধ্যার পর কমল (ব্রহ্মচারী) দাদার সহিত গোবিন্দজীর মন্দির, বিহারীলালজীর মন্দির এবং নিষার্ক আশ্রম দেখিয়া আসিলাম। যখন পুনরায় আশ্রমে ফিরিলাম তখন হরিবাবার সন্ধ্যাকীর্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। দুই একজন গান করিলেন। এই ভাবে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল।

৯টার পর আমরা আহালাদি করিয়া শ্রী শ্রী মায়ের নিকট গিয়া বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আমি যখন "আমি" এই শব্দটি ব্যবহার করি তখন উহার লক্ষ্য বস্তু থাকে আমার দেহ, ভগবান্ যখন এই "আমি" শব্দটি ব্যবহার করেন, যেমন "আমি এক, আমি বহু হইব", এইখানে "আমি" শব্দটির লক্ষ্য বস্তু কি?

মা। ভগবান্ "আমি" বলিতে সব কিছুই বুঝাইয়া থাকেন, কারণ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছু নাই।

আমি। "আমি এক আছি" এই কথাটি ভগবান্ সৃষ্টির পূর্বে বলিয়াছিলেন। কাজেই তখন তিনি ভিন্ন আর কোন সৃষ্ট পদার্থ ছিল না। এই অবস্থায় "আমি" শব্দটির লক্ষ্য কি ?

মা। (হাসিয়া) "আমি" শব্দের লক্ষ্য বস্তু যদি বলিতে হয় তবে বলিতে হইবে উহা "আমিই" অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবান্ই।

আমি। তুমি বলিয়াছ যে অহং ভাবও একটা সংস্কার। ভগবান্ যখন অহং শব্দ ব্যবহার করেন তখন বুঝিব যে তিনি নিজকে সংস্কার বদ্ধ করিয়াছেন।

মা। যে অর্থে অহংকে সংস্কার বলা হয় সেভাবে উহা ভগবানের বেলায় প্রয়োগ করা যায় না।

আমি। আচ্ছা, ঈশ্বরের কি সংস্কার আছে ?

মা। ঈশ্বর বলিতে তুমি কি বুঝ ?

আমি। যিনি নিগ্রহ এবং অনুগ্রহাদি করিতে সমর্থ তিনিই ঈশ্বর।

মা। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বেদান্তবাদীরা ঈশ্বর মানে না। তাহাদের নিকট ঈশ্বরও হইবে সংস্কার বদ্ধ জীব মাত্র। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর মানে তাহারা ঈশ্বরত্বে কোন সংস্কার আরোপ করে না।

আমি। তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলে যে শ্রীকৃষ্ণেরও 'একটু কিছু' আছে। এই "একটু কিছু" কি ?

মা। আমি কি ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম ?

আমি। গোপীবাবুর নিকট আমি ঐরূপই শুনিয়াছি।

মা। বাবা আমার কথা বুঝিতে পারে নাই। যাহা বলিয়াছিলাম উহা অতি গোড়ার কথা। কাশী গেলে বাবাকে এই কথাটি তুলিতে বলিও।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্রী শ্রী মায়ের শরীরটা বিশেষ ভাল না।

১৭ই ফাল্গুন, শনিবার (ইং ১।৩।৫২) আজই আমি বৃন্দাবন হইতে দিল্লী রওনা হইব। সকালবেলা মা উঠানে বেড়াইতেছিলেন। আমি গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, গাড়ী উন্টাইয়া যাওয়া প্রভৃতি আমাদের যে এক দুর্ভোগ হইয়া গেল, এগুলি কি আমাদেরই ভোগ ছিল, না অন্য কাহারও ভোগ আমাদের উপর দিয়া হইয়া গেল ?"

মা। অপরের ভোগ তোমাদের উপর দিয়া যাইবে কেন ?

আমি। ঠিক অপরের ভোগ নয়, তবে আমার আপনজনের ত ভোগ থাকিতে পারে যাহা তাহার উপর দিয়া না গিয়া আমাদের উপর দিয়া গেল।

মা। এ ভোগগুলি তোমাদেরই ছিল।

আমি। একজনের মৃত্যুযোগ জীবনে কতবার আসিতে পারে ? সোলনেও তুমি একবার আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ। আবার এই মৃত্যু যোগ ?

মা। এরূপ হইয়া থাকে। তোমরা কি পুস্তকে পড় নাই অষ্টবজ্রের মিলন হইলে অমুকে উদ্ধার পাইবে ? কতকগুলি ঘটনা যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। এরূপ যোগাযোগ হইলেই উহা ঘটিয়া যায়। তোমাদের বেলায়ও সেইরূপ হইয়াছে।

আমি। তুমি পূর্বে বলিয়াছিলে যে স্থানের সহিত ঘটনার সম্বন্ধ থাকে। তুমি যদি আমাকে হরিদ্বারে না ডাকিতে তবেই আমি কিছুতেই কাশী ছাড়িয়া আসিতাম না। তাহা হইলে আমার পক্ষে এই জাতীয় ভোগের সম্ভাবনা কোথায় ছিল ?

মা। তোমার না আসিয়া উপায় ছিল না বলিয়াই তোমাকে আসিতে বলিয়াছিলাম। (দ্রোণশিঁ)

*

"ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে। মঙ্গলময় সময় মতো সব করেন। যা' নিত্য সত্য সেই দিকে সকলের যাওয়া উচিত। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

—শ্রীশ্রী মা

মৃত্যুর মৃত্যু চাই

— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মরণের ভয়ে নিয়ত মরছি আমরা; বেঁচে আছি, কে বললো ? সে-ই বেঁচে, যে নিজেকে অমৃতস্বরূপ ভাবে। মরণ-বিভীষিকা তাকে স্পর্শ করে না; অখণ্ড অনন্ত মহাজীবনের আশ্বাদ পেয়ে সে ধন্য। আত্মোপলব্ধি প্রতি মুহূর্তে তাকে পরমের সাযুজ্য দেয়, আত্মার অবিনাশীতায় প্রজ্ঞাকে সদাজাগ্রত রেখে তার মোহমুক্তি ঘটায়।

সাধারণ মানুষ বিষয়-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন। নশ্বরকে অবিনশ্বর ভাবে। অনিত্যকে নিয়ে থাকতে থাকতে নিত্যের কথা ভুলে যায়। মনে করে, ধন জন, মান-সন্ত্রম, ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি — সবতেই তার অনন্ত অধিকার। 'বিষয়' যে 'বিষ হয়', সংসারের যে 'সঙ-ই সার', — এ বোধ তার কিছুতেই হয় না। ফলে, স্বার্থচিন্তায় মাতোয়ারা হয় সে। নিজের বলে যা কিছু সে আঁকড়ে রেখেছে, তার এতটুকুও হারাবার ভয় তাকে শঙ্কিত করে। এই ভয় ও শঙ্কা থেকেই আসে মৃত্যুচিন্তা। জীবনের স্বরূপ সে জানে না বলেই মৃত্যু তার কাছে বিভীষিকা — অচেনা-অজানা অন্ধকার এক জগতে নিরুদ্দেশ-যাত্রা। আসলে মৃত্যু যে জীবনেরই ওপিঠ, আমরা যে অখণ্ড - অনন্ত এক মহাজীবনের অংশীদার, — শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার যে জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, মোহমায়ায় আচ্ছন্ন বিষয় কীটদের এ-বোধ কিছুতেই হয় না।

নিজেকে জানলেই জগতের স্বরূপকে জানা যায়, জন্ম-মৃত্যুর প্রহেলিকাও ভেদ করা চলে অনায়াসে। যুগে যুগে ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা এবং ত্রিকালজ্ঞ দেব-মানব ও অবতার-মহাপুরুষরা এই মহামুক্তি বা পরম-পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভোগ-সুখে প্রমত্তদের দৃষ্টি নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিবদ্ধ বলেই সে-পথের সন্ধান তারা পায় না। অজ্ঞানতার প্রাচীর তাদের বোধ ও বোধিকে অবরুদ্ধ করে। জন্মমৃত্যুর চক্রাকার আবর্তের মধ্যে পড়ে বার বার তাদের আসা-যাওয়াই সার হয়।

কিন্তু তবু, ভয় নেই কারও। মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে আত্মাবমাননার কোনো প্রশ্ন নেই। শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী দিচ্ছেন অভয়-আশ্বাস — "কে জন্মায় ? মরেই বা কে ? মরে গিয়েও যে আছেই তার মধ্যে আবার কী কথা ?" অর্থাৎ, মরা-বাঁচা বলে আসলে কিছু নেই। পাঞ্চভৌতিক দেহ 'দেও দেও' করে। শরীর 'সরে যায়'। কিন্তু আসল যে প্রাণসত্তা, আত্মায় যার স্থিতি, তা অবিনাশী, চিরন্তন, অক্ষয়, অব্যয়। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বলছেন,

ন জায়তে মৃত্যতে বা কদাচিন্ময়ং

ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ (২।২০)

অর্থাৎ আত্মার জন্মমৃত্যু নেই এবং বার বার জন্মে তার বৃদ্ধি হয় না। তার ক্ষয়ক্ষতি বলে কিছু নেই, তা অজ
নিত্য শাস্ত ও চির-পুরাতন। দেহ হত হলেও দেহধারী আত্মা হত হয় না। শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী বলছেন,
"আত্মার ধ্বংস কোথায়? সবেতে যে সেই প্রাণবায়ু এবং আত্মা"। [মাতৃবাণী (১৩৮৭) - পৃঃ ৬৩]

ধ্বংস হয় শরীরের। শরীর জন্মায়, বাড়ে, শীর্ণ হয় এবং তারপর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্
গীতা বলছেন,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহাতি নরোহপরানি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্

অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ (২।২২)

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন জীর্ণ দেহ ত্যাগ
করে নূতন দেহ ধারণ করে।

আত্মা অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত। তার আসা-যাওয়া নেই। তাহলে জন্মমৃত্যু আসলে কি?— শ্রী
শ্রী মা আনন্দময়ী বলছেন, "মানুষ নিজ কর্মানুসারে জন্ম নেয়। বাসনজড়িত আমি বা অহমিকা যায়-আসে
— আত্মার আসা-যাওয়ার প্রশ্ন নেই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ — কারণের কারণ আত্মা। তাহার প্রকাশ না পর্যন্ত
আসা-যাওয়া। আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ, আসা-যাওয়া জীবের। নিজকে প্রকাশ করবার জন্য পর্দা সরান মাত্র।"

এই পর্দা সরাবার একমাত্র উপায় আত্মোপলব্ধি — নিজেকে পাবার চেষ্টা। ঐকান্তিক ভগবৎচিন্তা
থেকেই এই চেষ্টা আসে। তখন নিজের মধ্যেই অমৃতকে খুঁজে পায় মানুষ। তার কাছে আত্মারামের প্রকাশ
ঘটে। তখন আর আমি-তুমির সীমারেখা থাকে না। অমরপন্থী হয়ে যাবার ফলে জীব হয় অমৃত পথযাত্রী।
সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; জরা-ব্যাধি কিছুই নেই। আছে শুধু অখণ্ড অমৃত সুধায় নিরন্তর অবগাহন-
আনন্দ। মানুষ তখন উপলব্ধি করে, ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। তিনিই সর্বভাবে ও রূপে। একেতে তিনি, আবার
বহুরূপেও তিনি। মা আনন্দময়ীর কথায়, "একেতে যিনি থাকেন ভাগে ভাগেও তিনিই হন! পূর্ব পর জন্ম
তোমার কাছে। সর্বজন্মই যে তাঁর জন্ম, আবার তাঁর জন্মই নাই। পূর্বের পরের প্রশ্ন কোথায়?"

কিন্তু প্রশ্ন যে ওঠে, তার কারণ, প্রকৃতির নিরপেক্ষ নিয়মগুলো, বিশ্বভুবনের নির্লিপ্ত ভাবগুলো
আমরা শুদ্ধ মন ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাই না। চাইলে দেখা যেত, অসীম-উদার প্রকৃতির মধ্যেই
নিরাসক্ত ব্রহ্ম সমাসীন। আসলে জন্ম-মৃত্যু বলে কিছুই নেই। এই তত্ত্বটি মা আনন্দময়ী অতি সুন্দর একটি
উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন — "কন্যাকুমারীর সমুদ্র-কূলে দাঁড়ালে দেখা যায় যে ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠছে ও
ভাঙছে এবং ভেঙে কোন্ অনন্তে যে মিশে যাচ্ছে তার নিরাক্ষর নেই। এই জগৎটিও মহাসমুদ্রবিশেষ; কত
বস্তুর পলে পলে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে যাচ্ছে এবং বিনাশ হয়ে কোথায় যে যাচ্ছে, তা মানববুদ্ধির অগম্য।

প্রকৃতির এই অবিরাম গতি বেশ বুঝিয়ে দেয় যে জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই এবং এক পরম পুরুষই নানাভাবে নানারূপে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন মাত্র। প্রকৃতির বিধানগুলি সুন্দর দৃষ্টিতে শেখ, তার নিরপেক্ষ ভাব হৃদয়ঙ্গম কর, তা হলে যিনি সকল কারণের বিধাতা, তাঁর চিন্তা আপন হতে জাগ্রত হয়ে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই, প্রমাণ করে দেবে। " [সদ্বাণী(১৯৭৬)-পৃঃ ১২৪-১২৫]

এই প্রমাণের কথা জগৎসমক্ষে নতুন করে জানাবেন বলেই পূর্ণব্রহ্মনারায়ণী শ্রী শ্রীমা আনন্দময়ীর মানবদেহ ধারণ। আসলে জন্ম-মৃত্যু বলে মা'র কাছে কিছু নেই। "মরা-বাঁচা তো এই শরীরটার কাছে সমান", মা বলেন। তাঁর অমর-বাণী, "জন্ম-মৃত্যু তো সব সময়ই হচ্ছে। সবটার ভেতরই সব। যেমন এক বীজেতে অনন্ত বীজ, যেমন এক অগ্নি হতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অগ্নি জ্বালালে অনেক দেখা যায় বটে, কিন্তু অগ্নির তো আর ভিন্নতা থাকে না। সেইরূপ এক জন্ম, অনন্ত জন্ম, আবার জন্মের প্রশ্নই নাই।"

বস্তুতঃ প্রথাসিদ্ধ জন্মের প্রশ্ন যে দেবমানবদের ক্ষেত্রে ওঠে না, তার উদাহরণ তো মা নিজে। বহু ক্ষেত্রে এ-প্রসঙ্গে ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তবু, আমাদের কি সংশয় কাটে! মা'কে সাক্ষাৎ নারায়ণী জেনেও অনুক্ষণ ভয়ে মরি। কারণ, মা'র সঙ্গে যে নিজেদের অভিন্ন ভাবি না! দেবীর আসনে তাঁকে বসিয়ে সবাই চাই বিষয়কে আঁকড়ে ধরতে। ফলে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বিভীষিকায় আমরা দিশাহারা। অথচ আত্মোপলব্ধির পথে এগোলে দেখা যেত, পরমপুরুষ সারা ভুবন জুড়ে নিজেকে নিয়েই নিজে খেলছেন। ধ্বংস ও মৃত্যুরূপে তিনিই। নিজের কাছেই নিজেকে শোকতাপরূপে প্রকাশ করে তিনি লীলাময়। মা'র প্রাণস্পর্শী উক্তিতে এই লীলার বৈভব ও বৈচিত্রের আশ্বাদ মেলে একবার।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মা'র কাছে এক ভক্ত লিখলেন, "আমরা যুদ্ধের ভয়ে মৃতপ্রায়। এবার তুমি এই ধ্বংসলীলা সংবরণ কর।" মা উত্তর লেখালেন, "বাবাকে লেখ,— ঠাকুর, তুমি তোমার কাছে 'প্রার্থনা', কান্নাকাটিরূপে প্রকাশিত হয়েছে, অজানা মৃত্যুভয়ে, কাতররূপে তোমার ধ্বংসলীলা, তোমার প্রার্থনায় তুমিই সংবরণ করবে। আপনার কাছেই তো সব। আপনাকেই তো পাওয়া। আপনা বল, আত্মা বল। কোন গণ্ডীবদ্ধ দিক নিবদ্ধভাব হতে দুটি পাওয়া।"

আপনাকে বা নিজেকে জানি না বলেই আমাদের যত দুঃখ-কষ্ট। দৃষ্টি আমাদের বিষয়-সুখের গণ্ডীতে আবদ্ধ। অথচ যে সময়টা বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ব্যয় করা হয়, তা যদি ভগবৎ-চিন্তায় ব্যয়িত হোত তবে নিজেকে জানবার পথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুলে যেত নিশ্চয়। ভগবৎপথিক হবার উপায় পূজা, পাঠ, সংসঙ্গ ও তাঁর নাম নিয়ে থাকা। তাঁকে নিয়ে থাকলে দুর্বুদ্ধি সরে গিয়ে সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি মেলে। এসম্পর্কে মা বলেন, "যতটা সময় ও শক্তি দুনিয়ার কাজের জন্য দেওয়া হয়, ততটা যদি তাঁর জন্য দেওয়া হয়, তবে নিজেকে চিনবার পথ আপনিই খুলে যায়। হয় সদগ্রন্থ পাঠ নিয়ে থাক, আর নয় নাম নিয়ে থাক। যতই এরূপ করবে, ততই শুদ্ধ বুদ্ধি হবে। জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি পাবে।"

ভগবান যে প্রাণের প্রাণ, আত্মা। তাঁকে পাওয়া মানে নিজেকে পাওয়া। দুনিয়া বলে তাকে — যা দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দিকে নিয়ে যায়। ভগবানের থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হল — আপনাকে জানা, আপনাকে পাওয়া।" নিজেকে জানি না বলেই হারানো-প্রাপ্তির সীমারেখা টানি সবাই। পেয়ে খুশি হই, হারিয়ে ব্যথিত। কিন্তু কে পায় আর কে-ই বা হারায়, তা কি একবারও কেউ ভেবে দেখি? এ-সংসারে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্ক কদিনের? 'আমার আমার' বলে তাদের ভাবতে গিয়ে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট নিজেরাই ডেকে আনি আমরা। অবশ্য একথাও ঠিক যে, বৈষয়িক লাভে সাময়িক সুখ লাভ সম্ভব, কিন্তু তা যে অসার অনিত্য, এ-বোধ না হওয়া অবধি শাস্তি নেই। পিতা-পুত্রের উদাহরণ দিয়ে এ সত্যটি মা অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন — "পুত্র লাভ করি আমরা হাসি, আর পুত্র হারিয়ে কাঁদি। রক্তমাংসের দ্বন্দ্ব ভুলে ক্ষণিক ফিরে দাঁড়ালেই দেখা যায় কে-ই বা কার পুত্র? কে-ই বা কার পিতা? অথবা পিতাপুত্র বলে কিছুই নেই, একমাত্র তিনিই সর্বভাবে সর্বত্র মূর্তিমান।" [সদৃ-বাণী - পৃঃ ৬৪-৬৫] তাই হৃদয়াসনে একমাত্র তাঁকেই বসাতে হবে। যাঁর আসন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু স্থান দিতে গেলেই দুঃখ-কষ্ট। কারণ, একমাত্র তিনিই নিত্য, আর সব অনিত্য। শুধু তিনিই অবিনশ্বর, আর সব নশ্বর। নশ্বর থেকেই হারাবার ভয়, মৃত্যুভয়। তার আসা অনিশ্চিত, কিন্তু যাওয়া ধ্রুব। এই আসা-যাওয়া শেষ করতে হলে ঈশ্বর-লাভ ছাড়া উপায় নেই। আবার, একলক্ষ্য হলেই এই পরম-লাভ সম্ভব। যতক্ষণ মন অস্থির, ভাবনা দেহবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, ততক্ষণ একলক্ষ্য হওয়া যায় না। ততক্ষণ দেহকে ঘিরেই যাবতীয় চিন্তা, ততক্ষণ আত্মার স্বরূপ অজ্ঞাত থেকে যায়। তাই জন্ম-মৃত্যু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে দেখা দেয়। কিছুতেই এই বোধ হয় না যে, একেরই লীলা সব। আসলে জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এ-প্রসঙ্গে মা একবার বলেন, "দেখ, যেমন গাছ ও ছায়া, যদি একলক্ষ্য হয়ে গাছ দেখ তবে আর ছায়া দেখবে না। আবার লক্ষ্য স্থির না হলে, গাছও দেখবে ছায়াও দেখবে। তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত গাছ, ছায়া ও দেহাবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ আত্মাও বলছ, পরমাত্মাও বলছ, তাই গতাগতি, আসা-যাওয়া চলছে। যখন লক্ষ্য স্থির হবে তখন দেখবে, এক ছাড়া দুই নাই, গাছেরই ছায়া, আর কিছুই নাই।"

মৃত্যু-চিন্তা আসে স্বার্থবোধ থেকে, ভগবান দূরে আছেন, এই ধারণা থেকেই, দুর্বলতা থেকে। তাঁকে জানলে কোনো ভয়ই আর থাকে না। মৃত্যুভয় চিরতরে লোপ পায় তখন। মৃত্যু দেখা দেয় অমৃতরূপে। মার কথায়, "মৃত্যুর মৃত্যু হওয়া চাই। মৃত্যুর ধ্যান আসে কেন? এ যে অমৃত, মৃত্যু কোথায়? পাগল! যাকে পেলে অখণ্ড-মণ্ডলাকার নিখুঁত প্রকাশ, সেই তো নিজেকে পাওয়া।" [কল্যাণ-বাণী(১৩৯৭)-পৃঃ৩]

নিজেকে পাওয়ার অর্থ ভগবানকে পাওয়া। সেখানে স্থিতিলাভ মানে, এমন এক জায়গার যাত্রী হওয়া যেখানে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, কিছুই নেই। ভূত-ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নেই। সবই বর্তমান। এ-প্রসঙ্গে মা বলছেন, "কার মৃত্যু? কে মৃত্যু রূপেতে? সেই দিকটা প্রত্যক্ষ না হলেত এই দুঃখের সাগর হতে মুক্তি নাই।" [মাতৃবাণী (১৩৮৭)-পৃঃ ৬৫-৬৬]

এদিকে দুঃখ-কষ্ট ঘিরেই আছে আমাদের। শোকতাপের দহনে নিয়ত আমরা জর্জরিত। কিন্তু শোকের সৃষ্টি যে মোহ, তা আমরা বুঝি না। তাই প্রিয়জন-বিয়োগে অস্থির হই সবাই। উপলব্ধি করি না যে

একমাত্র তাঁরই নানা রূপ আমাদের ঘিরে। তিনিই যে শুধু, সর্বত্রই যে তাঁর অস্তিত্ব, এই বোধ জাগলে শোকতাপ আর থাকে না; মোহকে মহান ভাবের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এ-প্রসঙ্গে এক শোকদঙ্ক ভক্তের সঙ্গে মার একটি কথোপকথন বিশেষ উল্লেখযোগ্য :-

এক নারী স্বামী হারিয়ে মার কাছে এসেছেন। বলছেন, "মা, ধ্যানে বসলেই আমার মনে হয় যে আমার স্বামী এসে পাশে বসেছেন। এমনকি এক একদিন যেন স্পর্শও পাই।" মা বললেন, "দেখ, পতিভাব রেখে ধ্যান নষ্ট করে ঐদিকে মন দিলে মোহই বেড়ে যাবে। তাতে কষ্ট ছাড়া আর কিছু নাই। ঐ অবস্থায় কেবলই মনে করবে — হে প্রিয়, হে ভগবান, তুমি এই রূপেই আমার কাছে এসেছ; কারণ, তোমার এই রূপ যে আমার কাছে প্রিয় ছিল। তাই তুমি আমাকে তোমারই দিকে টানবার জন্য এই রূপ ধারণ করে এসেছ। এইভাবে তাঁরই ধ্যানে মনটা লাগাতে চেষ্টা করবে। মোহটাকে মহান ভাবের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাঁর দিকই দিক। অন্য কোনো দিকেই আর শাস্তি নাই।"

মা বারবার সাবধান করে দেন আমাদের, যাদের পরম স্থিতিলাভ না হয়, তাদের হারিয়ে শোকতাপ করলে বিশেষ কষ্ট পায় তারা। তাই প্রিয়জনের কর্তব্য, মৃতের উদ্ধারগতি প্রার্থনা; মৃতের জন্য না কেঁদে ভগবানের জন্য কাঁদা। এই বিরহবোধ থেকেই ব্যাকুলতা আসে; ভগবান-লাভের ইচ্ছা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আর তখনই উপলব্ধিতে আসে, "কে জন্মায়? মরেই বা কে?" এই উপলব্ধি শেষ অবধি পরম স্থিতিতে নিয়ে যায়; 'মৃত্যুর মৃত্যু হয়' তখন।



"মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও যদি ইষ্টচিন্তায় সময় না দেয়, তবে ভাবিতেই হইবে—আমি কি করিতেছি? আমার সারাজীবন কি এইভাবেই চলিবে? যে কেউ এই ভাবনা করিবে তাহার মঙ্গল। না করিলে মৃত্যুগতি।"

—শ্রীশ্রী মা

তাত্ত্বিক দর্শনের পূর্ণতা

(১)

— ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

যোগের সঙ্গে তন্ত্রের সাম্য বা সাধর্ম এইখানে দু'টিই ক্রিয়ামূলক। যোগে দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ, সংকোচন, সংহনন বা নিরোধের মধ্য দিয়ে সমাধিরূপ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার প্রয়াস। এই প্রয়াসকে অনায়াস, নির্বাধ বা অন্তরায়শূন্য করার জন্য ঈশ্বরপ্রণিধানের বিকল্প উপায়ও উপকল্পিত হয়েছে। তন্ত্র ক্রিয়াপ্রধান সন্দেহ নেই এবং ক্রিয়াপ্রধান বলেই আমরা তন্ত্র বলতে সাধারণতঃ নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, তুচ্ছতাক্ — যার মাধ্যমে অনায়াসে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়ে থাকে — তা'কেই বুঝে থাকি। কিন্তু তন্ত্রের যে ক্রিয়াপাদ ছাড়াও একটি বিদ্যাপাদ আছে, আমরা সেদিকে কোনো দৃষ্টি দিই না এবং সে বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অচেতন বা অজ্ঞ ছিলাম এতদিন। পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এই দিকটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর দিব্য প্রতিভার অনুভূতির আলোকে, যার সূচনা করেছিলেন আর এক অসাধারণ বাঙালী মনীষী ও সাধকপ্রবর প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসগ্রহণের পর প্রত্যাগাঙ্গানন্দ সরস্বতীরূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তিনিই ভারতীয় সংস্কৃতির এই অবহেলিত শাখায় একান্ত অনুরাগী এক বিদেশী বিদ্যোৎসাহী মনীষী স্যার জন্ উড্রফের উৎসাহে ও প্রেরণায় তন্ত্রের এই তন্ত্রের দিকটি উদ্ঘাটন করতে এগিয়ে আসেন এবং এই কাজে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হ'ন। তাঁদের এই যুগ্ম প্রয়াসের অনবদ্য ফসল আমরা লাভ করেছি *Serpent Power, Garland of Letters, Mahamaya* ইত্যাদি নানা গ্রন্থে এবং কিছু মূল সংস্কৃত তাত্ত্বিক গ্রন্থের প্রকাশে। আমাদের প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে যেমন বেদবেদান্তের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণাদাতা পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণ, তন্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি স্যার জন্ উড্রফের অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। যদিও তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলি সবই ইংরাজী ভাষায়, তবু তাঁরই পরোক্ষ প্রেরণায় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁর 'তন্ত্রতত্ত্ব' বাংলায় বিশদভাবে লিখতে উদ্যোগী হ'ন এবং রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় নানা তাত্ত্বিক মূল গ্রন্থ বাংলা লিপিতে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হ'ন। পরবর্তীকালে আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন ব্রহ্মসূত্রের 'শক্তিভাষ্য' দর্শনের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করেন এবং স্বামী প্রত্যাগাঙ্গানন্দ সরস্বতী তাঁর বিশাল 'জপসূত্রম্' গ্রন্থ লিখে তন্ত্র ও মন্ত্রের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেন। বাংলার সারস্বত সাধনার এগুলি অক্ষয় কীর্তি এবং ক্রিয়াপাদের অনুশীলনেই প্রধানতঃ ব্যাপ্ত এই বঙ্গদেশে জ্ঞানপাদের পরিপূরক হিসাবে এত অতুলনীয় অবদান, সন্দেহ নেই।

বঙ্গভূমি প্রধানতঃ তন্ত্রধারায় অভিন্নাত এবং বৈদিক ধারা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন থেকেই নিজস্ব স্বকীয়তার গৌরবে মণ্ডিত, একথা অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু বাঙালী শক্তির উপাসক, ভক্তির ধারক এবং তাই প্রকৃতির দিক দিয়েও আবেগপ্রবণ বলেই হয়তো আমাদের এই অঞ্চলে তন্ত্রের ক্রিয়াপাদেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, বিদ্যাপাদের তেমন আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। আমরা আশু কার্যসিদ্ধির জন্য দৈব ক্রিয়াকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে থাকি, কারণ আমরা জানি 'ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি

বলেই সকলে এর অধিকারী বা সকলে এতে আগ্রহশীলও হ'তে পারে না। তত্ত্বের প্রসার কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত একসময় সুবিস্তৃত ছিল এবং তা'র মধ্যে দ্বৈত, অদ্বৈত, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি নানা ধারাও প্রবাহিত ছিল। দক্ষিণে যেমন দ্বৈতধারা, উত্তরের শেষপ্রান্তে কাশ্মীরে তেমনি অদ্বৈতধারার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। কাশ্মীরের এই অদ্বৈত তত্ত্বদর্শনের অনুপম ভাবধারাও জনসাধারণের অগোচরেই থেকে যেত যদি সেখানেও একজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীষীর সেদিকে দৃষ্টি না পড়ত এবং তিনি এই দর্শনের গ্রন্থরাজি প্রকাশের ব্যবস্থা না করতেন। শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের সুসম্পাদনায় কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজে শৈবাগমের, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের গ্রন্থগুলি একের পর এক প্রকাশ হ'তে থাকে এবং পন্ডিতমন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগদীশ চট্টোপাধ্যায় এই দর্শনের মূল তত্ত্বগুলিও সংক্ষেপে সুন্দরভাবে একটি ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশ করলেন Kashmir Saivism নাম দিয়ে, যা আজও এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের অগাধ রহস্য ও তত্ত্বসাধনার নিগূঢ় মর্ম অনুদ্ব্যটিত থেকে যেত যদি পূজনীয় আচার্যদেব তা'কে আপন সাধনার অঙ্গীভূত করে না নিতেন এবং নিজের উপলব্ধির আলোকে তা'র রহস্য উন্মোচন না করে দিতেন তাঁর 'তত্ত্ব ও আগমশাস্ত্রের দিগদর্শন', 'তাত্ত্বিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে। তাঁর পুণ্য জীবনের আলোকে আমরা যোগদর্শনের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সামান্য প্রয়াস করেছি। এখন তিনি তাত্ত্বিক দর্শনকে কেন এত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তার নিগূঢ় কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'ব।

যোগদর্শনে প্রজ্ঞার চরম প্রকাশ ও চরিতার্থতা বিবেকজ্ঞানে। কিন্তু তা'তে চিৎ ও জড়ের ভেদ বা পার্থক্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তাদের সমন্বয় বা একীকরণ সেখানে সম্ভাবিত নয়, যদিও তা'র সুস্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে একটি সূত্রে, যেহেতু সে দর্শনের ভিত্তি হ'ল দ্বৈতবাদ। পূজনীয় আচার্যদেব যোগদর্শনকে সশ্রদ্ধ চিত্তে বরণ করেও তাই তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, এগিয়ে গিয়েছেন অদ্বৈত তাত্ত্বিক দর্শনের দিকে, বিশেষ করে এই সমন্বয় সাধনের সন্ধানে। পূজনীয় আচার্যদেব অনুভব করেছিলেন যে কোনো দার্শনিক উপলব্ধিই হয় বা তুচ্ছ নয়, বরং পরম উপলব্ধিরই সোপান মাত্র। এরই প্রতিধ্বনি তিনি যেন শুনতে পান প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের একটি সূত্রে: 'তদ্ভূমিকাঃ সর্বদর্শনস্থিতয়ঃ'। পরম উদার সমন্বয়ের এই স্বর্ণসূত্রটি আবিষ্কার করে সমস্ত দর্শনের শিরোমণিরূপে এই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নিজেকে স্থাপিত করেছে সন্দেহ নেই, কারণ এই দার্শনিক মতবাদের মধ্যে কোনো কিছুকে বাদ দিয়ে ত্যাগ করে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা হয়নি, সব মতকেই সমান মর্যাদা ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে তা'দের পূর্ণতাসম্পাদনের দ্বারা মন্ডন করা হ'য়েছে। পূজনীয় আচার্যদেবের এই দর্শনকে বরণ করার মূলে এইটাই প্রথম ও প্রধান কারণ।

তাঁর আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই দর্শনের মূলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ স্বাতন্ত্র্যশক্তিময় এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অবস্থাপন। এ দর্শন অন্নয়দর্শন হ'লেও এটি ব্রহ্মাদয় দর্শন নয়, ঈশ্বরাদয় দর্শন। সৃষ্টি সেইজন্য তাঁর ইচ্ছাশক্তির বিলাস, সৃষ্টি থেকে মুক্তিও তাঁর অনুগ্রহশক্তির উপর নির্ভরশীল। শক্তির সঙ্কোচ-বিকাশের ফলেই এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় ঘটে থাকে। অথচ এই ঈশ্বর আমার থেকে আলাদা আরাধ্য

একটি তত্ত্ব ন'ন, আমারই সঙ্গে অভিন্ন পরম তত্ত্ব। আমার সঙ্গে তাঁর ভেদ বা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে শক্তির হাস বা সংকোচের ফলে সংস্থাপিত নয়। তাই এ সংকোচ দূর হয় শক্তিপাতের ফলে, অনুগ্রহশক্তির ক্রিয়ার ফলে।

দর্শনের ক্ষেত্রে শক্তিতত্ত্বের এই স্বীকৃতি এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, যার দরুণ এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এই দর্শন স্থাপিত হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেমন ভৌতিক বা জড়শক্তির তত্ত্ব আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মের আবরণ উন্মোচনে সচেষ্ট, আচার্যদেব তেমনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে চৈতন্যশক্তির সেই জাতীয় অনুসন্ধান করে বিশ্ববিকাশের তত্ত্ব অধিগত করতে। এই পরমা চিতিশক্তি যেহেতু আপন পটভূমিকায় এই বিশ্বের উন্মীলন করে থাকেন। 'উন্মীলন' কথার মধ্যই এটি সুপরিষ্ফুট যে বিশ্ব এই শক্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল, শুধু ইচ্ছাবশে বাইরে প্রকট বা অভিব্যক্ত হ'ল মাত্র। এই দৃষ্টিতেই ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর রচিত দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে বলেছেনঃ 'বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতম্'। এখানে তাই বাইরে থেকে কোনো উপাদান সংগ্রহ করে সৃষ্টি করতে হয় না, শুধু অন্তর্গত শক্তির বহিঃপ্রক্ষেপ বা বাইরে বিচ্ছুরিত করে দেওয়া মাত্রই সৃষ্টি হ'য়ে থাকে—তাই বলা হয়—'নিরূপাদানাং ইচ্ছায়া ভাসয়েদ্ বহিঃ'।

সৃষ্টির ক্রমটি এই দর্শনে পর্বে পর্বে এমন সুপরিষ্ফুট করে দেখান হয়েছে এবং তার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে এটির অনুধাবন করলে আর্য প্রজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি চোখের উপর ফুটে ওঠে। এই দর্শনে ছত্রিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত এবং তার মধ্যে সাংখ্যযোগের প্রকৃতি এবং বেদান্তের মায়াত্ত্ব সবই স্থান পেয়েছে। কিন্তু তারও উর্দ্ধে শিব-শক্তি-সদাশিব-ঈশ্বর-বিদ্যারূপে যে তত্ত্বগুলি উপন্যস্ত হয়েছে তাতে সৃষ্টির শুদ্ধ বা অবিকৃত রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সৃষ্টি অশুদ্ধ বা মলিন হয়েছে মায়ার সংস্পর্শে এসে, অবিদ্যার রাজ্যে। মায়ার উর্দ্ধে বিদ্যার রাজ্যে সৃষ্টি বিশুদ্ধ অধ্বায় স্থাপিত বা অধিষ্ঠিত। সৃষ্টির আদর্শ বা প্রকৃত রূপ রয়েছে সেখানে, আর তার বিকৃত রূপ রয়েছে এখানে। এই প্রকৃত বা আদর্শ রূপকে ধরতে হলে যেতে হবে সেই মূলে, যেখান থেকে সৃষ্টির প্রথম সূচনা। অন্যান্য দর্শনে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি ক্রমে শুধু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অনুসন্ধান করা হয়েছে, আর এখানে সেই সৃষ্টিরও প্রথম প্রেরণা কোথা থেকে এল, সেই উৎসের সন্ধান করা হয়েছে। এখানে তাই পরম চৈতন্য শক্তি—যাঁকে শিব অবিহিত করা হয়েছে—শুধু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনটি ক্রিয়ার অধিকর্তা ন'ন, তার সঙ্গে আরও দুটি ক্রিয়া বা কৃত্য সংযুক্ত করে সত্যত পঞ্চকৃত্যকারী। সেই দুটি মৌলিক ক্রিয়া হ'ল নিগ্রহ ও অনুগ্রহ। তাঁর নিগ্রহ ছাড়া সৃষ্টির সূচনাই হতে পারে না এবং তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিলয় হয় না, পরিপূর্ণ লাভ হয় না। প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে কেবল্য লাভ করলে তাই মুক্তি হয় না, এমন কি মায়ার থেকে মুক্ত হলেও সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় না, কারণ তারও পিছনে থেকে যায় মহামায়া, যার থেকে উদ্ভূত হয় বৈন্দব জগৎ। এই বিন্দু বা মহামায়া, যার থেকে উদ্ভূত হয় বৈন্দব জগৎ। এই বিন্দু বা মহামায়াও অচিৎ বা জড়ের পর্যায়ে পড়ে। একে ভেদ করে উঠতে পারলে পৌছান যায় শক্তি জগতে, যেটি বিশুদ্ধ চিন্ময় রাজ্য। তাই বিশ্ব বা জগৎ শুধু জড়েরই কারবার নয়, যার থেকে নিজে থেকে বিযুক্ত বা বিমুক্ত না করলে, চৈতন্যের উপলব্ধি হবে না। এই

দর্শনের মতে 'শিবাди ধরণ্যন্তম্' এই সবই হল বিশ্বশব্দের বাচ্য বা তাৎপর্য। শিবই অর্থাৎ পরম চৈতন্যই ধাপে ধাপে ধরণী বা পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে ক্রমিক সংকোচের ফলে। আবার বিস্তারিত বা বিস্ফুরিত হতে হতে এই ছত্রিশটি তত্ত্বই একমাত্র শিবে গিয়ে পর্যবসিত হয়ে যায়। আরোহ-অবরোহের সংকোচ-প্রসারের এই ক্রমটি এখন আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

এক পরম অখণ্ড চৈতন্যশক্তি সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজিত — তিনিই 'প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ'। তাঁরই সঙ্গে অভিন্ন হয়ে নিত্য সংযুক্ত হয়ে আছে স্বাতন্ত্র্যময়ী বিমর্শশক্তি। শিবের সঙ্গে এই শক্তি প্রকাশের সঙ্গে এই বিমর্শ যদি যুক্ত না থাকেন, তাহলে শিব হয়ে যান শব। বর্ণমালার দিক দিয়ে যখন এই তত্ত্বকে বুঝবার চেষ্টা আমরা করব তখন দেখতে পাব যে 'ইকারই হচ্ছে এই শক্তির প্রতীক যা' কিনা ইচ্ছার দ্যোতক বা প্রকাশক। ইকারটি সরিয়ে নিলেই তাই শিব শবে পরিণত হন। বাক্ বা শব্দ অর্থের মধ্যেও এই নিত্য সম্বন্ধ, তা'রা সম্পৃক্ত, পরস্পর আলিঙ্গিত হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মত অভিন্নতনু। কালিদাস তাঁর রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে এরই বন্দনা গেয়েছেন, যিনি একাধারে মাতা ও পিতা। মাতা সেখানে বাক্, পিতা সেখানে অর্থ। লক্ষণীয় যে সংস্কৃতে বাক্শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং অর্থশব্দ পুংলিঙ্গ। অর্থ বা পুরুষ, তার অপরিমিত ঐশ্বর্য নিয়েও যেন অন্তরালে, একাকী, নিঃসঙ্গ, রিক্ত, ভিখারী। তার অনন্ত ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে তুলে ধরা, বাইরে অভিব্যক্ত করা বাকের কাজ। তাই অর্থ নিয়ত বাকের মুখাপেক্ষী, শিব সর্বদা অল্পপূর্ণের দ্বারা বাঁধা ভিখারী। ভর্তৃহরি তাঁর 'বাক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে অনাদিনিধন শব্দব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তিপ্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে তাই প্রথমই স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই শাস্ত্র চিরন্তন বাকরূপ অভিব্যক্তি যদি নিজেকে সরিয়ে নেয়, তা' হলে অর্থরূপ প্রকাশ কোনোদিনই কখনই প্রকাশ হতে পারে না —

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাস্ত্বতী।

ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমশিনী।।

আলঙ্কারিক দল্লী তাঁর 'কাব্যদর্শ' নামক প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থে যেন এরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন :

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।

যদি শব্দাহুয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।।

কাব্যের আত্মা নিয়ে নানা বিচার হ'লেও, শব্দ ও অর্থ — এর মধ্যে কোন্টির প্রাধান্য — সে বিষয়ে নানা মতভেদ থাকলেও, কোন আলঙ্কারিকই শব্দ ও অর্থকে পরস্পর বিচ্ছিন্নরূপে কল্পনা করতে পারেননি, 'শব্দার্থো সহিতৌ কাব্যম্' — এই ভাবেই কাব্যের স্বরূপকে নির্দেশ করেছেন প্রকারান্তরে, সংজ্ঞা বা definition এর নানা ভেদ সত্ত্বেও এবং 'সাহিত্য' শব্দেরও সেখানেই যে সার্থকতা, তা'ও যেন এর মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

ভক্তের দৃষ্টিতে এই একই তত্ত্ব অপরূপভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে ভগবান শঙ্করাচার্য মায়ের স্তুতি করছেন এই বলে —

চিতাভস্মালেপঃ গরলমশনং দিক্‌পটধরো ।
 জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারঃ পশুপতিঃ ।
 কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
 ভবানি ত্বংপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥

শিবের সর্বগুণহীন নিঃস্ব নির্গুণ রূপটি তুলে ধরে শঙ্করাচার্য দেখাতে চেয়েছেন যে এমন বাউন্ডুলে ভূত-
 প্রেতের অধীশ্বর কিনা জগদীশ্বরের পদবী লাভ করল—সে কার দৌলতে ? না, বিয়ের দৌলতে । এমন
 অঘটন ঘটাল কে ? ভবানী! তোমার পাণিগ্রহণেরই এটি পরিপাটি ফল—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যাই হোক—এই পাণিগ্রহণের ফলে শিব 'শব্দ্যালিস্তিত বিগ্রহ' হয়েই এই বিশ্বরূপে নিজেকে
 প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন, অর্থের ঐশ্বর্য বাকের মাধ্যমে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিকাশের এই
 ধারাটি এখন আমাদের বিশেষ প্রণিধানের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে। আমরা দেখেছি, এখানে বিশ্ব হল
 'শিবাদিধরগাম্ভ'—শিবে তার আদি, শুরু বা আরম্ভ, আর ধরনী বা পৃথিবীতে তার অন্ত বা অবসান, শেষ।
 সুতরাং মনে রাখতে হবে এই দর্শনের মতে শিবে এবং জীবে এবং জীবের আশ্রয় এই জড় পৃথিবীতে কোনো
 ভেদ নেই—সেই পরম চৈতন্যই এই জড়রূপে প্রতিভাত হচ্ছে আমার কাছে। কিন্তু আলো ও অন্ধকারের
 মত যারা পরস্পরবিরোধী সেই জড় ও চৈতন স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, এ কেমন করে মানা সম্ভব ?
 আমরা দেখেছি এই কারণেই অন্ধকাররূপ জড় প্রকৃতিকে আলোকরূপ চৈতন্য থেকে একেবারে পৃথক করে
 তার সংস্পর্শশূন্য করে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছেন যোগদর্শন। বেদান্তদর্শনেও এই অন্ধকারকে অবাস্তব মিথ্যা
 বা মায়া বলে অস্বীকার করে এক অখণ্ড চৈতন্যেরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে
 জড়কে চৈতন্যেরই সঙ্কুচিত ঘনীভূতভাবরূপে, অন্ধকারকে আলোরই ক্রমিক হ্রাসরূপে দেখান হয়েছে।
 এখানে তাই দৃষ্টিভঙ্গীটাই সম্পূর্ণরূপে বদলে যাচ্ছে। যে চিন্তা এবং তার নিরোধ নিয়ে যোগদর্শন এত বিব্রত
 ও ব্যতিব্যস্ত, এই দর্শনে সেই চিন্তা চিতি অর্থাৎ চৈতন্যেরই সংকুচিত রূপ ছাড়া কিছু নয়— 'চিতিরেব
 চৈতন্যপদাদবরাঢ়া চেত্যসঙ্কোচিনী চিন্তম' (সূত্র ৫)। চিতিই তাঁর সর্বব্যাপক চৈতন্য রূপ থেকে অবরোহণ
 করে যেন নেমে এসেছেন পরিচ্ছিন্ন সেই চেত বা জ্ঞেয় বিষয়কে জানবার জন্য এবং সেই বিষয়ের দ্বারা
 সংস্কুচিত হয়ে—ঠিক ঐ বিষয়টুকুই জানছি এইভাবে—প্রকাশ পাচ্ছেন চিন্তরূপে। আবার নিজের শুদ্ধরূপকে
 যখন তিনি জানেন তখন সেই চিন্তাই অধিরোহণের ক্রম ধরে অন্তর্মুখ হয়ে চৈতন্যরূপকে ফিরে পায়,
 বিশুদ্ধ চিতিশক্তিরূপেই প্রকাশ পায়— 'তৎপরিজ্ঞানে চিন্তমেব অন্তর্মুখীভাবেন চৈতন্যপদাধ্যারোহাৎ চিতিঃ'
 (সূত্র ১৩) ।

(ক্রমশঃ)



মাতৃ স্বরূপামৃত

[দ্বিতীয়পর্ব]

— শ্রী শ্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

"আমি তোমাদের সবচেয়ে ছোটমেয়ে"

‘এ শরীরটা যে সকলেরই ছোট্ট মেয়ে’ — আপনা আপনি মা তাঁর খেয়ালে বলেছিলেন, একবার নয়, বহুবার বহুজনের কাছে বলেছিলেন এই মহাবাক্যটি। পূর্বেই বলা হয়েছে মা অদিতি, তিনি অখণ্ড পূর্ণ — তাঁকে ঋক্বেদে বলা হয়েছে অক্ষরা। তাঁকেই তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে ‘আয়াহি বরদে দেবি অক্ষরম্ ব্রহ্মসম্বিতম্’ (তৈত্তি. আ. ১০.৩৪.৫২) অর্থাৎ ‘হে দেবী তুমি এসো, আমাদের প্রার্থনা স্বীকার করো, তুমিও ব্রহ্ম একাত্মক’। মা বিশ্বভূবন সৃষ্টি করে তাতেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হলেন। মানবদেহেও তিনি অনুপ্রবিষ্ট হলেন। কি ভাবে হলেন? সূক্ষ্ম বা অবিদিত আকারে পুরুষরূপে দেহে তিনি প্রবেশ করেন। শুধু তাই নয়, দেহে তিনি অবস্থানও করে থাকেন—এখানে পুরুষ অর্থ হল ‘পুরুষায়নাৎ’ অর্থাৎ দেহপুরে যিনি অন্তর্যামি রূপে শয়ান তিনিই পুরুষ। দেহের কোন স্থানে ব্রহ্মময়ী মা অধিষ্ঠিত আছেন? বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে হৃদকমল রয়েছে সেখানে ‘ছোট্টমেয়ে’ রূপে মা অবস্থান করছেন। বৃহৎ ও নিত্য অলৌকিক তথা পরমসত্তার ক্ষুদ্র ও অনিত্য লৌকিক সত্তায় রূপায়ণ ঘটে ‘বাচ্চিমেয়ে’ কথাটির মধ্যে — অরূপার রূপময় প্রকাশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলেও তিনি ‘ছোট্টমেয়ে’ বনে যান রূপে এসে, বিশ্বেশ্বরী হয়ে। হৃদকমলে মা থাকেন যা বেদান্ত বেদ্য। হৃদয়ে তিনি থাকেন সূক্ষ্ম গুণময়ী ঈশ্বরীরাপে। মা ছোট্ট, কিন্তু কতটুকু ছোট্ট?

কঠ উপনিষদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, ‘যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতীর্দেবতাময়ীগুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজয়ত। এতদৈতৎ’। (কঠ ১.২.৭৮.৭) — এই ক্ষতিতে মূলত অদিতি রূপা প্রাণশক্তিতে ব্রহ্মদর্শন বিহিত হয়েছে। প্রাণরূপে যিনি বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি অদিতি অর্থাৎ মা। মা অদিতি প্রাণশক্তি, তিনি প্রাণাঙ্গিকা—ভূতগণের সঙ্গে প্রাণের আবির্ভাব। জীব ও জগতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মময়ী মা। কঠ উপনিষদ তাঁকে বলেছেন ‘আত্মা’। আত্মা কেমন? আত্মা হলেন ‘অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান’, অর্থাৎ অনু থেকে অনু, মহৎ থেকেও মহান। (কঠ ১.২.৪৯.২০) আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত ব্রহ্মের প্রকৃতি, আত্মা থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব, তাই স্বমূল কেবলমাত্র আত্মাকেই বুঝায়। আত্মা যেমন অব্যক্তপরা প্রকৃতি, তেমনি আত্মা আবার সর্বব্যাপীরাপে প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও মহান। সূক্ষ্মত্বের বা ছোটত্বের পরিসমাপ্তি তাতেই। আত্মাই পরমগতি রূপে মা—এই মাকে ‘ছোট্টমেয়ে’ রূপে ভাবাই বেদান্ত সম্মত। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ‘প্রতিদেহস্থ ত্বং’ বা অহং এবং ‘ছোট্টমেয়ে’ রূপে ভাবাই বেদান্ত সম্মত। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ‘প্রতিদেহস্থ ত্বং’ বা অহং এবং সর্বব্যাপী তৎ—এর একতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনিই আত্মা, পরমাত্মা এবং সং বলে অভিহিত হন। মাকে ধরতে হলে হৃদয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই, আর চাই স্বজাত অনুভূতি। মন নির্মল ও বুদ্ধি নিশ্চয়াঙ্গিকা হলে সে বোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে, তা দ্বারা মা প্রাণকুমারী ছোট্টমেয়ে রূপে সাধকের হৃদকমলে প্রকাশিত হন। তখনই আত্মার সাক্ষাৎদর্শন হয়, লাভ হয় অমৃতত্ব। মা প্রাণের প্রাণ হয়ে সকলের হৃদয়ে আছেন, —কৈবল্যোপনিষদ পরমাত্মা সর্বব্যাপক হলেও অতীব সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম বলে উল্লেখ করেছেন, “সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং নিত্যং তৎ ত্বমেব তৎ” (কৈ. উপ. ১.১৬)। মা তাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন “এই শরীরটা যে সকলেরই ছোট্টমেয়ে, বাবা মার সঙ্গে পৃথকে ৷ কিন্তু বাবামার মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি মা’তে পৌঁছতে পারে না। মা কি মা? না

তিনি ছোট্ট মেয়ে? — তা বাবামারা বুঝে উঠতে পারেন না, — তাঁদের মন মার দিকে ধেয়ে চলে, কিন্তু মায়ের অবস্থান সব সময়ই অগ্রে থাকে, তাঁকে ধরা যায় না — 'তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ' (ঈশোপনিষদ) অর্থাৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মময়ী মা) সর্বদা পুরোভাগে থাকেন।

উপাসনার জন্যই মা ছোট্ট ঈশ্বরীরাপে জীব হৃদয়ে আছেন। বেদান্ত উপাসনার জন্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী ক্ষুদ্ররূপেই উপদিষ্ট হয়েছেন। আকাশ অনন্ত হলেও গবাক্ষব্যোম ইত্যাদিস্থলে যেমন বৃহত্তের অল্পত্ব বিবক্ষা হয়, সেইরূপ আদ্বারও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নয়। সমাধি দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বৃত্তির সাহায্যে ব্রহ্মময়ীকে জানা যায়। মাকে চিন্তা করবার জন্যই তাঁর ছোট্ট বাচ্চিরূপ — উপাসনার সৌকর্য্যার্থেই ব্রহ্মময়ীকে ছোট্ট বা সূক্ষ্ম বলা যায়, আসলে মা তো 'যা তা'।

মা নিজেকে 'মেয়ে' বলেছেন কেন? ব্রহ্মবস্তু কি মেয়ে? সাকারে সপ্তণ্ডে যখন ব্রহ্ম উপাসকদের কল্যাণের জন্য বিশ্বে আবির্ভূত হন, তখন তিনি 'স্ত্রী পুরুষ ধন্তে' অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষরূপ ধরেন। অমূর্ত থেকে তিনি মূর্ত হন — আসলে তিনি 'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবাং ন পুংসকঃ' (শ্বেতাস্বতরোপনিষদ) অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, ক্লীবও নন। বেদান্তের অগ্নির মত ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকেই তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে 'দুর্গাং দেবীং শরণমিহং প্রপদ্যে' — তাঁর গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যজ্ঞিকা উপনিষদে — মন্ত্রটি হল "কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ"। অর্থাৎ হে দুর্গে, তুমি কুমারী কন্যা বা ছোট্টমেয়ে, কাত্যায়নকে জানি, তোমাকে ধ্যান করি, তুমি আমাদের প্রেরণ কর। দুর্গা ব্রহ্মশক্তি অগ্নিকন্যা, তাই তিনি অগ্নিবর্ণা — কুমারী কন্যা রূপটিই তাঁর ধ্যেয় রূপ, তাই মা নিজেকে 'ছোট্টমেয়ে' বলেন।

বেদের মধ্যে যজ্ঞ ও অগ্নিই ঋষিদের আকৃষ্ট করেছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অগ্নিকন্যা মুণ্ডক উপনিষদে হয়েছেন অগ্নিশিখা কালি। যজ্ঞাগ্নির লেলায়মান সপ্তজিহ্বার প্রথম জিহ্বা কালি। কালির স্ত্রী আকার। কারণ অগ্নিরূপা কালি তমঃ আবৃত কার্যব্রহ্ম বা দেবযোনি, যা সর্বতেজের ঘনীভূত মূর্তি। যজ্ঞের স্ত্রী আকার অগ্নিতে ঋষিরা সর্বতেজ অনুভব করেন বলেই কালিকে বলা হয়েছে যজ্ঞাগ্নি অর্থাৎ দেবী রূপা মা স্বয়ং অগ্নি। এই অগ্নিরূপা মা টি কেমন? তিনি কুমার, আবার তিনিই কুমারী। শ্বেতাস্বতরোপনিষদ ব্রহ্মকে কুমার ও কুমারী বলেছেন, 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' (শ্বেত. উ.৪.৩)। যজ্ঞের অগ্নি অরণি ও উত্তর অরণি নামে অভিহিত শমী কাষ্ঠখন্ডদ্বয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন করা হয়। অরণিতে অগ্নি সপ্ত থাকে, তা'কে ঘর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন করতে হয়। সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনই হল শক্তির জাগরণ বা মাতৃবোধন। মা ব্রহ্মজ্ঞান, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা উমা। মা'ই বাচ্চিমেয়ে 'আত্মা', আবার তিনিই ছোট্টমেয়ে ওঁকার। 'আত্মা' এখানে জীবাত্মা এবং ওঁকার পরমাত্মা। 'আত্মাকে' অরণি ও ওঁকারকে উত্তর অরণি — মছন করলে জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয় — বেদান্ত এই কথাই বলেন। সাধকগণ নিজ আত্মায় 'ছোট্টমেয়ে' প্রণবরূপিনী মাকে অবলম্বন করে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করতে পারেন, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে পারেন — এই জ্ঞানাগ্নিই সাধককে প্রপত্তি মার্গে উন্নীত করতে পারে।

'ছোট্টমেয়ে' বলে মা একটা মহৎ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। মা স্বয়ং অদ্বৈত তত্ত্ব এবং তত্ত্বত তিনি অদ্বৈতের অভিযাত্রিণী হয়েছেন, সন্তানদের জন্মজন্মান্তরের আবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছেন পরমসত্যের ব্রাহ্মী চেতনায়। ছোট্ট হল কুমারীকন্যা, আর তার শক্তি হল কুমারী শক্তি। মায়ের সুললিত ভাষায় কুমারীতত্ত্ব এই ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, "কুমারীশক্তি স্বরূপে শিবশক্তি যে স্বরূপটি গুহ্য থাকে। যেখানে অখণ্ড, সব কিছুতে কুমারীশক্তি বর্তমান। শিবশক্তি স্বরূপটি অব্যক্ত সত্তায় কুমারীতে।" ছোট্টবাচ্চির তথা কুমারীকন্যার তত্ত্বটি বোধগম্য করাতে মা তাঁর স্বখেয়ালে প্রকাশ করেছেন, "মহাশক্তি সত্তারূপে যে সেই আত্মসত্তা, কুমারী শক্তিরই আর এক রূপ। সেই মহাশক্তিতে কুমারীশক্তি, আর কুমারীশক্তিতে সেই মহাশক্তি।.....কুমারীতে যে স্বয়ং পুরুষত্ব আছে আর কুমারেতে যে মহাশক্তি নিত্য আছে, তা যে নিত্য জাগ্রত, নিজেতে নিজেই আছে।" মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু সন্ন্যাসী 'ছোট্টবাচ্চী'র কাছে আত্মসমর্পণ করে বলেছিলেন— "হ্যাঁ মা তু নে ঠীক কথা, ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হোকর জো বচতী হ্যায় ওহী তু হ্যায় তু বাচ্চী হ্যায়।" ভাগবতে ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি হল চিৎশক্তি—এই চিৎশক্তিকে সত্ত্বগুণের এক প্রকার বিশেষ পরিণতি বলা হয়, যা অঘটন ঘটতে পারেন। এই শক্তিদ্বারা স্বয়ং ভগবান ছোট্টশক্তি সম্পন্ন জীবের মত নিজেকে ব্যক্ত করেন। ভগবত্তার আবরণ হেতু অসীম মা 'ছোট্টবাচ্চী' বলে নিজেকে প্রকাশ করেন। শ্রীভগবানের মনুষ্য রূপই পরম ভাবম্। ছোট্টমেয়ে বলে মানবী মা প্রথম আত্মঘোষণা করেন ঋক্বেদের দেবীসূক্তে বলেন, 'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধণ মমযোনিরপস্বন্তঃ সমুদ্রে' অর্থাৎ আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে উৎপন্ন করি। এই ঋক্বেদের বাক্যমন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যে চিন্তের মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচেতন্য তাতেই মার অধিষ্ঠান, আর চিন্তের মধ্যে যাঁর অধিষ্ঠান তিনি তো ছোট্ট বাচ্চীই।

মা প্রকাশ করেছেন, 'তোমাদের এই ছোট্ট মেয়েটা তো এলোমেলো যেটি নিয়া যখন'। ছোট্টমেয়ের 'এলোমেলো' অবস্থাটা কি? মা তাঁর লীলার মধ্যে বাস্তব ব্যবহারিক সত্তা এবং পারমার্থিক সত্তা প্রকাশ করেছেন। যা বেদান্ত বেদ্য এবং তন্ত্র সম্মত তাই পারমার্থিক। পারমার্থিকে নিমগ্ন থাকা অবস্থাই পারমার্থিক সত্তা। মা সর্বলোকের হিতের জন্য বালিকাৎব নিজেকে ভক্তমনে তুলে ধরেন যে তিনি আসলে 'ছোট্টমেয়ে' ছাড়া কিছুই নন। এতে তাঁর খেয়ালই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মায়ের আহার বিহারাদি কর্ম হলেও এতে তাঁর অখণ্ড স্বরূপের হানি ঘটায় নি। তাঁর ব্যবহারিক সত্তা ত্রিগুণময়ী, আর পারমার্থিক সত্তা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন। ব্যবহারিক সত্তায় আপনা আপনি তাঁর সকল কর্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হত, যেমন দেবতা পূজন, সমাধি, তীর্থযাত্রাদি এবং নিত্যক্রিয়া, আহার বিহারাদি— যাকে শাস্ত্রে 'চিকীর্ষুর্লৌকসংগ্রহম্' বলা হয়েছে। মায়ের খেয়ালে সব কর্ম হত, আগে থেকে স্থির করে তাঁর কিছুই হয় নি। কোন খেয়ালে এসব কর্ম আপনা আপনি হত? কারণ এসব না হলে অজ্ঞান সন্তানগণ কর্মে নিযুক্ত থাকবে কেমন করে? পারমার্থিক সত্তায় 'আমি ছোট্টমেয়ে' স্বরূপ প্রকাশ করে মোক্ষার্থী, জ্ঞানার্থী, দর্শনার্থী সন্তানদের স্বক্ৰিয় স্বরসামুতে প্রীত করতেন, সাধনার খেয়ালী খেলা খেলতেন, তাই তাঁর মাতৃবিগ্রহ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, "ছোট্ট মেয়ের নিজের খেয়ালে খেলা শুরু"। মা স্বরূপ প্রকাশে বিন্দু মাত্র রহস্য রাখেন নি, তিনি সুস্পষ্টভাবে আপনা আপনি বলেছেন, "চিন্তা যদি কিছু করতে হয় তবে ছোট্ট মেয়েটির চিন্তা কর।" এই বলিয়া নিজের শরীর দেখাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

আনন্দ

— ডাঃ চিন্ততোষ চক্রবর্তী

কি আনন্দ কি আনন্দ
মন ভরেছে
নিরানন্দ তাইতো আজ
বিদায় নিয়েছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
দোলা দিয়েছে
প্রাণের মাঝে তাইতো আমার
ভাব জেগেছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
জোয়ার এসেছে
টেউয়ে টেউয়ে একূল ওকূল
দুকূল ভেসেছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
মন মজেছে
হরি নামের মধুর সুরে
প্রাণ ভরেছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
পুলক জেগেছে
দু'নয়নে জলের ধারা
তাইত নেবেছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
ছোঁয়া লেগেছে
মা মা মা বলে প্রাণ
আকূল হয়েছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
(মন) মেতে উঠেছে
খোল করতাল জয়মা বলে
বেজে উঠেছে।

কি আনন্দ কি আনন্দ
চোখ খুলেছে
দুচোখে আজ সবাইকে তাই
ভাল লেগেছে।।

ভাইজীর বাণীর মনন

[৩]

— জয় মুখার্জী

"তাঁহার হাব-ভাব, কথা, হাসি, কৌতুক, চলাফেরা, খাওয়া পরা প্রভৃতির সহিত কাহারও সৌভাগ্যবশতঃ সংযোগ সুবিধা ঘটিলে সাধারণ বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া না ফেলিয়া বা কথায় ও ব্যবহারে চঞ্চল না হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত প্রত্যেকটির অলৌকিক মাধুর্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ে অনুধাবন করা আবশ্যিক।"

ভাইজীর বাণী নিয়ে মননের সময় রোমাঞ্চ হয়। দেখি ঋষির ঋতন্তুরা দৃষ্টি দিয়ে কি অদ্ভুত সুন্দরভাবে ভাইজী শ্রীমায়ের পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপের লীলা মাধুরী দর্শন করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ বাইরের ঘটনাকে দর্শন করে সেখানেই নিবদ্ধ হয়ে যায়— কিন্তু যাঁদের বোধি তপস্যায়, ঈশ্বর চিন্তায় যত শুদ্ধ তাঁদের দৃষ্টি, ঘটনার তত গভীরতম স্তরে পৌঁছাতে পারে। তাতেই তাঁদের দর্শন হয় পূর্ণ, আর আমাদের দর্শন হয় ওপর ভাসা। তাঁদের আনন্দ হয় স্থায়ী, আমাদের আনন্দ হয় ক্ষণিক।

ঋষি ধাতুর এক অর্থ দর্শন করা "ঋষির্দর্শনাৎ" (নিরুক্ত)। তাঁরা দর্শন করে কি হন? "সাক্ষাৎ কৃতধর্মানঃ" (নিরুক্ত) সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ হয়ে যান। তাঁদের বাক্য বাণীও কর্মে ধর্ম স্বয়ং প্রকাশিত হন, তা তাঁদের হয় কেমন করে? "তপস্যামানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু অভ্যনার্থত তদ্ব্যবয়ো" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। তপস্যাপূত সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম স্বয়ং যখন স্বরূপে আবির্ভূত হন তখন তিনি ঋষি হন। অহরহ মাতৃ মননের ফলে মা তাঁর স্বরূপলীলা ভাইজীর কাছে উন্মোচিত করেছিলেন ও তাই ভাইজী সেই অনুপম লীলা মাধুরী হৃদয়ভরা আশ্বাদন করেছিলেন। এমন প্রেমময় হৃদয়বান সাধকের সাধ হয় সকলে এই আনন্দ উপভোগ করুক। তাই ভাইজীর ভাবের আর্তি বাণী রূপে এখানে মূর্ত।

শ্রীমায়ের লীলা মাধুরীর অসাধারণত্ব বোধ করতে গেলে আমাদের ওপর ভাসা দৃষ্টি দিয়ে তা দর্শন করলে ত হবে না। একজন আর একজনকে বলছে দেখ, বাইরে কত আলো। তখন অন্যজন বলছে আজ পূর্ণিমা, চাঁদ উঠেছে, ও আলো চাঁদের আলো। অন্য একজন বলছে চাঁদের ত নিজের কোন আলো নেই সূর্যের আলো চাঁদের ওপর পরে ঠিকরে আসছে। ঠিকমত বলতে গেলে এ আলো সূর্যেরই আলো। ঋষি এসব শুনে বলছেন, শোন সূর্যের আলোও তার নিজস্ব আলো নয়। তারা, বিদ্যুৎ, অগ্নি, সূর্য সকলেই তাঁর বিভাতেই বিভাসিত। ব্রহ্মাণ্ডের সব আলোর আলো তিনিই "তস্য ভাসা সর্বমইদম বিভাতি" (কঠ)। ভিন্ন ভিন্ন আধারে তাঁর প্রকাশই প্রকাশমান। আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণের উপযোগী অনন্ত ভৌতিক রূপ সৃষ্টি করেছেন তিনি যাদের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিভূতি প্রকাশ পায়। আমাদের দৃষ্টি ঐ ভৌতিক রূপকেই সর্বস্ব বলে মানে। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন এ সবার আড়ালে।

ঐতরেয় উপনিষদে ঋষি বলছেন, তিনি "অপরোক্ষপ্রিয়" তিনি লুকিয়ে থাকতে ভালবাসেন।

নিজেকে প্রহ্ন করে আড়ালে রেখে লুকোচুরির মাঝেই যেন তাঁর লীলা আশ্বাদনের আনন্দ, যেন বলেন "মরমী" না হলে কার কাছে নিজের কথা বলব ? কে বুঝবে ? কে স্বাদ নেবে ? কে বোধ করবে ? মরমী হলে বলি।

আমরা যারা সাধারণ "অহংকার বিমুঢ়া কৰ্তা অহম্ ইতি মন্যতে" (গীতা) অহঙ্কার বিমুঢ় হয়ে নিজেদেরই কৰ্তা বলে মানি। বুঝতে পারিনা, হয়ত সারা জীবনে একবারও ভাবি না যে আমাদের প্রবৃত্তির নিয়ামক আমরা নই, নিয়ামক হল প্রকৃতি। আমি ক্ষুধার চেষ্টা করি না কিন্তু আমার ক্ষুধা পায়। আমি ঘুমের চেষ্টা করি না কিন্তু আমার ঘুম পায়। এমন করে কে খাওয়ার জন্যে, ঘুমানর জন্যে, সংসার করার জন্যে আমাকে তড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। খুঁজলে প্রবৃত্তির নিয়ামক প্রকৃতির দর্শন মেলে। সাধকের সাধনা আরও গভীর হলে সে দেখে প্রকৃতিও পরব্রহ্মে অখণ্ড অনুরক্ত থাকার সাধনায় লগ্ন। আরও গভীরে সাধকের দর্শন হয় অচলেরই চল, চলারই অচল। অচল যখন, তখন বলি ব্রহ্ম, চল যখন, তখন বলি প্রকৃতি। শ্রীমায়ের লীলা অচলেরই চল। তিনি চল অচল যুগপৎ। "স এজতি স অনৈজতি" (কঠ)। ভাইজীর বোধে শ্রীমায়ের এই যুগপৎ রূপ বোধ হয়েছিল বলে তিনি আমাদের সাবধান করে বলছেন যে শ্রীমায়ের সঙ্গে ব্যবহারের সময় সাধারণ বুদ্ধিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলোনা, বুদ্ধিকে চঞ্চল হতে দিও না। আমাদের সাধারণ দৃষ্টি প্রকৃতির তিন গুণে বাঁধা। মা আমাদের ত্রিগুণাতীত, প্রকৃতির পারে, ক্রম ব্যবহারের অতীত ; তাই তাঁর কথা হাসি, কৌতুক, চলাফেরা, খাওয়াপরা সব সাধারণের মত দেখালেও বাস্তবিক তা অলৌকিক, অপ্ৰাকৃত। এই অপ্ৰাকৃত লীলার মাধুর্য আশ্বাদন করতে হলে আমাদের শান্ত হতে হবে, অন্তরাবৃত্ত হতে হবে। নয়ন মুদে ভাব দিয়ে তাঁকে দেখার সাধনা করতে হবে। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখে শুনে আমাদের দেখা শোনা যথার্থ হয়েছে জেনে আমরা জীবনে বারবার ঠকি, ইন্দ্রিয় দিয়ে পূর্ণ-দর্শন, পূর্ণবোধ হয় না। ভাব অঙ্গ অজানাই থেকে যায়। ভাবকে ভাব দিয়েই গ্রহন করা যায়, তাই চাই অন্তরাবৃত্ত হওয়ার সাধনা। ঋষি সচেতন করে দিয়ে বলছেন ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বয়ম্ভু বর্হিমুখি করে সৃষ্টি করেছেন বলে ওরা কেবল বাইরেটাই দেখে, ভেতরটা দেখতে পায় না। বাইরে ভেতর এক করে না দেখলে সত্যকে পূর্ণরূপে দেখা হয় না। বাইরে যতটুকু দেখা যায়, তা বড়ই সামান্য দর্শন, আর অনেক সময়ই তা আমাদের ভ্রান্তির সৃষ্টিকারী। একজন মুক্ত হয়ে বসে রাতের আকাশে তারা দেখছে। বিজ্ঞানী এসে হেসে বলছেন —যে তারাটিকে এত মুক্ত হয়ে তুমি দেখছ তার জন্ম হয়েছিল বহু বহু কাল আগে। সে বহুকাল আলো দিয়ে আজ সে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে। আজ সে মৃত। ও এত দূরে ছিল যে তার আলোটা বহুকালধরে বিশাল গগনের লক্ষ লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করে আজ পৃথিবীর বুকে এসে আছড়ে পড়ছে। সেই আলোকে তুমি আজ দেখছ। বাস্তবিক যে কালের গর্ভে মৃত তাকে আজ জীবন্ত বলে প্রত্যক্ষ করছ। তাহলে দেখ কি আছে, কি নেই, কি মিথ্যা, কি সত্য, তা বুঝতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে চলা বিভ্রান্তিকর।

তাহলে প্রশ্ন এখন এই যে দৃষ্টির পূর্ণতার সাধনা শুরু আমরা করব কেমন করে ? শান্তি বলছেন— আদৌ শ্রদ্ধা, অন্তরকে শ্রদ্ধার বিশ্বাসে আসুরিত করে পথ চলা শুরু করতে হবে। তিনি ত ভগবান, তিনি ত সব জানেন, আমাদের কোন ভুল হলে তিনি আবার আমাদের সুপথে চালিত করে নেবেন।

শ্রদ্ধাশীল হৃদয় দেখে ও ত মাটি নয়, মায়েরই এক রূপ। ও জড় নয়, চেতনের জমাট মূর্ত রূপ। ওর বৃকে একটা বীজ ধরে দিলেও কেমন সুন্দর করে তাকে পত্রে, পল্লবে, ফুলে, ফলে ফুটিয়ে তোলে। সাধক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে মাটিকে মা বলে প্রণাম করে। শ্রদ্ধাশীল সাধক আগুনকে শুধু আগুন দেখে না। সে তাকে দেখে এক উর্ধ্বমুখী চেতনার ধারা রূপে। আগুনের শিখা সদাই উর্ধ্বমুখী। সাধক অন্তরে অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করে—হে দেব তোমার মত আমার ভাবকে কর্মকে সদাই উর্ধ্বমুখী কর। এমন করে শ্রদ্ধাই আমাদের চেতনাকে বিশুদ্ধ করে তোলে, সাত্ত্বিক করে তোলে, যা উর্ধ্ব তাই সাত্ত্বিক, যা নিম্নে তাই তামসিক, যা সাত্ত্বিক তা-ই ব্যপ্ত, যা তামসিক তা-ই সঙ্কুচিত। আবার যা যতব্যপ্ত তা তত সূক্ষ্ম, যা যত সঙ্কুচিত তা তত স্থূল, যা সূক্ষ্ম তারই ক্ষমতা আছে অন্যের গভীরে অনুপ্রবেশের। মাটির থেকে জল সূক্ষ্ম ও ব্যপ্ত, জলের থেকে তেজ তত্ত্ব আরও সূক্ষ্ম আরও ব্যপ্ত। তেজের থেকে বায়ু এবং বায়ুর থেকে আকাশ আরও সূক্ষ্ম আরও ব্যপ্ত। আকাশ কি? না অবকাশ, মহাশূণ্য, মায়ের ময়রূপ, সব রূপের সব নামের লয় করিয়ে অরূপ হয়ে রয়েছেন তিনি। তাঁর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির সব রহস্য। ঐ আকাশের সঙ্গে ভূমার সঙ্গে চেতনাকে এক করে ফেলতে হবে। তখনই সাধকের বোধ অনুভব জগতের সব রহস্যের মূল দর্শন করার যোগ্য হয়। কি করে নিজের ক্ষুদ্র চেতনাকে ভূমাবোধের সঙ্গে এক করব? অহরহঃ ভূমার ধ্যানেই তা ভূমার স্বরূপ পাবে। মা ত তাই বলতেন— "কিছু না পারলে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবি"।

আমাদের সঙ্কুচিত দৃষ্টি সম্বন্ধে ভাইজী সচেতন ছিলেন। তাই আমাদের বারবার সাবধান করতেন যে শ্রীমায়ের সঙ্গে কথার সময় ব্যবহারের সময় সাধারণের দৃষ্টিতে তা দেখনা। শ্রীমা স্বয়ং ভগবান। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। তাঁর প্রতিটি বাণী প্রতিটি ভাব ও কর্মের যা কিছু প্রকাশ সবই এ জগতের কল্যাণ মঙ্গলের জন্যে। আনন্দের জন্যে। মা ত তাই বলেন— "এ শরীর ত একটা পুতুল, তোরা যেমন খেলতে চাস এ তেমনি ধারা খেলতে থাকে। আমার নিজের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আগেও ছিলনা, এখনও নাই, পরেও হইবে না। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে বা পাইবে সবই তোমাদের কল্যাণের জন্যে। এ শরীরের নিজস্ব যদি কিছু বলিতে চাও তবে জগৎময় সবই ইহার নিজস্ব"। কালাতীত তিনি। ভক্তদের প্রার্থনায় কালের গর্ভে মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করে এবারে প্রকাশ হয়েছেন মাত্র। তাঁর কাছে মূর্ত অমূর্ত সবই সমান। তিনি যুগপৎ মূর্ত, অমূর্ত ও আরও কত কি, তা তিনিই জানেন।

ব্যবহারিক দিক দিয়ে দেখা গেল লোক লৌকিকতার কারণে বা অন্যসময়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ কাউকে মা আর প্রণাম করছেন না। এ প্রসঙ্গে মা বলছেন, "প্রথমে একটা কথা হল যে আমা হতেই সব। কাকে প্রণাম করবো? এই রকম ভাবটাই বিশ্বব্যাপক, যা কিছু প্রকাশ, অপ্রকাশ সব এই হইতেই (নিজের শরীর দেখাইয়া)। যত্র সাকার, নিরাকার, সগুণ, নিগুণ, রূপ, অরূপ, সর্বনাম, সর্বগুণ, নাই ও আছে ও আবার আছেও না, নাইও না, যা কিছু তোমরা বল। কিছু বললেই কিন্তু কিছু বলা হয় না, ব্যক্ত অব্যক্ত এইযে (আবার নিজ শরীর দেখাইয়া) তবে প্রণাম কোথায়? আবার প্রণাম ইত্যাদি যা সবই যে হয়ে যাচ্ছে। ইহাতেই যে, এই যে আমিই আছি, আর কিছুই নেই, এও ত ভাষায় বলা হচ্ছে। এ ছাড়া বুঝবার বা প্রকাশ করবার অন্য উপায় কি?"

বাইরের দিক থেকে আমরা আবার দেখছি, মা নিজের হাতে খান না, মা বলছেন, "হাতে খাওয়া বন্ধ হল, দেখি সবই যে আমার হাত। এত হাতে ত খাওয়া হচ্ছে। আবার যেন এক সময় ভেঙ্গে গেল, হাতে খাওয়া আরম্ভ হল। কিন্তু ঠিক ঠিক খাওয়া হয় না বলে তোমরা খেতে দিলে না।"

তা হলে বারবার দেখছি যে শ্রীমায়ের যে কোন ব্যবহার বাইরের দিক থেকে আমাদের চোখে অস্বাভাবিক দেখালেও তার মূলে রয়েছে তাঁর স্বরূপ স্থিতির ব্যবহার। মায়ের ভাষায়, "স্বভাবের ক্রিয়া আপনাকে নিয়া আপনাই ত"। এই কারণেই ভাইজীর সাবধান বাণী, নিজেকে হারিয়ে ফেল না, চঞ্চল হয়ে না। শান্ত হয়ে গভীরে ডুব দিয়ে এই অপ্রাকৃত লীলা মাধুরী দর্শন করে কৃতকৃত্য হও।

কোনোপনিষদে ঋষি বলছেন, "যদ্ বাচা নভ্যদিতং যেন বাগ্ অভ্যুদ্যাতে"— যা বাক্ দ্বারা অভিব্যক্ত হয় নি, যা দিয়ে বাক্ অভিব্যক্ত হয়, সেই ব্রহ্ম এখানে লীলা তনু পরিগ্রহ করে কথা বলছেন। "যত্ চক্ষুশা ন পশ্যতি যেন চক্ষুষি পশ্যতি।" তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। যার দ্বারা চোখেরা দেখে সেই এখানে চক্ষুদ্বান হয়ে আমাদের সামনে হাসছেন। যিনি অপানিপাদং, তিনি এখানে চলাফেরা করছেন, কাকে মালা দিচ্ছেন, কাকে কাপড় দিচ্ছেন, কার মাথায় টোকা দিচ্ছেন। যিনি বিশ্বতঃ চক্ষু, তিনি এখানে বলছেন— "কে আছিস—চশমাটা দেত"। যিনি সকলের অন্তর্যামী, সকলের মনেরও মন, বুদ্ধিরও বুদ্ধি, তিনি কাছে গেলে জিজ্ঞেস করছেন, কেমন আছ? তখন তাঁর এক প্রশ্নেই বুদ্ধি বিকল হয়ে, তাঁর স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে, তিনি যেন জানেন না এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে নিজের অবস্থা, পারিপার্শ্বিকের অবস্থা বিস্তারিত জানাচ্ছি। অপরোক্ষপ্রিত তিনিও নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে লীলা করছেন, বলছেন—"ও তাই বুঝি" ?

মা গো মা ধন্য তোমার সৃষ্টি, ধন্য তোমার লীলা, ধন্য তোমার মায়ার বন্ধন ও তাঁর উন্মোচনের খেলা। ধন্য তোমার জ্যোতিষ, ধন্য তোমার তাঁর ওপর কৃপা। মা গো আমাদের অন্তরের নিবেদন তুমি করুণা করে আমাদের দিকে তোমার খেয়ালটি দাও, যাতে আমাদের দৃষ্টি ও ভাব তোমার স্বরূপের লীলা মাধুরী দর্শনের যোগ্য হয়। জয় মা।



"দুনিয়াতে কিছু না কিছুর জন্য সকলেই পাগল। কেহ কম, কেহ বেশী। ভগবানের লীলা কেমন মজার। কেমন পাগলখানা বানাইয়া রাখিয়াছেন। নিজেকে নিয়াই নিজের মৌজা।"

—শ্রীশ্রী মা

যতো মানুষ ততো পথ

সংকলক — জগদীশ্বর পাল

"যতো মত ততো পথ" — এই সর্বজনীন বাণী উচ্চারিত হয়েছিল যুগাবতার ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের শ্রী মুখে। এই কথামৃতের মূর্ত বিগ্রহ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা। মায়ের সুদূর প্রসারী জীবনবেদে "যতো মত ততো পথ" সূত্রটি নূতন বেশে রূপায়িত হয়েছে— "যতো মানুষ ততো পথ"।

'পথ' অর্থে গন্তব্যস্থানে যাবার রাস্তা। 'মত' অর্থে কোনও ধর্মগত বা আদর্শ-মূলক মতবাদ। মা বলতেন, ঠিক ভাবে যে কোনও পথ ধরতে পারলে, যথাসময়ে পৌঁছানো যায় গন্তব্য স্থানে—মায়ের পরিভাষায় 'চরম-পরম' এ। বিশেষ জোর দিয়ে বলতেন মা, 'চরম পরম' কে পেতে হলে শুধু বাইরে-বাইরে পথ চললে হবে না; খুঁজতে হবে নিজের অন্তরে। সেই অন্তর্যামী ভগবান সকলের হৃদয়ে আছেন অন্তরগুরুরূপে। ভগবানকে জানা মানে নিজেকে জানা, নিজেকে জানা মানে ভগবানকে জানা। সকল পথ, সকলমত, সকল বাদানুবাদের উর্ধ্বে চরম-পরম।

প্রত্যেক ধর্ম মত কতকগুলি বিধিনিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দান করে, কোনও প্রতীকের আশ্রয়ে চরম-পরম অভিমুখে ক্রমোন্নতির সহায়ক সোপানের নির্দেশ দিয়ে থাকে। মা একটি উপমা দিতেন—ছাদে উঠবার জন্য ধাপ দরকার, ধাপ কিন্তু ছাদ নয়। কোন ধাপে থেমে গেলে ছাদে পৌঁছানো যাবে না। পথিমধ্যে গতিরোধ হলে পথিক হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট। চরম-পরম যেন ছাদ, বিভিন্ন ধর্ম যেন বিভিন্ন দিক দিয়ে ছাদে উঠবার সিঁড়ি। যার যেমন স্থিতি, তার তেমন পথ। প্রত্যেক সিঁড়ির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। সব সিঁড়ির শেষে ছাদ। ছাদে পৌঁছাতে পারলে সব পথিকের একই অভিজ্ঞতা—অবাধ উন্মুক্ত, উদার আকাশের প্রত্যক্ষ দর্শন। সে দর্শনে সকলের সমান অধিকার, সঙ্কীর্ণতার অবকাশ নেই।

মা বলতেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে চলো, গুরুদত্ত প্রতীক অবলম্বনে সাধনা করো। যে কোনও পথ হোক, যে কোনও প্রতীক হোক, প্রয়োজন পথিকের সরল বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তার ধৈর্য আর তিতিক্ষা।

চরম-পরমে পৌঁছবার পথ অসংখ্য — শুধু কয়েকটি ধর্ম বা মতবাদের মধ্যে সীমায়িত নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত মানুষ আছে, প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে বিশেষ বিশেষ স্বকীয় পথ। সমধর্মাবলম্বী সমুদায় সাধকদের পথে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য বা একরূপত্ব থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জনের ব্যক্তিগত পথে যে বৈশিষ্ট্য, অপর কারও ব্যক্তির পথের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ এক হতে পারে না।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে মানুষের প্রকৃতি গঠিত। এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে। যার যেমন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, তদনুযায়ী তার নিজস্ব

পথের প্রয়োজন না হয়ে পারে না। প্রত্যেকেরই থাকে স্বতন্ত্র রুচি, বাসনা, যোগ্যতা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি। এই সমস্ত জড়িয়ে উঠে এক একটি মানুষের আধার। আধার ভেদে হয়ে থাকে অধিকার ভেদ।

অধিকার ভেদ তত্ত্বকে মা যথাযথ মর্যাদা দিতেন এবং এ কথাও বলতেন যে একটি বিষয়ে সকলের সমান অধিকার, কোন ইতর-বিশেষ নেই, চরম-পরম এর সঙ্গে সকলেই জন্মগত অধিকারে সংযুক্ত। প্রত্যেকের সঙ্গে চরম-পরম - এর যে সন্মিলন, তা অবিচ্ছেদ্য, তা গুণাগুণের অপেক্ষা রাখে না। এই সত্যটি অজ্ঞান মানুষ জানে না। অজ্ঞান দূর হলে সে দেখতে পায় যে চরম-পরম এবং সে একই। যে পথ অনুসরণ করলে চরম-পরম — এ পৌঁছানো যায়, তার সন্ধান রয়েছে "যতো মত ততো পথ" এই সূত্রে।

এই সূত্রটির একটি জ্যামিতিক উপমা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য উপমা সর্বাঙ্গীন হয় না, কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর হতে পারে। যা হোক, কল্পনা করা যাক যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি অখণ্ড-মণ্ডলাকার অনন্ত গোলক, তার কেন্দ্রবিন্দু যেন চরম-পরম। আর সেই চরম-পরম এর আশ্রয়ে সকল দিকে (পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, উর্ধ্বে এবং নিম্ন দিকে) যেন রয়েছে অসংখ্য সমকেন্দ্রিক বৃত্ত এবং প্রত্যেক বৃত্তের পরিধিতে আছে অসংখ্য বিন্দু। ধরা যাক যে সেই বিন্দুগুলি যেন এক-একটি মানুষ এবং প্রত্যেকটির লক্ষ্য সেই গোলকের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ চরম-পরম।

কেন্দ্রবিন্দুগামী প্রত্যেক বৃত্তের শুভ যাত্রা শুরু হতেই হবে সেই স্থান থেকে, যেখানে সে অবস্থিত। তাকে অনুসরণ করতেই হবে সেই পথটি, যে পথ তাকে সরাসরি পৌঁছে দেবে গন্তব্য স্থানে অর্থাৎ কাল্পনিক কেন্দ্রবিন্দুতে। কেন্দ্রবিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও দিকে যদি কোনও বিন্দু চলতে থাকে, সে কোনও দিন সোজাসুজি কেন্দ্রবিন্দু পৌঁছাতে পারবে না। পথভ্রষ্ট হয়ে সে চলে যাবে অন্য দিকে। কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ চরম-পরম আকর্ষণ করে সমস্ত বিন্দুকে অর্থাৎ জীবকে। সেই সমস্ত বিন্দুর প্রতি রয়েছে অপর একটি বিরোধী শক্তির আকর্ষণ। তার নাম মায়া। মায়া জীবকে ভ্রান্তিবিলাসে বিভ্রান্ত করে। মায়ার খেলা ত্রিগুণ নিয়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। চরম-পরম ত্রিগুণাতীত। মায়া জীবকে সংসার প্রপঞ্চে আবদ্ধ করে, ভগবদ্ বিমুখী করে এবং দেহাবসানের পরে তাকে ফিরিয়ে আনে মরজগতে— মা বলতেন "রিটার্ন টিকেট কাটা"। এই মায়া দুস্তরা। মায়ার পারে যেতে পারে সেই জীব, যে "চরম-পরম" এর শরণাপন্ন হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন :-

"দেবী হেম্যা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গীতা ৭।১৪

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া অতিক্রম করা কষ্টকর। কিন্তু যাঁরা ধর্মার্থম্ পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে আশ্রয় করে এবং অন্য প্রকার সাধনের উপর নির্ভর করে না, তরাই কেবল এই দুর্জয়ের মায়া উল্লীর্ণ হতে পারে, অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হয়।



শেষ প্রণাম

[দুই]

— স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

১৯৭৭ সন। শ্রী শ্রী নরেন্দ্রনাথ মহারাজের মহাসমাধি বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শ্রী শ্রীমা দশদিন দেওঘরে থেকে ফিরে যাবার অল্প কিছুদিন পরেই বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রী শ্রীমা তখন কনখলে। সেবারও অমলদাকে নিয়ে শ্রী শ্রীমাকে দেখতে কনখলে গেলাম। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ, তাই বাইরেই উঠলাম। আশ্রমে দেখতে গেলাম শ্রীশ্রীমাকে। আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে রেখে তক্ষনি অমলদাকে পাঠিয়ে আমাদের জিনিষপত্র আনিয়ে শ্রীশ্রীমা যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়িরই উপরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ। তবু সদা তৎপর, তবু সদা ব্যস্ত। আমাদের সাথে সবই ছিল। তবু শ্রীশ্রীমা নূতন কঞ্চল, তেল সাবান এমনি আরও কতকি মাঝে মাঝেই আমাদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। প্রসাদের ব্যবস্থা? সে সব উপকরণের কথা না বলাই শ্রেয়। টিকিট কাটাই ছিল। দুদিন থেকেই ফেরার পথে পা বাড়লাম। শ্রী শ্রীমার কতই না ইচ্ছা ছিল আরও থাকি। বার বারই বললেন—একবার এসে তিনদিন থেকে তিনরাত্রি কাটিয়ে যেও। শ্রদ্ধায় তা মাথা পেতে নিয়েছিলাম। ইচ্ছাও ছিল, প্রয়াসও করেছি। কিন্তু "তুমি জান দেবি। সাধ ছিল যত সাধ্য ছিলনা তত"। তাই আজ ১৯৮২ খৃষ্টাব্দেও তা রূপায়িত হলনা। কিন্তু এবার সংকল্প করেই এসেছি। তিনদিন তিন রাত্রি কাটিয়ে যাব। পত্রে বারবার পানুদাকেও সে কথাই লিখেছি। লিখেছি ২৮শে আগষ্ট রাতের গাড়িতে ফিরব। ফিরব লক্ষ্মী। ২৯শে আগষ্ট সকালে লক্ষ্মী পৌঁছাবার কথা। সেখানেও জানিয়েছি শ্রীশ্রীমার অনুমতি পেলে তবেই ফিরব।

কিন্তু বিকাল গড়িয়ে আসতে না আসতেই ফেরার কথা মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। মনে হতে লাগল শ্রী শ্রীমা বিশেষ অসুস্থ। আমাদের করণীয় কিছুই নেই। অথচ থেকে শুধু আশ্রমিকদের তৎপরতা বাড়ানো। সন্ধ্যায় আশ্রমে গেলাম। স্বামীজী ও পানুদার কাছে শ্রী শ্রীমায়ের সংবাদ নিলাম। তাঁদের সাথে ও অন্যান্যদের সাথে কথাও হল। ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহোদয়ের সাথেও কথাবার্তা হল। নৈশ প্রসাদান্তে ফিরে এলাম আবাসস্থলে। সমস্ত রাত ধরে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীবাবাকে ঘিরে ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই মনের কোণে ভিড় করে রইল।

২৫শে আগষ্ট সূর্য উঠেছে পুর্বের আকাশ রাঙিয়ে। আমার মন রাঙিয়ে রয়েছে শ্রীশ্রীমারই রঙে। একটু বেলা বাড়তেই আশ্রম আঙ্গিনায় এলাম। স্বামীজী ও পানুদার সাথে দেখা করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সামনের বারান্দায় বসে বসে তাঁরই কথা ভাবতে লাগলাম। কি মিষ্টি সে ভাবনা। কিন্তু তারই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠে কি যেন একটা বিবাদে সুর। ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়—বিদায় গোধূলি যেন ধূলায় ছিন্ন দল ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। মনে হয় শ্রীশ্রীমা কত বলেছেন তিনদিন তিনরাত থাকতে। কিন্তু এত দিনেও সময় হলনা। আজ সময় করে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি কিন্তু শ্রীশ্রীমার আজ আর সময় নেই। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমোদন সাপেক্ষে লক্ষ্মী ফেরার ভাবনা ত্যাগ করে অমলদাকে পাঠালাম দেবাদুন স্টেশনে

আমাদের ২৮শে আগষ্ট লঙ্কো ফেরার টিকিট করতে। আমি ও অরুণদা বসে রইলাম শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সামনের বারান্দায়। শ্রীশ্রীমা ঘরে। আমরা বাইরে। আমাদের সমস্ত মন প্রাণ কিন্তু শ্রীশ্রীমায়েরই সাথে একাকার হয়ে রয়েছে।

বিশ্বজী আমাকে ও অরুণদাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। আজ ঘরের মধ্যে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের খাটখানা পূর্ব-পশ্চিম করে রাখা। শ্রীশ্রীমা তাতেই শান্ত সমাহিত হয়ে, নিখর, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ হয়ে আছেন। মুখখানি সৌম্যতা, প্রশান্ততার প্রতিমূর্তি। চোখ দুটি আমাদের চোখে। প্রণাম করলাম। মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আসনে উপবেশন করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শকৃত ফল আমাদের হাতে দেওয়া হল। কিয়ৎকাল বসে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের পরিচর্যার অসুবিধার কারণ হতে পারি ভেবে উঠে দাঁড়লাম। শ্রীশ্রীমায়ের চোখ দুটো ছল ছল জলভরা। ক্রমে নেমে এল চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা। আমার মনের বাঁধন আগেই ভেঙ্গেছিল। এবার হৃদয় ভরে কান্না এল। চোখ ভরে জল। তবু নিজেকে সংবরণ করলাম। আজ যে কান্নার দিন নয়। অনেক ভেবেছি, অনেক কঁদেছি। অনেক বিদায়ের মধ্যে আজ শেষ বিদায়ের দিন। অনেক প্রণামের মধ্যে এখন শেষ প্রণামের ক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের কোণে বার বার এই কথাগুলোই ভীড় করে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল যদি কোনদিন শ্রীশ্রীমায়ের শেষ প্রণামের স্মৃতিচারণ করতে বসি বা লিখতে বসি তবে এই হবে মোর শেষ প্রণামের শেষ শুভ ক্ষণ। শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকারা শ্রীশ্রীমার অশ্রুবিন্দু মুছিয়ে দিলেন। আরও একটু পরে নয়ন ভরা জল নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে মুখ রেখে শ্রীশ্রীমায়ের চোখে চোখ রেখে ঘরের বাইরে এলাম।

যদি কেহ শুধায় আমারে কি কারণ, কেন ঐ সময় আমার মনে এই কথাগুলো ভীড় করে এসেছিল। কেন শেষ প্রণামের স্মৃতিচারণের কথা সেদিন সেই ক্ষণই ভাবছিলাম, উত্তর জানা নেই। যেমন আজও উত্তর জানিনা কেন শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের মহাসমাধিলাভের ঠিক পূর্বমূহূর্তে কৈবল্য ধামের হলে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে বিছানায় সমাসীন শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করতে করতে কৈবল্যধামের সামনের মাঠের তাপদন্ধ দোলায়িত শ্যাম কার্টি নখর লংকা গাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয়েছিল আগামীকাল সকাল আটটায় ঐ দোলায়িত লংকাগাছগুলোর ওখানেই শ্রীশ্রীবাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। হয়েছিলও তাই।

দুপুরে আশ্রমেই প্রসাদ নিলাম। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ তবু প্রসাদের উপকরণ অনেক। বোম্বে থেকে ডাক্তার শেঠ শ্রীশ্রীমাকে দেখতে এসেছেন। সত্বীক তিনি, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘের সভাপতি বি.কে.শাহ, লীলা বহিনও আমাদের সাথেই প্রসাদ নিলেন। অমলদা আমাদের ২৮শে আগষ্ট লঙ্কো ফেরার টিকিট করে এনেছেন। আমরাও ইতিমধ্যে স্থির করেই ফেলেছি আগামী কালই সকালে হরিদ্বার ফিরে যাব। দুতিনদিন সেখানেই কাটিয়ে লঙ্কো হয়ে দেওঘর ফিরে যাব। আমার মনের ভাবটা শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার মধ্যে আশ্রমিকদের আর বিব্রত না করা। সর্বোপরি যে কথাটা বিগত বেশ কয়েক বছরেও রূপায়িত করতে পারলাম না, তা আজ এ অবস্থায় রূপায়িত হলেও রূপায়িত হতে পারে, কিন্তু আজ আর তার কোন

মূল্যায়ন বা সার্থকতা নেই। মনে হলো যা অপূর্ণ বলো তা অপূর্ণই থাক। এই অপূর্ণতাই যেন একদিন আমার জীবনে শ্রীশ্রীমাতৃপ্রসাদে পরম পরিপূর্ণতা এনে দেয়।

অমলদা এবং অরুণদা বিকালেও একবার দেৱাদুন সহরে গেলেন। আমি একলা ঘরে শ্রীশ্রীমায়েরই ভাবনায় রত আছি। স্মৃতির পাতায় জাল বুনি। চোখের সামনে ভেসে উঠে অতাজ্জ্বল একটা ছবি। বাংলার অখ্যাত নদীমাতৃক পল্লীতে যাঁর যাত্রা শুরু, তিনিই আজ নগাধিরাজ-হিমালয়ের কোলে মহাপ্রস্থানের আসন পেতেছেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আমরা একবার আশ্রমে গেলাম। স্বামীজী ও পানুদাকে আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানালাম। জানালাম কালসকালেই আমরা হরিদ্বার ফিরে যাচ্ছি। স্বামীজী ও পানুদা বার বার থাকার কথা বললেন। স্বামীজী বললেন—এখানে থাকলে তো দিনে অন্ততঃ একবার মাতৃদর্শন হচ্ছে। তাছাড়া তোমরা থাকায় মায়ের খেয়ালটা মাঝে মাঝে এদিকে থাকছে। কিন্তু মা যাদের রাখবেন না তারা থাকবে কি করে? তাই আমরা চলে আসার কথায়ই অটুট রইলাম। রাতের প্রসাদ নিয়ে অবাসস্থলে ফিরে আসার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বানে শেষ দর্শনের জন্য শেষবারের মত পানুদা ও উদাসজীর সাথে মাতৃসমীপে উপনীত হলাম। ঘরের মৃদু আলোটা পরিণত হলো উজ্জ্বল আলোতে। প্রণাম করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছাকাছি মুখটা রাখলাম। হাত দুটো বিছানারই উপর। চেয়ে রইলাম মুখ পানে। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিও আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ভক্তগণ আমাদের হাতে শ্রীশ্রীমাতৃপ্রসাদী কাপড় ও ফল প্রভৃতি দিলেন। আবার প্রণাম করলাম। আমার কাপড়টা শ্রীশ্রীমা দেখতে পাননি। তাই বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সমস্ত মুখটা ও হাত দুটো দোলায়িত হয়ে উঠল। আধো আধো টুকরো টুকরো কথায় কাপড় কথাটির প্রথম চরণটা উচ্চারণ করলেন। ভক্তজন জানালেন কাপড় দেওয়া হয়েছে। আমার হাতের দিকের সুন্দর কাপড়খানা শ্রীশ্রীমায়ের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। শ্রীশ্রীমা হাত দুটো অল্প একটু তুলে কাপড়টা স্পর্শ করলেন। তারপর আবার শান্ত সমাহিত হয়ে শুয়ে রইলেন। চেয়ে রইলেন আমাদেরই দিকে। পানুদা শ্রীশ্রীমায়ের কানের কাছে মুখ রেখে বললেন—“সুধীর ভাই থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু মার শরীর অসুস্থ বলে চলে যাচ্ছে”। আমি একটু অপ্রস্তুতই বোধ করলাম। শ্রীশ্রীমা অপলক নেত্রে চেয়েই রইলেন। পানুদা আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—আপনি মাকে কিছু বলুন। কথাটা শুনা মাত্র আমি যেমন আরও অপ্রস্তুত হলাম, তেমনি ইতস্তত বোধ করতে লাগলাম। শ্রীশ্রীমাই ত আমাদের বলবেন, আমি শ্রীশ্রীমাকে কি বলব? মূহূর্ত মাত্র চুপ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের আরও কাছাকাছি মুখটা রেখে আমার অজান্তেই বলে ফেললাম—‘মা তুমি সুস্থ হয়ে উঠ; আবার আসব।’ শ্রীশ্রীমা হাত দুটো জোড় করে অল্প একটু উর্ধ্বে তুলে স্নিগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে আমার দৃষ্টিকে উর্ধ্বপানে আকর্ষণ করলেন। তারপর আবার শান্ত সমাহিত ভাবে শুয়ে শুয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমাকে ‘তুমি’ বলে প্রথম ও শেষ সম্বোধন।

শেষ বিদায়ের স্মৃতি নিয়ে ‘যা চেয়েছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নেই’— একথা ভাবতে ভাবতে আবাসস্থলে ফিরে এলাম। একথা ভাবতে ভাবতেই শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠলাম। গাড়ি এল।

গাড়িতে মালপত্র উঠল। আশ্রমের গেটের সামনে এসে গাড়ি থামল। পানুদা উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে নীচে নেমে এলেন। নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমায়ের গত রাতের শারীরিক অবস্থার কথা জানতে এলাম। শুনতে-পেলায় রাতটা একটু বেশ ভালই কেটেছে। পানুদাকে বললাম— শ্রীশ্রীমা সুস্থ হয়ে উঠুন এই আশা নিয়েই আমরা ফিরে যাচ্ছি। সামনের হলে শ্রীশ্রীমায়ের আসন ও প্রতিকৃতিতে প্রণাম করলাম। পানুদাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। গাড়িতে এসে বসলাম। গাড়ি আশ্রম ছেড়ে দেবাদুন রেলস্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। মন পড়ে রইল ছোট্ট একটা ঘরে। চোখের সামনে ভেসে রইল সেই ঘরের শয্যায় শায়িত শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত সমাহিত মুখটি। আর নয়নে নয়ন রাখা তাঁর স্নিগ্ধ মধুর চোখ দুটি।

হরিদ্বার। আর্য সমাজ মন্দির। দুদিন এখানেই কাটালাম। অরুণদা এই প্রথম হরিদ্বার এসেছেন। তাঁরা একটু এখানে সেখানে ঘুরেও বেড়ালেন। গতকাল বিকালে কিছু সময়ের জন্য হৃষীকেশ ও লছমনঝুলায় গিয়েছিলাম। আজ ২৮শে আগস্ট। লঙ্কো ফেরার দিন। সকাল বেলায় সূর্যের কিছুটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে হরিদ্বারের পথে প্রান্তরে, গঙ্গার জলে আর দূর পাহাড়ের কোলে। আমি আপন মনেই বসে আছি আর্য সমাজ মন্দিরের গঙ্গার ঠিক তীরবর্তী উপরের ঘরে। দৃষ্টি দূর আকাশের দিকে আর সামনের চন্দ্রীপাহাড় ও নাম-না-জানা হিমালয়ের ছোট বড় গিরিশৃঙ্গের প্রতি। এমন সময় আকস্মিকভাবে বারান্দার পাশে জানালায় কারো উপস্থিতি অনুভব করলাম। দৃষ্টি সেদিকে একটু ফিরলাম। চেয়ে দেখি আর্য সমাজ মন্দিরের ম্যানেজার। তাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে একটু বিস্মিতই হলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মৃদু কণ্ঠে জানালেন— 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কা নিধন হো গয়া'।—হাতে একটা স্থানীয় সংবাদ পত্র। কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত সন্তায় যেন একটা ধীর ও মৃদু আলোড়ন বয়ে যেতে লাগল। এক মুহূর্ত পূর্বেও যা ছিল, এই মুহূর্তেই তা নেই। মা নেই।

দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলাম। খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিলাম। প্রথম পাতার মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমার গতকাল রাত আটটায় মহাসমাধি লাভের সংক্ষিপ্ত একটু খবর। ম্যানেজারজী বললেন— আমাদের সাথে শ্রীশ্রীমার একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে বলেই সংবাদটা আমাদের জানাতে এসেছেন। পাণের ঘরে অবস্থানরত অমলদা ও অরুণদাকে ডাকলাম। সংবাদটা জানালাম। সকলের মনই বেদনায় ভারাক্রান্ত। অমলদা ও অরুণদা পরবর্তী বিশদ সংবাদের জন্য ও প্রয়োজনে তখনি দেবাদুন যাবার ব্যবস্থা করার জন্য কনখল আশ্রমে চলে গেলেন। আমি রয়ে গেলাম বিজন ঘরে। আমার সমস্ত সন্তায়, আমার মনের সমস্ত আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে, মা নেই। মা চলে গেছেন। এতদিন যেমন করে পেতাম তেমন করে আর কোনদিন পাব না।

অমলদা ও অরুণদা কনখল আশ্রম হতে সংবাদ নিয়ে ফিরলেন। দেবাদুন যাবার প্রয়োজন হলনা। শ্রীশ্রীমার দেহ কনখল আশ্রমেই নিয়ে আসা হচ্ছে। এখানেই শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করা হবে।

বেলা এগারটার মধ্যেই আমরা কনখল আশ্রমে পৌঁছলাম। এতদিনের পরিচিত আশ্রমটা

যেন আজ অন্য সুরে বাধা। যেদিকে তাকাই সেদিকেই মনে হয় সব আছে নেই শুধু মা। এই আশ্রমে, আর শত চরণ চিহ্নের মধ্যে তাঁর পায়ের চিহ্ন আর কোনদিন এখানে পড়বেনা।

অপরাহ্নে প্রায় দুটোয় শ্রীশ্রীমার দেহ শোভাযাত্রা সহকারে আশ্রম দ্বারে এসে পৌঁছাল। হলের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা সম্পন্ন হয়েছিল ও বর্তমানে শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে সেখানেই শ্রীশ্রীমার পাঞ্চভৌতিক দেহ সংস্থাপিত হল। সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করতে লাগলেন। আমরাও বিনম্র চিত্তে প্রণতি জানিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তের নাতিদূরে বসে রইলাম। 'স্মৃতি শুধু পড়ে আছে ভারমুক্ত সে এখানে নাই'।

সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এমনি করেই কাটল। তারপর ফিরে এলাম আবাসস্থলে। স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েই সমস্ত রাতটা কেটে গেল। পরদিন বেলা এগারটার সময় গেলাম আবার কনখল আশ্রমে। বিপুল জনতার ভীড়। প্রণতি জানিয়ে জনতার ভীড়েই মিশে রইলাম। প্রণতি জানাতে এলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সময় হল শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করার। ভক্তজনের আকুলতার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীশ্রীমাকে মহাসমাধিস্থ করা হল হলেরই বাইরে উত্তর প্রান্তে। জনস্রোত মিলিয়ে গেল। প্রায় শূন্য প্রাঙ্গণে আরও একটু সময় কাটলাম। তারপর অশ্রু সিক্ত মৌন বেদনায় শেষ বারের মত কনখল আশ্রম প্রাঙ্গণ হতে বিদায় নিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি প্রণতি জানিয়ে গঙ্গাজলে প্রদীপযুক্ত পুষ্পভেলা ভাসলাম। অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। শ্রীশ্রীমার মহাসমাধি লাভের পর আমরা কেউ কিছু গ্রহণ করিনি। আজও একাদশী। তাই কিছুটা দুধ নিয়ে আমরা রাতের গাড়িতে লক্ষ্মী অভিমুখে রওনা হলাম। গাড়ি চলছে। জানালার পাশে বসে আমিও আনমনা হয়ে স্মৃতির পাতায় ভেসে চলেছি। বার বারই মনে হতে লাগল—জীবন যাঁকে নির্মালা হতে আনন্দময়ীতে পরিণত করেছে মরণ তাঁকে আনন্দময়ী হতে বিশ্বজননীতে পরিণত করেছে।



"মানুষ যে অভাব রূপেতে প্রকাশিত। অভাবের চিন্তাই করে—অভাবই প্রাপ্ত হয়। স্বভাবের চিন্তা করা।
নতুবা অভাব—অক্রিয়া—অগতি—দুর্গতি—মৃত্যু।"

—শ্রীশ্রীমা

আমার মা আনন্দময়ী

[২]

— 'বিশুদ্ধা'

এই সময় কাশীতে দেবনাথপুরায় একটি ভাড়া বাড়ীতে স্বামী অখন্ডানন্দজী ও স্বামী উমেশানন্দজী কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়ে থাকতে শুরু করেন। বিবেকদি, বিন্দুদি, ক্ষমাদি, সুরবালাদি, তারাদিরা ছোট ছোট মেয়েদের দেখাশুনা করতেন। তখন কন্যাপীঠে গঙ্গাদি, যমুনাদি, চন্দনদি, পবিত্রাদি, অঞ্জলিদি, রমাদি, শুদ্ধাদি প্রভৃতি ছিল। আমরা কাছেই থাকতাম। কাজেই রোজই আশ্রমে যেতাম। একদিন আশ্রমে গিয়ে শুনলাম পরদিন দুপুরে মা মোগলসরাই স্টেশন waiting room এ ৪।৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করে অন্য গাড়ী ধরবেন। আশ্রম থেকে বড়রা অনেকে স্টেশনে মার দর্শনে যাবেন। পরদিন যথা সময়ে বাবা, মা, আমি ও ছোট দুই ভাই মোগলসরাই গেলাম। কাশীর স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে স্বামী শঙ্করানন্দজী, নেপালদা, হরলালদা, পটলদারা আরো অনেকে গিয়েছিলেন।

মনে আছে মা waiting room এ একটি arm chair এ আধ শোওয়া অবস্থায় ছিলেন। আমরা সবাই মাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ গরম, তার উপর মা ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া নিতেন না। কেউ হাতপাখা দিয়ে মাকে বাতাস করছিল। মা হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— "কি বন্ধু, হাওয়া করতে পারো?" আমি বললাম—হ্যাঁ। আমার হাতে পাখাটা দিতে মা ইশারা করলেন। আমি পাখা নিয়ে জোরে জোরে মাকে বাতাস করতে লাগলাম। গরমে পাখা জলে ভিজিয়ে হাওয়া করতে আমার মাকে দেখেছিলাম। কাজেই কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে গিয়ে পাখাটাকে বেশ করে ভিজিয়ে নিয়ে এসে জলশুদ্ধই হাওয়া করতে লাগলাম। এদিকে পাখার জলে যে মার কাপড় ভিজ়ে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। খুকুনীদি, আমার মা আমাকে বাধা দিতে গেলে মা তাঁদের কিছু বলতে নিষেধ করলেন; মা ও সকলে হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মা আমাকে বল্লেন— "তুমি হাত পা টিপতে পারো?" যদিও তার আগে আমি কখনও টিপি নাই তবুও না বলা জানতাম না— একগাল হেসে বললাম—হ্যাঁ। মা তাঁর ডান হাতখানি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমিও যেমন পারি টিপতে শুরু করলাম। একটু সময় দেখে মা বল্লেন— "না বন্ধু, এভাবে টেপে না।" বলে আমার হাত টেনে নিয়ে নিজের দুহাত দিয়ে সুন্দর করে টিপে দেখিয়ে দিলেন, কেমন করে টিপতে হয়। আমি তখন সেই ভাবে মার হাত টিপতে লাগলাম। উপস্থিত সবাই খুব মজা পাচ্ছেন মায়ের এই লীলা দেখে। খুকুনীদি একটু বেশী আনন্দ প্রকাশ করছেন দেখে মা বলছেন— "খুকুনীর এত আনন্দ ক্যান্ জানস্ না— অর কন্যাপীঠের মাইয়া হইব ত"। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় তখনো আমাকে আশ্রমে দেবার কোন কথাই ছিল না।

মা ঘুরে ফিরে প্রায়ই কাশীতে আসেন। দাদাভাইরও কাশী অতি প্রিয় স্থান, অথচ এখনো পর্যন্ত এখানে কোন আশ্রম হয়নি তাই তাঁর মন খারাপ। অনেক চেষ্টা করছেন, কিন্তু সুবিধামত কোন উপযুক্ত জায়গা পাচ্ছেন না। দাদাভাইর মুখে পরে শুনেছি— একবার মা লক্ষৌ হয়ে কোথাও যাচ্ছেন।

লক্ষ্যেতে গাড়ী বদল করতে হবে। বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য Railway waiting room এ মার বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে। দাদাভাই স্নান করতে বাথরুম, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে দেখেন মা একটা টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো উত্তর প্রদেশের মানচিত্র খুব মন দিয়ে দেখছেন। দাদাভাই ঘরে ঢোকামাত্র মা মানচিত্রে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "খুকুনী, দ্যাখ তোর কাশী আশ্রমের জায়গা"। সঙ্গে সঙ্গে দাদাভাই খুব আনন্দে লাফিয়ে সেই টেবিলের উপর উঠে মার পাশে দাঁড়িয়ে অসি নদীর কাছাকাছি জায়গাটা দেখে রাখলেন। আবার একবার গঙ্গায় নৌকা করে যেতে যেতে হাত দিয়ে বর্তমান স্থানটি মা দেখিয়ে বলেছেন—আশ্রমের এই জায়গার কাছ দিয়ে নৌকায় যখন মা যেতেন অনেক দিব্য শরীর দুহাত তুলে মাকে ঐ স্থানে আহ্বান জানান।

তারপর মায়ের দিব্য খেয়ালে কাশী আশ্রমের বর্তমান জায়গাটি কেনা হলো। ভিত্তি স্থাপনের দিন যতদূর মনে হয় কন্যাপীঠের সামনে উঠানের মাঝামাঝি জায়গায় পূজা ও মার হাত দিয়ে ইট রাখা হয় আর সেই জায়গাটি ঘিরে মা ও সকলে কীর্ত্তন করলেন। পরে ৮।১০ দিন যাবৎ ঐ নূতন জায়গায় অখণ্ড নাম কীর্ত্তন হলো। আশ্রমের কাছে কয়েকটি বাড়ীতে সবার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকদিন পর মা অন্যত্র চলে গেলেন। স্বামী পরমানন্দজী রয়ে গেলেন আশ্রম বানাবার জন্য। আমরা বিকালে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে বেড়াতে অসি ঘাটের দিকে যেতাম তখন দেখতাম স্বামিজী আশ্রমের সামনে ইম্লী ঘাটে গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমাদের দেখে হাসতেন আদর করতেন। গঙ্গার ঘাটের কাছে একটা বড় তেতুল গাছ ছিল যেজন্য এই ঘাটটাকে ইম্লী ঘাট বলতো। অনেক পরে এই ঘাটের নামকরণ হয় "আনন্দময়ী ঘাট"। ঘাটের কাছে উপরে তেতুল গাছ তলায় মায়ের প্রথম ঘর তৈরী হয়। বর্তমান কন্যাপীঠ বিল্ডিং এর নীচে পুরানো গুহা ছিল, তার উপরেই দোতলা বাড়ী তৈরী হয়।

কাশী আশ্রমের প্রথম উৎসব বাসন্তী পূজা নূতন মণ্ডপে সামিয়ানা খাটিয়ে বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মনে আছে সেই পূজায় প্রথম আমাদের কুমারী করা হয়। বোধহয় বীথুদি আমাদের শাড়ী, চন্দন, মালা আলতা পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের বিশেষ ভক্ত বিশুদা (শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য) বাসন্তী পূজা করছিলেন। আমাদের চন্ডীমন্ডপে নিয়ে গিয়ে মার সামনে আসনে বসিয়ে দেবীপূজার বড় টাটের মধ্যে আমার পা দুটি রেখে বিশুদা পূজা করলেন এবং পূজা শেষে আমাদের প্রণাম করেন। বিশুদা আমার বাবার মতন, আমাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন ভাবতে আমি লজ্জায় মরে গেলাম। পূজা হয়ে যাবার পর আমি বিশুদাকে প্রণাম করলোম। তাই দেখে মা বেশ খুশী হয়ে কিছু বললেন নেপালদাকে।

মহাষ্টমীর দিন সকালে আশ্রম প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। আমার গর্ভধারিনী মা ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, আমিও তাঁর পাশে আছি। হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীমা পূজা মন্ডপ থেকে বেড়িয়ে তীরবেগে আমাদের দিকে আসছেন, গলায় পা পর্যন্ত একটি লাল জবার মালা, মার মুখও লাল টকটক করছে, ছুটে এসে গলার মালাটি খুলে আমার মার গলায় পরিয়ে দিয়ে মার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুহাত দিয়ে স্পর্শ করতে করতে বললেন, "ভগবতী, স্বয়ং ভগবতী, স্বয়ং ভগবতী", এই বলেই আবার ত্বড়িৎ

আমার মা আনন্দময়ী

[২]

— 'বিশুদ্ধা'

এই সময় কাশীতে দেবনাথপুরায় একটি ভাড়া বাড়ীতে স্বামী অখন্ডানন্দজী ও স্বামী উমেশানন্দজী কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়ে থাকতে শুরু করেন। বিবেকদি, বিন্দুদি, ক্ষমাদি, সুরবালাদি, তারাদিরা ছোট ছোট মেয়েদের দেখাশুনা করতেন। তখন কন্যাপীঠে গঙ্গাদি, যমুনাদি, চন্দনদি, পবিত্রাদি, অঞ্জলিদি, রমাদি, শুদ্ধাদি প্রভৃতি ছিল। আমরা কাছেই থাকতাম। কাজেই রোজই আশ্রমে যেতাম। একদিন আশ্রমে গিয়ে শুনলাম পরদিন দুপুরে মা মোগলসরাই স্টেশন waiting room এ ৪।৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করে অন্য গাড়ী ধরবেন। আশ্রম থেকে বড়রা অনেকে স্টেশনে মার দর্শনে যাবেন। পরদিন যথা সময়ে বাবা, মা, আমি ও ছোট দুই ভাই মোগলসরাই গেলাম। কাশীর স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে স্বামী শঙ্করানন্দজী, নেপালদা, হরলালদা, পটলদারা আরো অনেকে গিয়েছিলেন।

মনে আছে মা waiting room এ একটি arm chair এ আধ শোওয়া অবস্থায় ছিলেন। আমরা সবাই মাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ গরম, তার উপর মা ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া নিতেন না। কেউ হাতপাখা দিয়ে মাকে বাতাস করছিল। মা হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— "কি বন্ধু, হাওয়া করতে পারো?" আমি বললাম—হ্যাঁ। আমার হাতে পাখাটা দিতে মা ইশারা করলেন। আমি পাখা নিয়ে জোরে জোরে মাকে বাতাস করতে লাগলাম। গরমে পাখা জলে ভিজিয়ে হাওয়া করতে আমার মাকে দেখেছিলাম। কাজেই কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে গিয়ে পাখাটাকে বেশ করে ভিজিয়ে নিয়ে এসে জলশুদ্ধ হাওয়া করতে লাগলাম। এদিকে পাখার জলে যে মার কাপড় ভিজে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। খুকুনীদি, আমার মা আমাকে বাধা দিতে গেলে মা তাঁদের কিছু বলতে নিষেধ করলেন; মা ও সকলে হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মা আমাকে বললেন— "তুমি হাত পা টিপতে পারো?" যদিও তার আগে আমি কখনও টিপি নাই তবুও না বলা জানতাম না— একগাল হেসে বললাম—হ্যাঁ। মা তাঁর ডান হাতখানি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমিও যেমন পারি টিপতে শুরু করলাম। একটু সময় দেখে মা বললেন— "না বন্ধু, এভাবে টেপে না।" বলে আমার হাত টেনে নিয়ে নিজের দুহাত দিয়ে সুন্দর করে টিপে দেখিয়ে দিলেন, কেমন করে টিপতে হয়। আমি তখন সেই ভাবে মার হাত টিপতে লাগলাম। উপস্থিত সবাই খুব মজা পাচ্ছেন মায়ের এই লীলা দেখে। খুকুনীদি একটু বেশী আনন্দ প্রকাশ করছেন দেখে মা বলছেন— "খুকুনীর এত আনন্দ ক্যান্ জানস্ না—অর কন্যাপীঠের মাইয়া হইব ত"। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তখনো আমাকে আশ্রমে দেবার কোন কথাই ছিল না।

মা ঘুরে ফিরে প্রায়ই কাশীতে আসেন। দাদাভাইরও কাশী অতি প্রিয় স্থান, অথচ এখনো পর্যন্ত এখানে কোন আশ্রম হয়নি তাই তাঁর মন খারাপ। অনেক চেষ্টা করছেন, কিন্তু সুবিধামত কোন উপযুক্ত জায়গা পাচ্ছেন না। দাদাভাইর মুখে পরে শুনছি— একবার মা লক্ষ্ণৌ হয়ে কোথাও যাচ্ছেন।

লক্ষ্যেতে গাড়ী বদল করতে হবে। বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য Railway waiting room এ মার বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে। দাদাভাই স্নান করতে বাথরুমে, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে দেখেন মা একটা টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো উত্তর প্রদেশের মানচিত্র খুব মন দিয়ে দেখছেন। দাদাভাই ঘরে ঢোকামাত্র মা মানচিত্রে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "খুকুনী, দ্যাখ তোর কাশী আশ্রমের জায়গা"। সঙ্গে সঙ্গে দাদাভাই খুব আনন্দে লাফিয়ে সেই টেবিলের উপর উঠে মার পাশে দাঁড়িয়ে অসিন্দীর কাছাকাছি জায়গাটি দেখে রাখলেন। আবার একবার গঙ্গায় নৌকা করে যেতে যেতে হাত দিয়ে বর্তমান স্থানটি মা দেখিয়ে বলেছেন—আশ্রমের এই জায়গার কাছ দিয়ে নৌকায় যখন মা যেতেন অনেক দিব্য শরীর দুহাত তুলে মাকে ঐ স্থানে আহ্বান জানান।

তারপর মায়ের দিব্য খেয়ালে কাশী আশ্রমের বর্তমান জায়গাটি কেনা হলো। ভিত্তি স্থাপনের দিন যতদূর মনে হয় কন্যাপীঠের সামনে উঠানের মাঝামাঝি জায়গায় পূজা ও মার হাত দিয়ে ইট রাখা হয় আর সেই জায়গাটি ঘিরে মা ও সকলে কীর্ত্তন করলেন। পরে ৮।১০ দিন যাবৎ ঐ নূতন জায়গায় অখণ্ড নাম কীর্ত্তন হলো। আশ্রমের কাছে কয়েকটি বাড়ীতে সবার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকদিন পর মা অন্যত্র চলে গেলেন। স্বামী পরমানন্দজী রয়ে গেলেন আশ্রম বানাবার জন্য। আমরা বিকালে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে বেড়াতে অসি ঘাটের দিকে যেতাম তখন দেখতাম স্বামিজী আশ্রমের সামনে ইমলী ঘাটে গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমাদের দেখে হাসতেন আদর করতেন। গঙ্গার ঘাটের কাছে একটা বড় তেতুল গাছ ছিল যেজন্য এই ঘাটটাকে ইমলী ঘাট বলতো। অনেক পরে এই ঘাটের নামকরণ হয় "আনন্দময়ী ঘাট"। ঘাটের কাছে উপরে তেতুল গাছ তলায় মায়ের প্রথম ঘর তৈরী হয়। বর্তমান কন্যাপীঠ বিল্ডিং এর নীচে পুরানো গুহা ছিল, তার উপরেই দোতলা বাড়ী তৈরী হয়।

কাশী আশ্রমের প্রথম উৎসব বাসন্তী পূজা নূতন মণ্ডপে সামিয়ানা খাটিয়ে বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মনে আছে সেই পূজায় প্রথম আমাকে কুমারী করা হয়। বোধহয় বীথুদি আমাকে শাড়ী, চন্দন, মালা আলতা পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের বিশেষ ভক্ত বিশুদা (শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য) বাসন্তী পূজা করছিলেন। আমাকে চন্ডীমন্ডপে নিয়ে গিয়ে মার সামনে আসনে বসিয়ে দেবীপূজার বড় টাটের মধ্যে আমার পা দুটি রেখে বিশুদা পূজা করলেন এবং পূজা শেষে আমাকে প্রণাম করেন। বিশুদা আমার বাবার মতন, আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন ভাবতে আমি লজ্জায় মরে গেলাম। পূজা হয়ে যাবার পর আমি বিশুদাকে প্রণাম করলোম। তাই দেখে মা বেশ খুশী হয়ে কিছু বললেন নেপালদাকে।

মহাষ্টমীর দিন সকালে আশ্রম প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। আমার গর্ভধারিণী মা ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, আমিও তাঁর পাশে আছি। হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীমা পূজা মন্ডপ থেকে বেড়িয়ে তীরবেগে আমাদের দিকে আসছেন, গলায় পা পর্যন্ত একটি লাল জবার মালা, মার মুখও লাল টুকটুক করছে, ছুটে এসে গলার মালাটি খুলে আমার মার গলায় পরিয়ে দিয়ে মার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুহাত দিয়ে স্পর্শ করতে করতে বললেন, "ভগবতী, স্বয়ং ভগবতী, স্বয়ং ভগবতী", এই বলেই আবার তড়িৎ

গতিতে যেমন ভাবে এসেছিলেন সেই ভাবেই চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে গেলেন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আমার মার এই শেষ দেখা। এর একমাস পর আমার মা কাশীপ্রাপ্ত হন।

দুপুরে ভোগের পর আশ্রম প্রাঙ্গনে সকলে পাতা নিয়ে বসলাম। খুকুনীদি বালতিতে করে খিচুরী, তরকারী, পায়েস নিয়ে এলেন, আর মা হাতা ভরে ভরে সব্বাহকে পরিবেশন করলেন। শতশত ভক্ত স্বয়ং অন্তর্পূর্ণার হাত থেকে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হলো। সকলে মহানন্দে আছে আর জোরে জোরে মার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মা অটুহাস্য করছেন। সবার খাওয়া হয়ে গেলে মা সারা গায়ে প্রসাদ মেখে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

বাসন্তী পূজার পর মা অন্যত্র চলে গেলেন। কন্যাপীঠের মেয়েরা দেবনাথপুরার ভাড়া বাড়ীতে ও ভক্তরা অপার্বিক আনন্দ নিয়ে যার যার জায়গায় ফিরে গেল।

(ক্রমশঃ)



"দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়েছ, বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যায়। গাছপালা, পশুপাখী, কয়েকদিন জীবিত থেকে আবার নতুন গাছপালা পশুপাখী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়, তোমরাও যদি কেবল তাই করলে তবে আর প্রভেদ রইল কি?"

—শ্রীশ্রী মা

শ্রীশ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য যাত্রা

[পূর্বানুবৃত্তি]

— শ্রী শিবানন্দ

গুপ্তুরে একটি এলাকার নাম রামক্ষেত্র। মায়ের অবস্থানের ব্যবস্থা সে স্থানেই করা হয়েছে। সুতরাং গুপ্তুরে পৌঁছে মায়ের গাড়ী রামক্ষেত্রেই আনা হল। পৌঁছে দেখা গেল পূর্ব হতেই সে স্থানে বহু লোক মায়ের দর্শনের জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষারত। শ্রী ঠাকুর ভাই মুনসার ব্যবস্থাতেই এই রামক্ষেত্রে মায়ের ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায়ের গাড়ী উপস্থিত হতে-ই কয়েকজন তিনখানা কেদারা সহ গাড়ীর নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের ইচ্ছা মা এবং সন্ধ্যা দুই বিশিষ্ট মহাত্মা হরিবাবা এবং অবধূতজীকে তারা ঐ কেদারায় উপবেশন করিয়ে গৃহ প্রবেশ করান। কিন্তু অবধূতজী স্বীকৃত না হওয়ায় মা এবং হরিবাবাকে তাহাই করা হল। সুন্দর, সুসজ্জিত ক্ষুদ্র একটি হল ঘর। মা এবং হরিবাবা আসন গ্রহন করতই উপস্থিত কূলবধূগণ তাদের চরণ প্রক্ষালন করিয়ে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। আরতী এবং শঙ্খধ্বনি সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানেন। পরে মাকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রাম কক্ষে আনা হলে উপস্থিত অন্যান্য সকলে মাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। লক্ষ্য করবার মত ছিল বেশ সুষ্ঠু সুশৃংখল একটা ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ পরে মাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে একে একে পায়ের পাদুকাটির নিকট ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। বাস্তবিকই এদের ভক্তি শ্রদ্ধা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

মায়ের বিশ্রাম কক্ষের অদূরেই একটি পুষ্করিনী। পুষ্করিনীটির পূর্বতটে বেশ কয়েকটি কুটির। শোনা গেল ঐ কুটিরগুলি সাধু সন্ন্যাসীদের অবস্থানের জন্যই নির্মিত। এ স্থানে বিভিন্ন পর্বাদি উপলক্ষে দূর দূরান্তর থেকে বহু মহাত্মার আগমন ঘটে এবং ঐ সব কুটিরে তাঁরাই অবস্থান করেন। এ স্থানটাই রামক্ষেত্র নামে পরিচিত। এই সব তথ্য জানিয়ে স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী মায়ের নিকট নিবেদন করলেন যে তাদের মধ্যে সব না হলেও অধিকাংশই কখনো মায়ের দর্শন পান নাই। এমনকি মায়ের নামও তাদের ক্ষতি গোচর হয় নাই। অথচ মায়ের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে-ই মার প্রতি তাদের কী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। মার দর্শন না পেলেও মার অদৃষ্ট কৃপায় যেন তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। তিনি আরো জানানেন যে তার একটি কারণ মায়ের অসীম কৃপা। তিনি বললেন যে এখানে প্রায়ই নাকি জলকষ্ট উপস্থিত হয় কিন্তু মায়ের আগমনের দিন কতক পূর্ব হতেই এ স্থানে নাকি কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণ হয়। তাঁরই ফলে রামক্ষেত্রের যাবতীয় কূপ, পুষ্করিনী জলপূর্ণ হয়ে জলকষ্ট অবসান ঘটে এবং চতুর্দিক রুক্ষ অন্তর্হিত হয়ে শ্যামল শ্রী ধারণ করে। বর্তমানে আর জলকষ্ট নাই। তিনি আরো জানানেন যে এদিকে এবারের ন্যায় বারিপাত্ তারা কখনো দেখেন নি। তাদের বিশ্বাস এসব মায়ের-ই কৃপা এবং তাঁর আগমন উপলক্ষ্য করেই।

পরদিবস প্রত্যুষ হতেই যাত্রীদের স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করাবার ব্যবস্থা করা হল। চারিখানা মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয় এবং মাকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় অমরাবতী দর্শনে। কৃষ্ণানদীর উপকূলে এ এক অনন্য সুন্দর দেবস্থান।

মা অমরাবতীতে উপস্থিত হলেন। প্রায় একঘণ্টার পথ। একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম্য স্থান। তবে স্থানটি দেবস্থান-ই। নদীর উপকূল ঘেঁষে বহু মন্দির। তাদের মধ্যে অনেক শিবমন্দির, দুর্গামন্দির, কাল ভৈরবের মন্দির, গনেশ মন্দির, কার্তিক মন্দির প্রভৃতি বিশিষ্ট। মনে হল স্থানটি মাহাত্ম্য মণ্ডিত। দশভূজা দুর্গা মন্দিরে উপস্থিত হতেই মায়ের যেন কেমন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। একে একে আপনভাবেই পুংখানুপুংখরূপে সব দর্শন করতে লাগলেন। স্থানীয় জনগণও মায়ের নিকট স্থানটির বহু অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করতে লাগলেন। হরিবাবা এবং মদীয় সকলেও সব দর্শন, শ্রবণ করে প্রসন্ন হলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে একটি প্রাচীন অশোক স্তম্ভও দর্শন হল। অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভের শীর্ষদেশে অশোকচক্র এবং সিংহমূর্তি। প্রত্যাবর্তনান্তে মায়ের ভোগ বিশ্রামের পরে মাতৃসংসঙ্গেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিকে মায়ের আগমনের পর হতে ক্রমশঃ-ই দর্শনাধীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। মায়ের সংসঙ্গের আসরে বহুলোক উপস্থিত। আগত দর্শনার্থীদের আনিত পুষ্পমাল্যে শ্রীমা ও সঙ্গীয় মহাত্মাদ্বয়কে সুসজ্জিত করে আরম্ভ হয়েছিল সংসঙ্গ। মায়ের আদেশে এবং উপস্থিত জনতার আগ্রহে অবধূতজী কিঞ্চিৎ সংপ্রসঙ্গ শোনালেন। কিন্তু জনগণ পুনঃ পুনঃ মাকে অনুরোধ করতে লাগলেন কিঞ্চিৎ বলবার জন্য। ভক্তগণের আগ্রহ মা উপেক্ষা করতে পারলেন না। মা যা বললেন, তার সংক্ষিপ্ত সার হল— মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াছ। এ জন্ম বড়ই দুর্লভ। সুতরাং সকলের নিকট তোমাদের এই ছোট বাচ্চার আবদার, সকলে তাঁর নাম কর। নামে-ই সব হয়। ইত্যাদি। পরে মা "নরতন পায়্যা প্যারে পিও রাম নাম....." এই সঙ্গীতটি সকলকে কীর্তন করালেন। মায়ের শ্রীমুখের বাণী এবং অমৃতময়ী সঙ্গীত শুনে তাদের আনন্দ যেন আর ধরে না। উল্লেখ্য কণ্ঠে তারাও মায়ের সঙ্গে কীর্তন করে যেন তারা ধন্য হল— ক্রমে সকলে মাকে প্রণাম করে একে একে বিদায় নিল।

সন্ধ্যার আসরে স্থির হল আগামীকাল্য প্রত্যুষেই মঙ্গল গিরি দর্শনের প্রোগ্রাম।

আজ ২৬শে — ভোর হতেই সকলকে নিয়ে মা যাত্রা করলেন মঙ্গল গিরির উদ্দেশ্যে। উপস্থিত হয়ে দেখা গেল মঙ্গল গিরি একটি স্বল্লোচ্চ গিরিশিখর। তার শীর্ষদেশে একটি মন্দির। মন্দিরে উপস্থিত হবার জন্য পর্বত গাত্র খোদাই করে নির্মিত হয়ে সোপান - সংখ্যায় প্রায় চারিশত। সকলেই মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মা-ও সঙ্গে, সুতরাং মন্দিরে উপস্থিত হতে কোন কষ্টই অনুভূত হল না, অবশ্য মা এবং মহাত্মাগণের জন্য পথিমধ্যে দুইবার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মন্দিরে পৌঁছে দেখা গেল মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত এবং সুদর্শন। মন্দিরের পূজারীজীকে পূর্বেই সংবাদ দেওয়াতে তিনি মন্দির প্রবেশ দ্বারেই অপেক্ষারত ছিলেন। মুখ্যমন্দিরের পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্রকায় চালাগৃহ। পূজারীজী মন্দির দর্শনের পূর্বে সেই গৃহেই যাত্রীগণকে দেখালেন একটী রক্তবর্ণ প্রস্তরখণ্ডে খোদিত এক জোড়া চরণ চিহ্ন। জানালেন শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু তাঁর দাক্ষিণাত্য যাত্রার প্রারম্ভে এ স্থানে এসেছিলেন। মন্দির প্রবেশের পূর্বে তাই এ স্থান দর্শনের প্রথা। এ অতীব প্রাচীন স্থান এবং ঐ মন্দির সত্যযুগ হতেই

প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে নৃসিংহদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন যুগে বিগ্রহের ভোগরাগের ব্যবস্থাও বিভিন্ন প্রকার। এই কলিযুগে তাঁর ভোগ হয় গুড়ের সরবতে। সত্যযুগে হাত তাঁর অমৃতভোগ, ত্রেতায় দুগ্ধ এবং দ্বাপরে ঘৃত ভোগ।

এবার মুখ্য মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। দক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এ মন্দিরও প্রায় অন্ধকার। একটি পাত্রে কর্পূরদীপ প্রজ্জ্বলিত করে পূজারীজী বিগ্রহ দর্শন করালেন। বিগ্রহ — নৃসিংহদেব মুখ্যাব্যাদন করে আছেন। অদূরেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মূর্তি। তাঁহারও নিয়মিত ভোগরাগ হয়ে থাকে।

শ্রী নৃসিংহদেবের মূর্তি ধাতু কিংবা অন্য কোনো ধাতু নির্মিত, তা নির্ণয় করা দুষ্কর। বিগ্রহ দর্শনান্তে ঠাকুরের ভোগ হল। পূজারীজী একটি পাত্রে (মনে হল তাম্রপাত্রই) জলে র মধ্যে গুড়কচূর্ণ করে মন্ত্রসহকারে নৃসিংহদেবের মুখ গহুরে প্রদান করলেন। ভোগের পরে সেই প্রসাদ উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হল। মা ও তা গ্রহণ করলেন।

মঙ্গল গিরিশৃঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আরো কতিপয় মন্দির অবস্থিত। বিলম্বের ভয়ে মহাত্মাগণ ঐ সব মন্দির দর্শনে সম্মত হলেন না, সুতরাং মন্দির প্রণাম করে প্রত্যাবর্তন করা হল।

প্রত্যাবর্তনের পথেও নিকটেই আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে মা এবং মহাত্মাদের দর্শনের জন্য অনুরোধ জানান হয়েছিল। কিন্তু মহাত্মাগণ স্বীকৃত না হওয়ায় সে অনুরোধ রক্ষা করা হল না।

বৈকালে মাকে পুনরায় শংকরাচার্যের মন্দির দর্শনের জন্য আনা হল। সে পথেই বিশিষ্ট আর একটি মন্দির শ্রীরাম মন্দির। সকলের বিশেষ আগ্রহে মাকে শ্রীরাম মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল। সুন্দর কারুকার্য অঙ্কিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতার বিগ্রহ। তার পার্শ্বদেশে শ্রীহনুমানজীর বিগ্রহও আছেন। সমায়াভাব সুতরাং মন্দির অধিকারীদের আগ্রহ থাকলেও সে মন্দিরে মায়ের আর বসা হল না — বিগ্রহ দর্শন করেই মা চললেন শংকরাচার্যের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। অনন্যোপায় হয়ে শ্রীরাম মন্দিরের কতৃপক্ষ মায়ের কাছে নিবেদন করলেন, শ্রীরামনবমী আগতপ্রায়। সম্ভব হলে মা যদি সে দিন সে উপলক্ষে একবার আসেন।

শংকরাচার্যের মঠে প্রবেশ করতেই মন্দির। মন্দিরে শংকরাচার্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মায়ের আগমন সংবাদ পেয়ে সে মঠেও বহুলোক একত্রিত হয়েছিলেন। মার গাড়ী উপস্থিত হতেই করজোরে উপস্থিত জনতা মাকে স্বাগত জানালেন। মন্দিরের সন্মুখেই মায়ের আসন সাজান রয়েছে। মাকে উপবেশন কারান হল। শ্রী হরিবাবাও উপবেশন করলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাকে ওঠান হল। কারণ আজই মায়ের মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হবার কথা। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই মা প্রত্যাবর্তন করলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই মা সকলকে নিয়ে যাত্রা করলেন মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে। পরদিবস প্রাতঃ অষ্ট ঘটিকায় মায়ের গাড়ী প্রবেশ করল মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে।

(ক্রমশঃ)

আশ্রম - সংবাদ

বারাণসী

গত ২২শে মার্চ হতে ২৫শে মার্চ, ১৯৯৯ বারাণসীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এবারে বাসন্তী পূজায় একটি সুন্দর ভাবের সৃষ্টি হয়। ২২শে মার্চ ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলা দেবীর বোধন করে দেবীকে বরণ করা হয়। ২৩শে মহাসপ্তমী পূজা হয়। তিথি বৈচিত্রে অষ্টমী ও নবমী পূজা একদিনে হয়। তাই ২৪শে ভোর ৫টায় অষ্টমী পূজা আরম্ভ হয়। ৬টায় সন্ধি পূজা, তারপর মহানবমীর পূজার পর মধ্যাহ্নে ১২টায় রামনবমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা অন্নপূর্ণারও বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে দশমীর পূজা হয়।

এবারের পূজার বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিদগ্ধ পণ্ডিত সুধীপ্রবর ডাঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চণ্ডীর প্রসিদ্ধ চারটি স্তবের উপর বিদ্বত্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা। তাঁর সহজ সরল সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করে সকলেই মুগ্ধ হন। মৌলিকতার জন্যই তাঁর ভাষণ আরও সকলকে আকৃষ্ট করে।

দশমীর দিন বিজয়ামলিনীর পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত ১৪ই এপ্রিল দিদিমার সন্ধ্যাস উৎসব এবং ২৩শে এপ্রিল বাবাজোলানাতের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩রা ও ৪ঠা মে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আনন্দজ্যোতি মন্দির সুন্দর করে সাজানো হয়। পূজা, হোম, কীর্তন, ভোগ ও ভাণ্ডারার সুন্দর সমন্বয়ে একটি পূর্ণতার ছাঁওয়া পাওয়া যায়।

কনখল

শ্রীশ্রীমায়ের কনখল আশ্রমে গিরিজীর মন্দিরে গিরিজীর সন্ধ্যাস উৎসব সুন্দরভাবে গত ১৪ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সাধুভাণ্ডার প্রভৃতি আয়োজিত হয়। ২৩শে এপ্রিল বাবা জোলানাতের উৎসবও উদ্‌যাপিত হয়।

গত ২৯শে এপ্রিল হতে ৪ঠা মে, ১৯৯৯ শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী মহোৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এবারে পরিমিত দিবসের অনুষ্ঠানেও যথারীতি প্রতি বছরের মত ১০৮ কুমারী পূজা, শত চণ্ডীপাঠ, রুদ্রযজ্ঞ, দরিদ্র নারায়ণসেবা, সাধু ভাণ্ডার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট মহাত্মাদের সমাগমে ও তাঁদের ভাষণে অয়োজনটি অনবদ্য হয়ে ওঠে। তিথি পূজার পর নামযজ্ঞের সমাপনের সঙ্গে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

আগরপাড়া

গত ১৪ই এপ্রিল আগরপাড়া আশ্রমে দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব ও ২৩শে এপ্রিল বাবা ভোলানাথের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩রা ও ৪ঠা মে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মজয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ৩রা মে উদয়াস্তু হরি নাম কীর্তন, ভজন, মাতৃগীতি আলেখ্য, ভিডিও প্রদর্শন, সমবেত মাতৃনাম গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। জন্মতিথি লগ্নে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলির পর ফল বিতরণ করা হয়।

৪ঠা মে মাতৃপূজা, সৎসঙ্গ, ভজন, চণ্ডী পাঠের পর ভোগারতি ও প্রসাদবিতরণ করা হয়। কুমারী পূজা, বটুক পূজা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়।

রাঁচী

গত ১৪ই এপ্রিল রাঁচী আশ্রমে দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩রা মে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩তম জন্মজয়ন্তী মহোৎসব সাদরে পরিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে অখণ্ড জপ, ভজন কীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষপূজা, কুমারী পূজা, হোম এবং পুষ্পাঞ্জলি হয়। ৪ঠা মে গীতা চণ্ডীপাঠ, সৎসঙ্গ, কীর্তন, প্রবচন, ভোগাতির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জামশেদপুর

শ্রীশ্রী মায়ের সাথে জামশেদপুরের অতি প্রাচীন সম্বন্ধ। জামশেদপুরের ভক্তেরা সত্যই শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপাধন্য।

ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে লৌহনগরী জামশেদপুরে সহরের একপ্রান্তে সুবর্ণরেখার পাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গত কয়েক বছর হয় শ্রীশ্রী মায়ের নামে একটি মনোরম আশ্রম। প্রায় একবছর আগে ১৯৯৮ র শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শ্রীশ্রী মা কালী, শ্রীশ্রী মা এবং নন্দদেব শিবলিঙ্গ নূতন তিনটি মন্দিরে।

ভক্তদের প্রচেষ্টায় সেখানে নিয়মিতভাবে আশ্রমের নানা উৎসব সুন্দর রূপেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই বছরের প্রথম বিশেষ উৎসব ছিল শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির জন্ম শতবার্ষিকী। ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তির দিন বিশেষ পূজা ও সমারোপযোগী ভজন কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বামী নির্মলানন্দজী এই উৎসবে যোগদান করেন এবং শ্রদ্ধেয়া দিদির পবিত্র জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

১৪ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির শুভ দিনে স্বামী মুক্তানন্দ গিরি মহারাজের (দিদিমার) সন্ন্যাস

উৎসব উপলক্ষেও বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগের ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৮ই এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে বিগ্রহাদির প্রথম স্থাপনা দিবস উপলক্ষে তিনটি মন্দিরেই বিশেষ পূজা, ভোগ, প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় আরতি, কীর্তন আদির অনুষ্ঠান ছিল।

২৩শে এপ্রিল শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কীর্তনপ্রেমী বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি কীর্তনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে পালিত হয়েছে। জামশেদপুরের সাথে বাবা ভোলানাথেরও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এবং সেখানে অনেক পুরাতন ভক্ত তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রী মায়ের শুভ ১০৩তম জন্মমহোৎসবও আশ্রমে সুন্দরভাবেই প্রতিপালিত হয়েছে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ওরা মে, ১৯শে বৈশাখ শেষ রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা এবং পরদিন বিশেষ ভোগ, হোম ও আরতি হয়। প্রচুর ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ড জয়মা নাম কীর্তন হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রতি মাসের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় ভক্তরা সকলে সম্মিলিত হয়ে সংসঙ্গ এবং কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন।

ডিব্রুগড়

শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩তম শুভ জন্ম জয়ন্তী উৎসব গত ওরা মে সোমবার ও ৪ঠা মে মঙ্গলবার মায়ের ডিব্রুগড় আশ্রমেও অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ওরা মে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ড মৌন, জপ, জন্মতিথি লগ্নে মায়ের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন পূজা ও ভোগারতির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভিডিও ক্যাসেটে মাতুলীলা দর্শন হয়।

ভোপাল

শ্রীশ্রীমায়ের ভোপাল আশ্রমেও গত ওরা ও ৪ঠা মে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মজয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১০৮ কুমারী পূজা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ তিথি পূজা ও হোম সম্পন্ন হয়। ৪ঠা মে ভোগারতির পর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুণা

পুণা আশ্রমেও গত ওরা মে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩ তম শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ভজন, কীর্তন, ভিডিও ক্যাসেটে মাতুলীলা দর্শন, মায়ের বিশেষ তিথি পূজা, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি হয়।

৪ঠা মে ভোগারতির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শোক সংবাদ

১. স্বামী ধীরানন্দ সরস্বতী—

গত ৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৯ স্বামী ধীরানন্দজী গোরক্ষপুরে স্বীয় সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। স্বামী ধীরানন্দজী আশ্রমের প্রবীণতম সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি বৃন্দাবনের ভাগবত সপ্তাট শ্রীশ্রীঅখণ্ডানন্দজীর নিকট থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

বেশ কিছু বছর তিনি বৃন্দাবন ও কাশী আশ্রম পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সেবার ভাব এবং সহজ সরল অমায়িক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হতেন।

আমরা তাঁর প্রয়াণে মর্মান্বিত। মায়ের চরণে তাঁর চিরশান্তি কামনা করি।

২. স্বামী আশীষানন্দ গিরি—

দিদিমার অতি পুরাতন শিষ্য এবং শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত গুজরাতবাসী স্বামী আশীষানন্দজী মহাপ্রয়াণ করেছেন গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীর কালকাজী স্থিত আশ্রমে।

তিনি বহুবছর ধরে কনখলে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে বাস করেছেন এবং নানা ভাবে আশ্রমের সেবা করাই তাঁর বিশিষ্টতা ছিল। তাঁর জীবনের একটি বিশেষ শখ ছিল শ্রীশ্রীমায়ের পূজা এবং ভোগের জন্য হরিদ্বার বাজারের শ্রেষ্ঠ ফল ও সজ্জী সব গাড়ী ভরে নিয়ে আসা। সেবার ভাব ছিল তাঁর অতুলনীয়। হরিদ্বারে গত বৎসর পূর্ণকুণ্ডের সময়ও তিনি বিশিষ্ট সব মহাত্মা ও সাধুসেবার জন্য কনখল আশ্রমে যে সুব্যবস্থা ও সহায়তা করেছিলেন তা এখনও আশ্রমবাসীদের মনে জাগ্রত রয়েছে।

শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে তিনি একবার পোরবন্দর শহরে যে বিরাট অভ্যর্থনা ও উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তাও সত্যি অতি সুন্দর ছিল।

প্রতি সংযম সপ্তাহে আমরা তাঁকে মহাত্মাদের সঙ্গে মঞ্চ সমাসীন দেখতাম। কখনো মায়ের কথা ও তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব তিনি ভক্তদের শোনাতে।

আজ আমরা তাঁর প্রয়াণে তাঁর উদ্দেশ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

৩. ডাঃ সুরেশ শেঠ (বম্বে)—

ডাঃ সুরাভাই শেঠ গত ৬ই এপ্রিল বম্বেতে নিজ বাসভবনে (মৃত্যুর সময় তাঁর প্রায় ৮৬ বছর বয়স হয়েছিল) মাতৃকোড়ে চির শান্তি লাভ করেছেন।

দক্ষিণ বম্বের অন্যতম হাসপাতাল নানাবতী হাসপাতালের তিনি প্রধান চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট সঞ্চালক রূপে প্রখ্যাত ছিলেন। কঠিন রোগ নির্ণয়ে তাঁর যশ ছিল দেশব্যাপী। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ

কৃপাপাত্র ছিলেন তিনি। আশ্রমবাসী সকলের তিনি যে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে গিয়েছেন তা যথার্থই অবিস্মরণীয়। তিনি শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির চিকিৎসা দীর্ঘদিন অত্যন্ত আপনভাবে করেছেন। আশ্রমের অনেক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিনীদের চিকিৎসাও তিনি আনন্দের সঙ্গে করে গিয়েছেন সে সব কথা আশ্রমবাসীদের মনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডঃ শেঠের শ্রীশ্রীমায়ের চরণে ছিল অগাধ ভক্তি। আমরা মায়ের চরণে প্রয়াত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানাই ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য সাত্ত্বনা কামনা করি।

৪. শ্রীমতী শান্তি দেবী—

শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী শান্তি দেবী গত ২২শে এপ্রিল সকালে বিষ্ণ্যাচলে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে লীন হয়েছেন।

তিনি আশ্রমে বেলুদি নামেই সুপরিচিতা ছিলেন। বেলুদি আজ প্রায় ৬০ বছর ধরে বিষ্ণ্যাচলে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে একান্তে জপ ধ্যান নিয়ে বাস করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি তরু কুটারে একান্ত বাস করেছেন। পরে আশ্রমের নীচে একটি জমিতে সুন্দর কুঠীয়া বানিয়ে শেষদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ একাই সেখানে থেকে গেছেন। বাড়ীর নাম ছিল 'শান্তি আশ্রম'।

বেলুদি অদ্ভুত সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনি রাত্রিবেলাও বিষ্ণ্যাচলের পাহাড়ে একা যাওয়াআসা করতেন। তিনি একবার পাহাড়ে শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ বনদেবীরূপে দর্শন করেছিলেন। পরে কাশীতে আশ্রমে মাকে সেই রূপে সাজিয়ে পূজাও করেন।

গরীব দুঃখীদের প্রতি অতি দরদী মন ছিল। আশে পাশের বহু গরীব বাচ্চাদের তিনি লালিত পালিত করে বড় করেন। শান্তি মা - এর নাম ঐ অঞ্চলে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু বছর ধরে তিনি হৃদয়রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আশ্রমের পুরাতন মালীর পরিবারের লোকেরাই তাঁর দেখা শুনা করত। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাঁর চিরশান্তি কামনা করি।



with best compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D.WREN GROUP OF COMPANIES.

Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD.

25, SWALLOW LANE,

CALCUTTA - 700 001

FACTORY: DUMDUM & BARODA

BARODA CITY OFFICE-

D.WREN INTERNATIONAL LIMITED,

ALKAPURI, BARODA - 390007

with best compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কর্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কর্ম করবে
তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

—শ্রী শ্রী মা

A.R. Dewanjee & Co.

MANUFACTURES OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD
EXPORTERS & IMPORTERS
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA - 700 001

Phone : 220-9739
Offi.: 220-4746
Fax : 220-8472
Factory: 477-9239
Resi: 473-3157

শুভ কামনা সহিত :

"যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে নেবে পূর্ণাঙ্গীণ রূপে
চেষ্ঠা করা দরকার।"

— শ্রী শ্রী মা

দি এশিয়াটিক অস্টিজেন এন্ড অ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড

৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন : ২২০ ৪২৪৭/২২০ ৪২৫৯ /২২০ ৪৪৮৭

with best compliments from :

"শুভমতি দিয়ে কর্ম করে কর্মের ভিতর দিয়েই
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা।"

—শ্রী শ্রী মা

ORISSA AIR PRODUCTS LTD.

Head Office : 8, B.B.D. Bag East
CALCUTTA - 700 001

Regd Office : Gundichapada
Dhenkane : 759 013

Phones : 220-4347/220-4259

AT THE LOTUS FEET OF MA

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta-700 005

with best compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

—শ্রী শ্রী মা

SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY

87/5, Block E, New Alipore
Calcutta - 700 053

Phone : 478-3545

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

with best compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C Rashbehari Avenue
Ballygunje, Calcutta - 700 029
Phone : 464-2217

Suppliers of Quality Sarees,
Woollen and Readymade Garments
and School Uniforms.

WE HAVE NO OTHER BRANCH

"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।।"

—শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

- শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত ক্যাসেট "আনন্দ সংগীত" নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ—

- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
- মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

With Best Compliments from

"Try to grasp the significance of 'all is His', and you will immediately feel free from all burdens."

— Ma Anandamayee

p

RISHI GASES (P) LTD

Head Office : 8, B.B.D. Bag East
CALCUTTA-700 001

Phones : 220-4247/4259

Factory : Industrial Estate
P.o. Tifra

Bilaspur - 495223 (M.P.)

Phones : 4233, 4675

with best compliments from

Khadim's

Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD. 29A, Rabindra Sarani, Calcutta - 700 073
Phone : 237-8220,237-0806,237-5226,236-4639,236-6063,236-2318
Fax : 033-215-3387

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

● Branch Ashrams ●

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110 019 (Tel : 684 0365)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Ganesh Khind Road, Pune-411 007, (Tel : 327 835)
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752 001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803 116, Bihar (Tel : 5362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834 001, Bihar (Tel : 312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731 233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249 193, U.P.
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221 001, U.P.
(Tel : 310054 + 311794)
23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231 307,
(Tel : 05442-64343)
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan. Mathura-281 121, U.P. (Tel : 442024)
- IN BANGLADESH :
1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

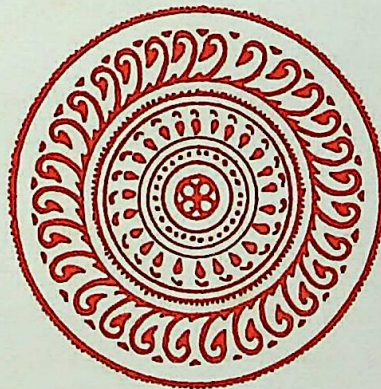
**REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97**



रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड, कम्बुछा, वाराणसी, फोन-३१२८२०

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

● Branch Ashrams ●

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhati, Calcutta-700 058 (Tel : 553 1208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799 001, West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263 602, U.P.(Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263 881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391 105,(Tel 33208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram
P.O. Bairagarh, Bhopal-462 030 M.P. (Tel : 521 227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248 009
U.P. (Phone : 684 271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road
P.O. Rajpur, Dehradun-248 009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248 010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831 005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal, Hardwar-249 408, U.P.(Tel : 416 575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246 445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261 402, U.P.

मा आनन्दमयी — अमृतवार्ता

श्रीश्री मा आनन्दमयीर दिव्य जीवन

अमृतवार्ता सञ्चलित त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष-३

अक्टोबर, १९९९

संख्या - ९

सम्पादक मण्डल

- ब्रह्माचार्य शिवानन्द
- ड० शुक्देव सिंह
- कुमारी चित्रा घोष
- कुमारी गीता ब्यानाजी
- ब्रह्माचारिणी गुणीता

कार्यकारी सम्पादक

श्री पानु ब्रह्माचार्य

वार्षिक ठादा (डाक व्ययसह)

भारते - ७०/- टाका

विदेशे - १२ डलर अथवा ८५०/- टाका

प्रति संख्या - २०/- टाका

বিশেষ সূচনা

সকল গ্রাহকদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে বর্তমান সংখ্যাই ১৯৯৯ সনের শেষ সংখ্যা। তাই যাঁরা আগামী বৎসরের চাঁদা অগ্রিম পাঠাননি তাঁদের অনুরোধ জানানো হ'চ্ছে যে তাঁরা ২০০০ সনের চাঁদার টাকা ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্য যেন নিম্নলিখিত নামে মানিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট যোগে পাঠান। চেক পাঠালে ব্যাঙ্কে জমা হতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং অন্ততঃ ২০ টাকা ক্ষতি হয়।

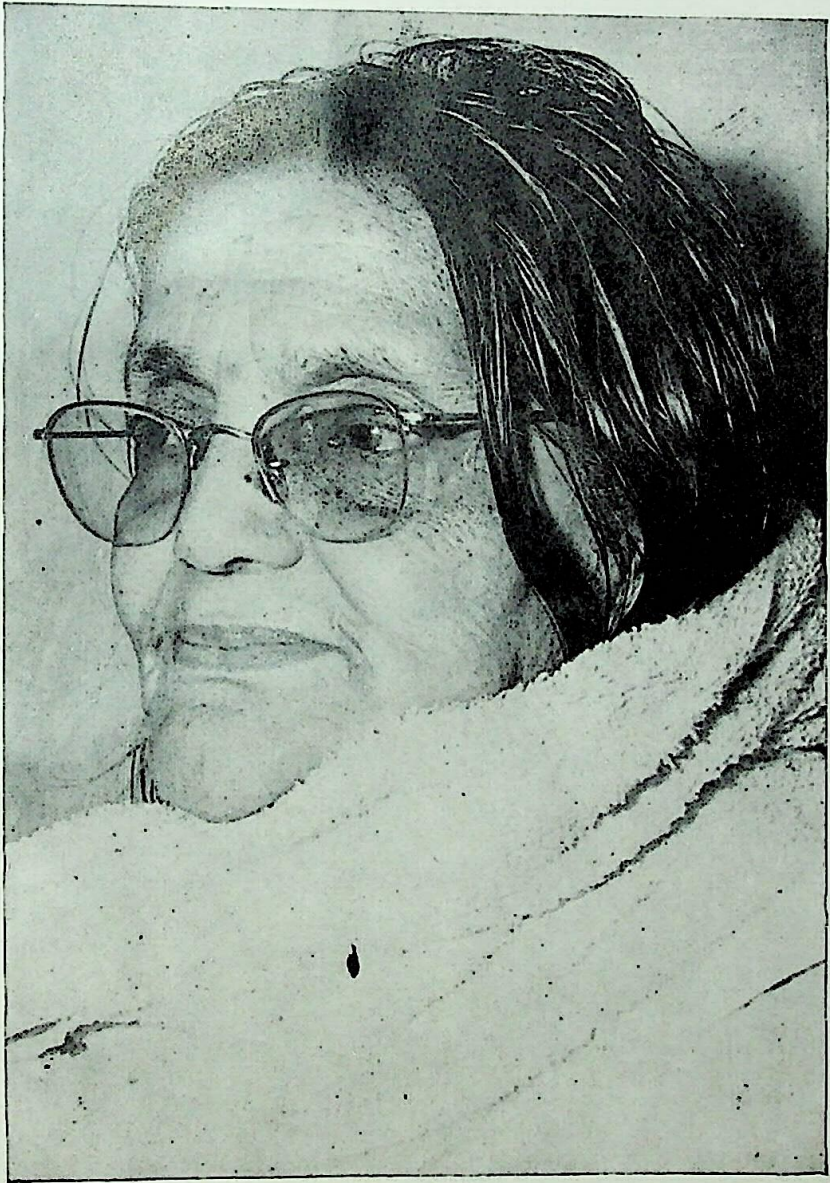
অনেক গ্রাহকের চাঁদার মেয়াদ ১৯৯৮ সালে অথবা তারও আগে শেষ হয়েছে; তাঁদের অনুরোধ জানানো হ'চ্ছে — ২০০০ সনের চাঁদার সঙ্গে বকেয়া টাকা পাঠিয়ে পত্রিকা র সংগ্রহ সুনিশ্চিত করুন এবং শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাদর্শ প্রচারে অংশ নিন।

চাঁদার টাকা সবর্বদা এই নামে পাঠাবেন : "SHREE SHREE
ANANDAMAYEE SANGHA – PUBLICATION A/C"

১লা অক্টোবর, ১৯৯৯

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

কার্য্যকরী সম্পাদক



মাতৃ-বাণী

সংকলন - চিত্রা ঘোষ

জীবজগতের অন্তর্গত মনোরাজ্যে মানুষের যতক্ষণ ভগবানের দিকে ঠিক ঠিক যাত্রা না হয়- মায়া মোহ আচ্ছন্ন, সেখানে ইহাই মনোমুগ্ধকর মোহের ক্রিয়া। যতটুকু সময়ের জন্য সুখ, পিছনে দুঃখ বৃক্ষছায়ার মত। বৃক্ষ দীর্ঘস্থায়ী নয়, বৃক্ষের ছায়াটিও দীর্ঘস্থায়ী নয়। অতএব এই মনের দেখা অনিত্য। চন্দ্র সূর্য্যের যে দিক দিয়ে গতি দেখায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষছায়ার গতি মনের ধারণায় যেমনটি, অনিত্যতা সেই।

পিতা মাতা সন্তান আত্মজ, জীবজগতের অন্তর্গত। পিতামাতা এবং গুরুজনদের শ্রণাম করলে স্বভাবতঃ যেমন দীর্ঘজীবী, চির সুখে থাকার দিক, কল্যাণ ধারা। অনেকের ইহাও - ধর্ম্মে মতি হোক। শ্রণাম, চরণ ছোঁয়া ইত্যাদি মাতা পিতা গুরুজনদের প্রতি করণীয় হওয়া।

করমালা, জপমালা, মনোমালা — মনে মনে যতক্ষণ জপ অথবা না হয় ততক্ষণ করমালা, জপমালা। যতক্ষণ এ মনোমালাও না হয় অর্থাৎ যে স্থিতিতে অন্তর্মুখী জপের দিকটা ও অর্ন্তমালার সন্ধান ছোঁয়া দেবার রাস্তা না খোলা ততক্ষণ করমালা, জপমালার অধীন থাকতে হয়। যদি মনোমালার অভ্যাস প্রিয় হয়, তাহা হলে যতদিন অথবা মনে মালা না চলে, ততক্ষণ ত্রিসঙ্খ্যার তিনটি মালা করে রাখা। সেই জন্য মালা উপবাসী রাখতে নেই।

পরিমিত আহার, শয়ন প্রকৃতির পরিশোধ। শরীর যতক্ষণ আহার চায় তাকে দিতেই হবে, নইলে পেটের স্নায়ু শুকিয়ে যায়। জোর করে না খেলে প্রকৃতি পরিশোধ নেয়, শরীর নষ্ট হয়। যদি সেই স্থিতি আসে তখন আহারের প্রশ্ন থাকে না।

সংসঙ্গ শোনা (বহিসংসঙ্গ) ততক্ষণ দরকার যতক্ষণ মন অন্তর্মুখী না হয়। নয়তো ঘরে বসে মনস্থির করে ভগবৎ সঙ্গ করা আরো উত্তম।

যিনি সৎসঙ্গ করেন তাঁর শুদ্ধভাব থাকলে যে শোনে তার দুটো লাভ, শুদ্ধভাব আসে ও সৎসঙ্গ শোনা।

মনে রাখা, শুদ্ধ ভাবের সঙ্গই সাধনা। আমরা যতই অশুভ বা সন্ধীর্ণ চিন্তার প্রশয় দিই, ততই আমরা জগতের অমঙ্গলের কারণ সৃষ্টি করি।

মনের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, সংশয় ইত্যাদি যত কিছু অপরাধ থাকুক না কেন, আনন্দই ইহার মূল প্রকৃতি। শিশুর মত অবিচারে এখানে ওখানে ভাল-মন্দে মন কেবল আনন্দই খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সংসারের খণ্ড খণ্ড আনন্দ মনকে বেশীক্ষণ কোথাও ধরে রাখতে পারে না। ভালবাসা ও তাড়না উভয় সংযোগে যেমন ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরকম মনকেও তেমনভাবে তৈরী করতে হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবারও যদি নিজের কাছে নিজে মানুষ না যায় তাহলে সে বাঁচতে পারে না। নিদ্রায় আত্মাকে আত্মা স্পর্শ করে! কিন্তু এ স্থলে আবরণে নিয়ে যায় — অজ্ঞানের স্পর্শ, তবুও যাওয়া দরকার।

সঙ্গের সঙ্গী মাত্র ভগবান। সাধুরা তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন বলে তাঁদের সঙ্গ বাঞ্ছনীয়। স্থূল স্থূল কে সহজে আকর্ষণ করে এই কারণে বর্তমান সময়ে সাধন ভজনে সৎসঙ্গ প্রধান সহায় বললেও চলে। সাধুরা বৃক্ষরাজির মত সর্বদা উর্দ্ধমুখ থাকলেও পরকে ছায়া ও আশ্রয়দান এঁদের সহজাত ব্রত।

তাঁর অভাবের ভাবে জগতের আবরণ সরিয়ে দেয়। দুনিয়ার অভাবের ভাবে জগতের দিকে মন নেবে। স্বভাবের ভাবে স্বরূপ প্রকাশের রাস্তা খুলে দেয়।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

আজ সকালবেলায়ই হরিবার লীলা আরম্ভ হইয়াছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনবৃত্তান্ত অভিনয় করিয়া দেখান হইতেছে। মাকে এখানে লইয়া যাওয়া হইল। আমি অল্পসময় মাত্র এ লীলা দেখিয়া ছিলাম। কারণ আমাদেরকে বেলা ১১টার মধ্যেই রওনা হইতে হইবে। আমরা ১০টার মধ্যেই স্নানাহার সমাপন করিয়া ১১টার সময় মথুরা রওনা হইলাম। আমাদের গাড়ী বেলা ১২।।টার সময়। খুকুনীদিদি এবং কমলদাদাও আমাদের সহিত দিল্লী চলিলেন। তাঁহারা লক্ষ্ণৌ হইয়া কাশী যাইবেন। যাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলে মা বলিলেন “খুব সাবধানে যাইও এবং আসিও”। বারবার এই কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম নিরুদ্বেগে দিল্লী কিংবা কাশী যাওয়া বোধহয় আমার ভাগ্যে নাই। পরে দেখিয়াছিলাম আমার অনুমান সত্যে পরিণত হইয়াছে। দিল্লীতে পৌঁছিয়া এবং দিল্লী হইতে কাশী রওনা হইবার সময় একাধিক ভাবে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে।

৩০ শে চৈত্র শনিবার (ইং ১২।৪।৫২) গতকল্য দুই এক্সপ্রেসে মা হরিদ্বার হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে মা “আনন্দকাশীতে” (টিহরী) গিয়াছিলেন। গোপীবাবুকে তার করিয়া এখানে নিয়া গিয়াছিলেন। গোপীবাবুও শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে ফিরিয়াছেন।

এবারে মাকে সদর রাস্তা হইতে আশ্রম পর্যন্ত বাদ্যভাণ্ড সহকারে আনা হইয়াছিল। এইসব আয়োজন দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “এ আবার কি”? আশ্রমে পৌঁছিলে কন্যাপীঠের মেয়েরা মা কে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া ধূপদীপ আরতি করিয়া কিছু ভোগ দিয়াছিল। এই সময়কার দৃশ্যটি দেখিতে অতি-মনোরম হইয়াছিল। মাকে বেদীর উপর বসান হইয়াছিল। মেয়েরা দুইদিকে দাঁড়াইয়া কেহ বা পাখা, কেহ বা বাজন দ্বারা মাকে বাতাস করিতেছিল। কেহ ধূপ, কেহ দীপ দ্বারা মাকে আরতি করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছিল। মায়ের মূর্তিখানিও যেন দিব্য জ্যোতিতে জ্বল জ্বল করিয়া সমস্ত মণ্ডপখানি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। গত বাসন্তী পূজার সময় মাকে এখানে না পাইয়া সকলের মনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল মাকে ঐভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাহারা উহার কিছুটা দূর করিয়াছিল।

প্রণাম যথার্থভাবে হইল কিনা তাহা বুঝিবার উপায়

আজ বেলা ৯ টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে হলঘরে পাইলাম। পাঠ কীর্ত্তনাদি শেষ হইলে সাম্যাল মহাশয় মাকে বলিলেন, “আমি একটা কথা বলিতে চাই — আপনাকে কত লোক প্রণাম করিতে আসে এবং কতভাবে প্রণাম করিয়া যায়; আমি কয়েকটি কাল্পনিক ব্যক্তির কথা বলিতেছি যাহাদের মধ্যে

সৎসঙ্গ লইয়া থাকিতে হয়। ইহার ফলে লোকের দুর্বুদ্ধি, দুর্গুণ নষ্ট হইয়া যায়। দুর্বুদ্ধি কি? না, ভগবান যে দূরে আছেন - এইরূপ বুদ্ধিকেই দুর্বুদ্ধি বলে; সেই রূপ যে গুণ লোককে ভগবান হইতে দূরে রাখে উহাই দুর্গুণ। এই দুর্বুদ্ধি এবং দুর্গুণ চলিয়া গেলে অর্থাৎ আবরণ নষ্ট হইলে তাঁহার প্রকাশ হয়।

সাম্রাট মহাশয়। নাম, জপ, ধ্যান বা সৎসঙ্গে যে উপকার হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না কেন?

মা। (হাসিয়া) অনেক সময় মাইল স্টোন (mile stone) দেখা যায় না। ভগবানের বিধানই এমন সুন্দর যে, এক অবস্থায় কে কতদূর অগ্রসর হইল তাহা তিনি দেখিতে দেন না; কিন্তু তিনি কর্মের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখেন। আবার এমন অবস্থাও আছে যখন কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং আরও কতটা অগ্রসর হইতে হইবে তাহা তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে। দেখ, রাজার ছেলে হইলেই যখন তখন সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতে পারে তাহা নয়। যখন সে লেখাপড়া শিখিয়া সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় তখনই তাহাকে সিংহাসনে বসান হয়।

এক ভদ্রলোক। ভগবৎ লক্ষ্যে চলিয়া লোকে আবার পথে থামিয়া যায় কেন?

মা। (হাসিয়া) তাহার ঋণ আছে বলিয়া। সে এই জন্মে বা জন্মান্তরে যে সকল বিষয়ে তাহার মন দিয়াছিল অর্থাৎ ভোগের কামনা করিয়াছিল ঐ বিষয়গুলি আসিয়াই তাহার এগিয়ে চলার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। তাহার মনকে ঐ বিষয়ের পথে টানিয়া লইয়া যায়। এগুলি হইল তাহার ঋণ। এই ঋণ শোধ না করিয়া সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে কেমন করিয়া? এই কামনা বাসনা গুলিই আবরণ। এ গুলি দূর না করিতে পারিলে তাঁহার প্রকাশ কি ভাবে হইবে? কাজেই শীতেই হউক বা গ্রীষ্মেই হউক সর্বাবস্থায় কেবল তাঁহাকে স্মরণ করা। ইহার নামই তপস্যা। এইরূপ করিতে করিতে একদিন আবরণ নষ্ট হইয়া তাঁহার প্রকাশ হইবে।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেলে মা উঠিয়া পড়িলেন।

১লা বৈশাখ, সোমবার (ইং ১৪।৪।৫২) বেনারস এক্সপ্রেসে মা কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। কলিকাতায় তিন চারি দিন থাকিয়া পরে পুরী চলিয়া যান। পুরীতেও মা ৩।৪ দিন থাকিয়া আবার কলিকাতা আসেন এবং কলিকাতা হইতে ১৪ই বৈশাখ, রবিবার কাশী আসিয়া পুনরায় ১৭ই বৈশাখ, বুধবার পাঞ্জাব মেনে মা খান্না রওনা হইয়া গেলেন। এবার শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব খান্নাতেই হইয়াছিল। এবিষয়ে কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি নিজে সন্ন্যাসী হইয়াও মায়ের তিথি পূজার দিন রাত্রিবেলা মাকে প্রায় ৪ ঘণ্টা কাল পূজা করিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কিরূপ গাঢ় এবং স্বচ্ছ তহা এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। খান্না হইতে মা সোলনে চলিয়া যান এবং এখানেই মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। মাঝে কয়েকদিনের জন্য মা সিমলাতেও গিয়াছিলেন।

এবার গ্রীষ্মের সময় আমি কাশীতেই থাকিব বলিয়া স্থির করিয়া ছিলাম কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য উপলক্ষ্যে সপরিবারে কলিকাতা যাঁহতে হয়। ২১শে মে তারিখে আমি কলিকাতা রওনা হই। ইচ্ছা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪, অক্টোবর ১৯৯৯

না আনন্দময়ী অনুভবর্তা

৭

ছিল কার্য শেষ হইলে আমি জুন মাসের শেষ দিকে কাশী ফিরিয়া আসিব। কিন্তু কার্যাতঃ জুলাই মাসের ৫ই এর পূর্বে আর কাশী রওনা হইতে পারিলাম না। এদিকে শ্রীশ্রী মা ২রা জুলাই সোলন হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। ৭ই জুলাই-গুরু পূর্ণিমা। মা যখন কাশী হইতে থান্না চলিয়া যান তখন আমি খুকুনীদিদিকে বলিয়াছিলাম যে মা যাহাতে গুরুপূর্ণিমার সময় কাশী আসেন সে চেষ্টা যেন দিদি করেন। উহার ফলেই মায়ের এই সময় কাশীতে আগমন।

৬ই জুলাই আমি কাশী পৌঁছিলে দিদি আমাকে বলিলেন, “মাহার কথায় মা কাশী আসিলেন, আসিয়া দেখেন যে তিনিই অনুপস্থিত!” মাও ঐ বিষয় লইয়া কৌতুক করিয়াছিলেন।

২৩শে আষাঢ় (ইং ৭।৭।৫২) খুব ধুমধামের সহিত গুরুপূর্ণিমার উৎসব সম্পন্ন হইল। ঐ দিন শ্রীশ্রী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এবং মায়ের হাত হইতে প্রসাদী মালা লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। সমস্তদিনই পাঠ, কীর্তন এবং সদালোচনা প্রভৃতিতে কাটিয়া গিয়াছিল। রাত্রিবেলাও প্রায় ১টা পর্যন্ত আমরা শ্রীশ্রী মাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলাম।

(ত্রিশঃ)



“যদি একবার গুরু আশ্রয় দেন - যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্যের যা লক্ষ্য তা পূর্ণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু যাননা। গুরু যান না, এই প্রশ্নও ওঠে না। উনি যাবেন কোথায়? তাঁর কি যাওয়া আসার কোন প্রশ্ন আছে? তিনি যাবেন কোথায়? যাওয়ার প্রশ্ন নেই, — প্রকাশিত হবেন।”

— শ্রী শ্রী মা

তাত্ত্বিক দর্শনের পূর্ণতা.

(২)

— ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

এই নিজের স্বরূপকে ফিরে পাওয়ার মধ্যেই প্রত্যাবিষ্কারদর্শন নামেরও সার্থকতা। এখানে জানাটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে চেনা। যা'কে জানছি জড়রূপে, তা'কে চিনতে হ'বে চেতনরূপে। কোনো কিছুকে ফেলে দেওয়া, বর্জন করা বা তা'র থেকে নিজেকে পৃথক করা, আলাদা করা নয়; তা'কে আত্মসাৎ করা, নিজের অন্তর্ভুক্ত করা, আপন ব'লে চেনা। ইদংরূপে যে বিশ্ব এখন আমার বাইরে তা'কে অহংয়ের অন্তর্গত ক'রে নেওয়া এবং তা'র ফলে নিজের এই খণ্ডিত, পরিচ্ছন্ন, সীমাবদ্ধ, সংকুচিত অহংকে পূর্ণহস্তায় প্রতিষ্ঠিত করা। এ'টি কেমন ক'রে সম্ভব? শুধু বললাভে বা শক্তির বিকাশে, বিস্তারণে : 'বললাভে বিশ্বমাতৃসংকরেতি' (সূত্র ১৫)। বলটি কি? বল হ'ল সেই চিতিই যখন দেহ-প্রাণ-মনের আচ্ছাদন বা আবরণ দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজের স্বরূপকে জড়ের মধ্যে নিমগ্ন ক'রে ভাসিয়ে তোলেন অর্থাৎ নিজের পূর্ণ মহিমায় নিজেকে প্রকাশ করেন- 'চিতিরেব দেহপ্রাণাদ্যাচ্ছাদননিমজ্জনেন স্বরূপম্ উন্মগত্বেন স্ফারয়ন্তী বলম্'। এখন তিনি তাঁর সেই শক্তিকে সংকুচিত ক'রে মনাবৃত হ'য়ে সংসারী সেজে বসেছেন : 'চিদৎ তচ্ছক্তিসংকোচাৎ মনাবৃতঃ সংসারী' (সূত্র ৯)।

শক্তির সংকোচই তাই সংসারের মূল। অথচ এ সংকোচ অন্য কিছু'র দ্বারা বা বাইরের কারুর দ্বারা আরোপিত নয়, চাপানো নয়। এটা 'স্বেচ্ছাগৃহীত সংকোচ' নিজের ইচ্ছাতেই সংকুচিত হওয়া। এরই নাম 'স্বাতন্ত্র্য'। পরাধীন বা পরভক্ত হ'য়ে এই সংকোচনকে গ্রহণ করেননি ব'লেই আবার ইচ্ছামাত্রই এই সংকোচকে পরিহার করা বা দূর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। সেই সর্বব্যাপক মহান তিনি স্বেচ্ছায় সংকুচিত হ'য়ে অণু হ'লেন ছোট-হ'লেন। এই প্রাথমিক পরিচ্ছেদটিই, সংকীর্ণতাই হ'ল মূল মল, আদি মালিনা, যা'র পরিভাষিক নাম 'আনব মল'। এই অণু বা ক্ষুদ্র, ছোট হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় মল, 'মায়ীয়া মল', তাঁকে ঘিরে ফেলল। নইলে তিনি যতক্ষণ ব্যাপক মহান স্বরূপে প্রকাশিত, ততক্ষণ মায়ার সাধ্য কি তাঁকে স্পর্শ করে। এই মায়ীয়া মলের আবরণে আবৃত হওয়ার ফলেই তৃতীয়া 'কর্ম মলেও' তিনি বাঁধা পড়লেন। মল থেকে মুক্ত হ'লেই এই দর্শনের মতে পূর্ণ মুক্তি লাভ হয় না। যতক্ষণ না মূল মালিনা উপসংহৃত হ'চ্ছে, আনব মল বিদূরিত হ'চ্ছে, ততক্ষণ মুক্তি নেই।

সুতরাং দেখা গেল, শক্তির সংকোচ-বিকাশেই আমাদের বন্ধন ও মুক্তি। পশুপতি পশু হ'চ্ছেন নিজের শক্তির দরিদ্রতা, অবক্ষয়ে, সংকোচে - 'শক্তিদরিদ্রঃ সংসারী উচ্যতে, স্বশক্তিবিকাশে তু শিব ইব' (সূত্র ৯ ভাষ্য)। পঞ্চব্রহ্ম পশুপতির পাঁচটি শক্তি সর্বদা সক্রিয় ও সহজাত : সর্বকর্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, পূর্ণত্ব, নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব। কিন্তু পশু দশায় এ পাঁচটি শক্তিই তাঁকে বেঁধে ফেলেছে পঞ্চ কণ্ঠকের রূপ নিয়ে। ব্রহ্মত্বের কল, বিনা, রাগ, কাল ও নিয়তিরূপে। সব কিছু করবার যার শক্তি ছিল তিনিই এখন কালকবলিত

হ'য়ে সীমিত কর্তৃত্বের মাত্র অধিকারী হ'লেন। সব কিছু জানবার সামর্থ্য ঘুচে গিয়ে খণ্ডিত জ্ঞান বা বিদ্যার কণ্ঠকে তিনি বাঁধা পড়লেন। পূর্ণত্বের পরিতৃপ্তি ছিল যাঁর মধ্যে আজ তা' হারিয়ে অতৃপ্তি দেখা দিল রাগ বা তৃণার রূপ নিয়ে। যিনি ছিলেন নিত্য কালাতীত, তিনি কালের কবলে পড়ে এখন আছেন তখন নেই, এভাবে হ'য়ে উঠলেন অনিত্য; পরিণামী, ক্ষণস্থায়ী। সব জায়গা জুড়ে যিনি ছিলেন সর্বব্যাপী, তিনি এখন নিয়তির নির্দেশে একটি সীমিত স্থানে - এখানে আছেন, ওখানে নেই - এইভাবে আবদ্ধ হ'য়ে গেলেন। পূর্ব-উল্লিখিত তিনটি মলও তাই তাঁকে আবরণ করে তাঁর মৌল তিনটি শক্তির সংকোচের ফলেই। অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যই যা'র স্বরূপ সেই ইচ্ছাশক্তি সঙ্কুচিত হ'য়ে জন্ম দেয় অপূর্ণস্বন্যাতরূপ আগব মনকে। তেমনি জ্ঞানশক্তি সংকোচের ফলে দেখা দেয় মায়ী মল, যা সর্বজ্ঞকে ক'রে তোলে অল্পজ্ঞ এবং অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি করণবর্গের অধীন ক'রে নিজের থেকে ভিন্ন বা আলাদারূপে জ্ঞেয় বা বৈদ্য বিষয়কে উপস্থাপিত করে। আবার ত্রিগ্নাশক্তিও সঙ্কুচিত হ'য়ে সৃষ্টি করে কর্ম মল, যা'র দরুণ সর্বকর্তৃত্বের স্থানে দেখা দেয় কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব এবং তা-ও আবার নির্ভরশীল কর্মেদ্রিয়ার উপর, যা শুভ অশুভ নানা কর্মজালে জড়িয়ে দেয়।

আমরা তা হ'লে লক্ষ্য করলাম যে শক্তির সংকোচ-বিকাশই জীব ও শিবের ভেদের নিদান। শক্তির বিকাশ বা বিস্তার ঘটলে বিশ্ব আমার বা অহংয়ের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়; শক্তির সংকোচ ঘটলে বিশ্ব আমার বা অহংয়ের বাইরে চলে গিয়ে ইদংরূপে ভাসে। অহংরূপে বিশ্বকে উপলব্ধি করা, 'এ যে' সব আমিই' এই চেনার মধ্যেই মুক্তি; আর এ সব আমার থেকে পৃথক, আলাদা, এই বোধই বন্ধন। বন্ধন ও মোচন, তাই দুই-ই এই শক্তির খেলা। যখন বাঁধেন তখন ইদংকে করেন উচ্ছ্রিত; উদ্দীপিত, আর যখন বিমোচন করেন তখন অহংকে করেন উন্নমিত। বাইরের বিশ্বকে তুলে ধরে মনের উপর চাপিয়ে ভারাক্রান্ত ক'রে তা'কে বোধ রাখেন, আবার সে সব দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধু নির্মল চৈতন্যকে উদ্ভাসিত ক'রে মুক্তি দেন। 'মাতৃকাচক্রবিবেক' নামক গ্রন্থে তাই বড় সুন্দর ক'রে বলা হ'য়েছে যে এই পরা জননীই একমাত্র উপাসনীয়া বা উপাসনার যোগ্যা, কারণ বন্ধন-মুক্তি সবই তাঁর করায়ত্ত -

তস্মাৎ পঠৈব জননী সমুপাসনীয়া ব্যোমঃ পরস্য গতজাড্যমিয়ং হি রূপম্।

বদ্ধাতি চেয়মিদমংশসমুচ্ছ য়েণ জন্তুন্ বিমোচয়তি চোন্মমিতাহমংশাৎ।।

এই পরা জননী হ'লেন সেই বিমর্শশক্তি যিনি চৈতন্য রূপ পরম ব্যোমের বা আকাশের জড়তা ঘুচিয়ে প্রকাশ বা আলোয় ভরে তোলেন, অনন্ত-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকার ঝিকিমিকি ফুটিয়ে তুলে সেই অবর্ণ রিভ্র আকাশকে সমুজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত ক'রে তোলেন। অহং-ইদংয়ের দুই প্রান্ত জুড়ে চলছে বিমর্শশক্তির ক্রীড়। এই পরা জননীর লীলা, আরোহ-অবরোহ ক্রমে। অবরোহণের ধারাটি অনুসরণ করলে উপনিষৎ পণ্ডা যাবে, কেমন ক'রে চেতনই জুড়ে রূপান্তরিত হ'য়েছে, শিবই জীবের পরিণত হ'য়েছেন।

প্রকাশস্বরূপ 'শিব'ই এ দর্শনে সকলের আদি ও মূল তত্ত্ব। তাঁরই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ অর্থাৎ তাঁরই সঙ্গে অভিন্ন বিমর্শশক্তির ত্রিগ্নার ফলে যখন প্রথম সংকোচের সূচনা হয়, তখন তত্ত্ব হিসেবে দেখা দেয়

‘সদাশিব’। শিবাবস্থায় সবই অহংয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে ইদংয়ের ছায়াপাতও ঘটেনি, তাই বিশ্ব সেখানে ‘পরবিশ্ব’ অপর বা আলাদা নয়, অহংরূপেই সেখানে সব কিছু অনুভূত বা গৃহীত। ‘সদাশিব’ অবস্থায় কিন্তু অহংয়ের এক প্রান্তে যেন ইদংয়ের ছায়া দেখা দিয়েছে। যদিও সবই তখনও অহংত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত, তবু অস্ফুট ইদম্বা যেন উঁকি মারছে ‘ধারানিবন্ধেব কলঙ্করেখা’র মত। বিশ্ব তাই এখানে ‘পরাপর’ বিশ্ব, কারণ অপরের বা আলাদা রূপে ভানের বা প্রতিতির এখানে সূচনা হ’য়েছে। এর পর তৃতীয় স্তরে যে তত্ত্বটি উদ্ধৃত হ’ল তিনি হ’লেন ‘ঈশ্বর’। এখানে ইদং আর অস্ফুট নয়, সে স্ফুট হ’য়ে অর্ধেক স্থান জুড়ে বাসেছে, সমানাদিকরণ লাভ করেছে অহংয়ের সঙ্গে। তবে এখনও অহং থেকে বিচ্ছিন্ন হ’য়ে আলাদা হ’য়ে বেরিয়ে যায়নি। এরও পরে চতুর্থ স্তরে ‘সদ-বিদ্যা’ বা শুদ্ধ বিদ্যার অবস্থায় ইদং যেন নিজের স্বাধীন অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে উন্মুখ, যদিও তখনও অহংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হ’য়ে আছে। বিমর্শ বা অনুভূতির দিক দিয়ে বলা চলে, শিব অবস্থায় শুধু অহং বিমর্শ, সদাশিব অবস্থায় অহং-ইদং বিমর্শ, ঈশ্বর অবস্থায় ইদং-অহং বিমর্শ, আর বিদ্যা অবস্থায় অহং, অহং-ইদং, ইদং বিমর্শ অর্থাৎ দুইটিই তখন তুলা মূল্য। এর পরই প্রাধান্য এসে যায় ইদংয়ের - যখন পঞ্চম স্তরে, ‘মায়া’ তত্ত্বে আমরা উপনীত হই। ইদং সেখানে অহংয়ের বাইরে চলে যায়, ভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হ’তে থাকে। যা ছিল নিজেরই অংশ, তাই হ’য়ে যায় পর, মায়ার প্রভাবে- ‘মায়াবিভেদবুদ্ধিনির্জাংশজাতেষু নিখিল জীবেষু (ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বসন্দোহ - শ্লোক ৫)। মায়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বালোচিত পঞ্চ কল্পক এসে ঘিরে ধরে এবং তা’র ফলে শিব হ’ন জীব, পশুপতি হ’ন পশু, খণ্ড পরিচ্ছিন্ন প্রমাতারূপ ‘পুরুষ’, আর তা’র সামনে এসে হাজির হয় ত্রিগণিময়ী ‘প্রকৃতি’ এবং সেই প্রকৃতির ‘মহাদাদি’ ক্রমে পরিণাম হ’তে হ’তে শেষ পঞ্চ ‘মহাভূতে’ পর্যবসান এবং তা’রও পর্যবসান এই ক্ষিতি বা ‘ধরণীতে’। এই হ’ল ‘শিবাদিধরণ্যন্তম্’ বিশ্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে আমরা অন্ততঃ এইটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে এক পরম প্রকাশের মধ্যেই এই বিশ্ব বিধৃত। এই পরম প্রকাশই ‘পরপ্রমাতা’ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা, যাঁর বাইরে কোনো প্রমেয় বা জ্ঞেয় বিষয় নেই এবং যেহেতু প্রমেয় বা জ্ঞেয় বিষয় নেই সেইজন্য প্রমাণ বা তা’ জানবার কোনো কারণেরও অস্তিত্ব বা প্রয়োজন নেই। তখন ‘পশ্যতচক্ষুঃ স শৃণোতাকর্ণঃ’ অবস্থা। এখানে প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়ের ত্রিপুরা-বিলয় ঘটে থাকে। এই মূল প্রমাতা বা পরপ্রমাতা তাই অখণ্ড মহাপ্রকাশ। এই মহাপ্রকাশ থেকে বিচ্ছুরিত একটি জ্যোতিষ্কের মত বেরিয়ে এসেছে যেন এই ‘মিতপ্রমাতা’ বা খণ্ডপ্রমাতা। প্রমাতার এই খণ্ডভাব বা পরিচ্ছিন্নভাব সংকোচের ফলেই ঘটে থাকে সন্দেহ নেই। সর্বব্যাপক এই চৈতন্য যখন প্রথম নিজেকে সঙ্কুচিত করেন বা গুটিয়ে আনেন, তখন সর্বাগ্রে যে অবস্থাটি সৃষ্টি সেটি হ’ল শূন্য। বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক’রে বিশ্বকে আশ্রয় করে ছিলেন যে শিব তখন তিনি হ’য়ে পড়েন ‘অনাপ্রাণিত শিব’ এবং তখন তিনি পরপ্রমাতা নন, তখন তিনি ‘শূন্যপ্রমাতা’। সেই শূন্য বা মহাকাশে তারপর দেখা দেয় প্রাণের প্রবাহ, যেন বায়ুর হিলোল জাগে। তাই বলা হয়, ‘প্রাক্‌ সন্ধিঃ প্রাণে পরিণতা’। এই অবস্থায় তিনি হ’ল ‘প্রাণপ্রমাতা’। তারপর সেই প্রাণই গড়ে তোলে পৃথিবী, সূক্ষ্ম বাসনাময় দেহ - যা’র উপাদান হ’ল মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। তখন তিনি এই সূক্ষ্মদেহের প্রমাতা বা ‘পৃথিবীপ্রমাতা’। সব শেষে স্থূল দেহের গঠন হ’লে তিনি সেখানে হ’ল ‘দেহপ্রমাতা’।

এইভাবে পরপ্রমাতা সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে 'মিতপ্রমাতা' বা খণ্ডপ্রমাতা হ'য়ে বসেছেন এবং ফলে প্রমেয় বা জ্ঞেয় তাঁর বাইরে পড়ে গিয়েছে। সেই প্রমেয় বা জ্ঞেয়কে ধরবার বা জানবার জন্য তাই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ছে প্রমাণের, করণের, গ্রহণের। পরপ্রমাতা থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেমন বেরিয়ে এল খণ্ডপ্রমাতা বা মিতপ্রমাতা, তেমনি সেই মিতপ্রমাতার radiation বা বিচ্ছুরণ হ'ল প্রমাণ। সেই radiation বা আলোকচ্ছটা যেখানে গিয়ে পড়ছে বা শেষ হচ্ছে সেইটি হল প্রমেয়। প্রমাণ হ'ল চৈতন্যের প্রবাহরূপ, যেন জলধারা, আর প্রমেয় হল ঘনীভূত রূপ, যেন বরফের টুকরো, iceberg - আসলে তা-ও জল ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞেয়টা তাই জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু নয়, কারণ সে জ্ঞানের মধ্যেই ভাসছে। প্রমাণের মধ্য থেকেই প্রমেয় বাহির হ'য়ে আসে, আবার প্রমাণের মধ্যেই সঙ্কুচিত বা লীন হ'য়ে যায়। এইরূপে প্রমেয়কে গ্রাস করেন প্রমাতা এবং শেষ প্রমাতাকে গ্রাস করেন পরপ্রমাতা এবং সেইখানেই পূর্ণহস্ত। এই হ'ল ফেরার ক্রম।

এই সঙ্কোচ-প্রসার যার আয়ত্তাধীন, তিনিই যথার্থ যোগী। তাঁর চোখ খোলা থাকলেও এবং দৃশ্য বস্তু সামনে থাকলেও রূপ দর্শন হ'বে না, যদি তিনি প্রমাণকে সঙ্কুচিত বা প্রত্যাহত ক'রে রাখেন। প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমেয় এই ত্রিপুরিসহযোগে জ্ঞান প্রাণিমাত্রেরই হ'য়ে থাকে, গ্রাহ্য-গ্রাহকের এই বোধ সর্বসাধারণ কিন্তু বোধের বা জ্ঞানের এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা কেউ সচেতন নই, অবধানযুক্ত মই। শুধু যোগিগণ এই গ্রাহ্য-গ্রাহকের সম্বন্ধ বিষয়ে অবধানযুক্ত ব'লে এর রহস্য সম্বন্ধে সচেতন। তাই বলা হ'য়েছে —

গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিন্ধিঃ সামান্যা সর্বদেহিনাম্।

যোগিনাং তু বিশেষোছয়ং সম্বন্ধে সাবধানতা।।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্র তাই বলেন যে এই উপলব্ধি অনায়াসেই সকলে লাভ করতে পারে যদি একটু অবহিত হ'য়ে লক্ষ্য করে প্রমেয় কেমন ক'রে প্রমাণের উপর আরোহণ ক'রে প্রমাতাতে গিয়ে আবিষ্ট হ'চ্ছে বা মিলিত হ'চ্ছে। জ্ঞানের এই সর্বদা সংঘটিত ও সদা অনুভূত সর্বপ্রাণিসাধারণ প্রক্রিয়াটির উপর অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি দিলেই সেই পরপ্রমাতার অনুভব বা শিবের উপলব্ধি সবাই লাভ করতে পারে। তখন বিশ্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করা হ'য়ে যায়, নিজের বাইরে আর কিছু থাকে না, সবই চৈতন্যের অগিতে একীভূত হ'য়ে যায়, মিলে যায়। এরই নাম 'অলংগ্রাস', চিদগিসাদ্ভাব'।

(ক্রমশঃ)

“যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, একমাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। সর্বদা ভগবানের ধ্যান করা, তাঁহার নাম লইতে চেষ্টা করা। তাঁহার নাম ভজনে সর্বরোগ আরোগ্য হয়।” — শ্রী শ্রী মা

মা'কে — মা আনন্দময়ীকে পাওয়া

— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মা অণুক্ষণ আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখি না; দেখতে চেষ্টা করি না। মা আমাদের ধরা দিতে নিয়ত ব্যাকুল, কিন্তু আমরা ব্যাকুল ছেড়ে দিতে। মা আমাদের শূন্য পাত্রটি কানায় কানায় ভরে দিতে চান, কিন্তু আমরা চাই পাত্রকে উপুর করে রাখতে। এ আত্মপ্রবঞ্চনার শেষ কোথায়?

কিসের আশায় আমরা নিরন্তর ছুটছি? বিষয়? কিন্তু, তা যে 'বিষ হয়', সে-কথা আমরা কবে বুঝবো? সংসারের যে 'সঙ্ক-ই সার', তা আমরা মুখস্থ বুলির মতো আওড়াই, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি কই? কিন্তু জগৎ যে অহরহ 'সরে সরে যায়', প্রতি মুহূর্ত পাল্টায়! তাকে কিনা নিতা ভেবে বসে থাকলাম! অনিত্যকে ভাবলাম সার বস্তু। মাকে আমরা কী করে পাবো? না পাওয়ার বোধটুকুও যেন হারাতে বসেছি। ভাবছি, এই তো বেশ আছি! এই রকমই চিরকাল চলবে। সংসারের ক্ষীর-সবটুকু খাবো আর ওদিকে মাঝে মাঝে "মা-মা" করবো। এভাবেই মা'কে পেয়ে যাবো একদিন। কিন্তু তা কী করে হয়? সব ছেড়ে মায়ের কোলে ঝাঁপ না দিলে, তিনি কেন আমাদের আশ্রয় দেবেন?

এদিকে কথায় কথায় কত অভিমান আমাদের! প্রায়ই বলে থাকি, আমরা আশ্রিত। আসলে আমাদের অধিকাংশই মায়ের প্রশ্রয় পেয়েছি। তাঁর অযোগ্য সন্তান আমরা। মা আছেন, আমাদের দেখছেন ধরে নিয়ে নিজেদের খুশিমত চলছি। কিন্তু কী দেখবেন তিনি? কোথায় দেখবেন? যে ছেলেকে নাকি মা ধরে আছেন ধরে নিয়ে খেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, মা তার জন্য কী করতে পারেন? অথচ প্রায়ই আমরা আত্মপ্রশাদ লাভ করি এই ভেবে যে, মা'র দৃষ্টি সর্বত্র; তিনি সব জায়গায়ই আমাদের দেখছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল মা'র দৃষ্টি যে সর্বত্র, এ-কথা যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা বলছি? আর উপলব্ধি যদি না হয়ে থাকে, তা একরূপ উক্তি নিজেদেরই ঠকবার পথ প্রশস্ত করে না কি? এর চেয়েও বড় কথা, মা সর্বতোদ্রষ্টা, এ-কথা বলার অধিকারী কি আমরা? হ্যাঁ, হ্যাঁ!

অনেকেই দুঃখ করেন, মা'র কাছে গিয়ে পড়লাম! কত সঙ্গ করলাম মায়ের! কিন্তু কই, কিছুই তো হল না! মা এদের অনেকের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, মশা-মাছিও তো কত সময় গায়ে বসে! কী হয় ওদের? ঠিক কথা। মায়ের সঙ্গ করেছে বলে আমার আগে হবে, নিজের সম্পর্কে একরূপ উচ্চ বারণা করার মতো মূর্খামি আর কিছু নেই! মা এদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "কোপড়ে একটু কালির লাগ লাগলে তা তুলতে কত সময় লাগে, আর চিঙের এত গাঢ় ময়লা কি 'দু'-চার দিনেই উঠে যাবে?"

এদিকে চিঙের ময়লা না উঠলে সহজ হবে কী করে? কী করে শিশুর সারলাকে পাবো? মা'র কোলে ঝাঁপ দেবো? মা'কে লাভ করবো? ময়লা ওঠাবার জন্যে চাই গুরুত্ব উপদেশের ওপর

অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা - সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদি। মা বলেছেন, “নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনাদিতে মনোনিবেশ কর। ফল দেবেই দেবে, সব হবে, সব হবে।”

মা'র কাছে পাপী-পুণ্যাত্মায় ভেদ নেই। পাপী তাপী সবাই তাঁকে পেতে পারে। চাই শুধু নিষ্ঠা, ধৈর্য ও আন্তরিকতা; অপার বিশ্বাস নিয়ে তাঁতে আত্মসমর্পণ। তিনি ভার নেবেনই নেবেন। তিনি যে বাতাসের মতো, - সুগন্ধ-দুর্গন্ধ নির্বিশেষে সবেই আশ্রয়; নদীর মতো, ভালো-মন্দ সব কিছুকেই নিজের ধারা স্রোতের সঙ্গে টানেন। মা'র কথায়, “পাপ-পুণ্য? পাপী-পুণ্যাত্মা? যেমন নদীর স্রোত বিষ্ঠা ও চন্দন সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে নিয়ে যায়, বাতাস দুর্গন্ধ কি বিচার করে? চন্দ্র-সূর্য সর্বত্রই আলো দেয়— এ শরীরের নিকটও সেই কথা।”

মা'র কাছে দূর-নিকট নেই, জানা-অজানা নেই। যে চায়, সে-ই পায় তাঁকে। তবে মন মুখ এক করে চাইতে হবে। চিন্তে কামনা-বাসনার এতটুকু আঁশ লেগে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। অপরদিকে নিবেদন যদি হয় খাঁটি, আন্তরিক, তবে যেখানে যা কিছু নিবেদিত হোক না কেন, তাঁরই কাছে গিয়ে পৌঁছবে। এ নিয়ে অভয়-আশ্বাস দিয়েছেন তিনি, “এ শরীরের কাছে দূর-নিকটের কোনো পার্থক্য নাই। জানা-অজানা বলিয়া কিছু নাই। যে ঠাকুরের কাছে যে যার অন্তরের নিবেদন, এ শরীরের কাছেই সব।”

আন্তরিকভাবে সবাই আমরা শান্তি খুঁজে মরি। কিন্তু কোথায় শান্তি পেতে চাই আমরা? কেউ ধনে, কেউ পুত্রে, কেউ মান-সম্মানে। ভুলে যাই যে এগুলো সবই অনিত্য; আজ আছে, কাল নেই। এদের প্রতি মমত্ব ও লালসা আমাদের অশান্তি ও দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়। চিরশান্তি আছে মা'তে। তাঁকে পেলে সব অশান্তি দূরে যায়, সংসার-দহন আর স্পর্শ করতে পারে না, বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতেহতে এ সংসারে আসতে হয় না, কাটতে হয় না ‘Return ticket’ আর। “তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলে, সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়।” অর্থাৎ নির্ভয় নিশ্চয় নির্বন্ধ অব্যয় হওয়া যায়।

অনেকেই হাহাকার করেন, “মা তো শরীরে আমাদের মধ্যে নেই! কী করে তাঁকে মনের কথা কাকে জানাই?”..... কিন্তু মা'য়ে চিরন্তনী। এ সত্যটি যিনি বুঝবে না, তিনি তাঁকে পেতে চান কোন্ সাহসে? মা'নিজেই বলেছেন এ-নিয়ে, “কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে তো আসা-যাওয়া নেই। তখনো মা, এখনো তা, মরা-বাঁচা আবার কী? মারা গিয়েও যে আছেই, তার মধ্যে আর কী কথা।” আর তাছাড়া মা বার বার বলেছেন, “আমি তোমাদের সবচেয়ে কাছের। তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় আমি; তোমরা তা হয়তো জানো না।”

খাঁটি কথা; মায়ার আবরণে আবৃত বলেই আমরা জানি না। আমাদের সবচেয়ে আপন যিনি, তিনি তো পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না। মা আত্মপরিচয়ে বলেছেন, তিনি পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ। অতএব, মা-কে পাওয়া মানে, পূর্ণকেই পাওয়া।

মা'কে — মা আনন্দময়ীকে পাওয়া

— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মা অগুরুণ আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখি না ; দেখতে চেষ্টা করি না। মা আমাদের ধরা দিতে নিয়ত ব্যাকুল, কিন্তু আমরা ব্যাকুল ছেড়ে দিতে। মা আমাদের শূন্য পাত্রটি কানায় কানায় ভরে দিতে চান, কিন্তু আমরা চাই পাত্রকে উপর করে রাখতে। এ আত্মপ্রবঞ্চনার শেষ কোথায়?

কিসের আশায় আমরা নিরন্তর ছুটছি? বিষয়? কিন্তু, তা যে 'বিষ হয়', সে-কথা আমরা কবে বুঝবো? সংসারের যে 'সঙ্ক-ই সার', তা আমরা মুখস্থ বুলির মতো আওড়াই, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি কই? কিন্তু জগৎ যে অহরহ 'সরে সরে যায়', প্রতি মুহূর্ত পাল্টায়! তাকে কিনা নিত্য ভেবে বসে থাকলাম! অনিত্যকে ভাবলাম সার বস্তু। মাকে আমরা কী করে পাবো? না পাওয়ার বোধটুকুও যেন হারাতে বসেছি। ভাবছি, এই তো বেশ আছি। এই রকমই চিরকাল চলবে। সংসারের ক্ষীর-সবটুকু খাবো আর ওদিকে মাঝে মাঝে "মা-মা" করবো। এভাবেই মা'কে পেয়ে যাবো একদিন। কিন্তু তা কী করে হয়? সব ছেড়ে মায়ের কোলে বাঁপ না দিলে, তিনি কেন আমাদের আশ্রয় দেবেন?

এদিকে কথায় কথায় কত অভিমান আমাদের! প্রায়ই বলে থাকি, আমরা আশ্রিত। আসলে আমাদের অধিকাংশই মায়ের প্রশ্রয় পেয়েছি। তাঁর অযোগ্য সন্তান আমরা। মা আছেন, আমাদের দেখছেন ধরে নিয়ে নিজেদের খুশিমত চলছি। কিন্তু কী দেখবেন তিনি? কোথায় দেখবেন? যে ছেনো নাকি মা'র ধরে আছেন ধরে নিয়ে খেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, মা তার জন্য কী করতে পারেন? অথচ প্রায়ই আমরা আত্মপ্রশংসা লাভ করি এই ভেবে যে, মা'র দৃষ্টি সর্বত্র; তিনি সব জায়গায়ই আমাদের দেখছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল মা'র দৃষ্টি যে সর্বত্র, এ-কথা যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা বলছি? আর উপলব্ধি যদি না হয়ে থাকে তো! একপাশে উক্তি নিজেদেরই ঠকবার পথ প্রশস্ত করে না কি? এর চেয়েও বড় কথা, মা সর্বতোদ্রষ্টা, এ-কথা বলার অধিকারী কি আমরা হয়েছি?

"অনেকেই দুঃখ করেন, মা'র কাছে গিয়ে পড়লাম! কত সঙ্গ করলাম মায়ের! কিন্তু কই, কিছুই তো হল না! মা এদের অনেকের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, মশা-মাছিও তো কত সময় গায়ে বসে! কী হয় ওদের? ঠিক কথা। মায়ের সঙ্গ করেছে বলে আমার আগে হবে, নিজের সম্পর্কে একপাশে উপলব্ধি করার মতো মর্খামি আর কিছু নেই। মা এদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "কাপড়ে একটু কাণির লাগ লাগলে তা তুলতে কত সময় লাগে, আর চিঙের এত গাঢ় ময়লা কি 'দু'-চার দিনেই উঠে যাবে?"

এদিকে চিঙের ময়লা না উঠলে সহজ হবে কী করে? কী করে শিশুর সারল্যকে পাবো? মা'র কোলে কাপ দেবো? মা'কে লাভ করবো? ময়লা ওঠাবার জন্যে চাই গুরুত্ব উপদেশের ওপর।

অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা - সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদি। মা বলেছেন, “নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনাদিতে মনোনিবেশ কর। ফল দেবেই দেবে, - সব হবে, সব হবে।”

মা'র কাছে পাপী-পুণ্যাত্মায় ভেদ নেই। পাপী তাপী সবাই তাঁকে পেতে পারে। চাই শুধু নিষ্ঠা, ধৈর্য ও আন্তরিকতা; অপার বিশ্বাস নিয়ে তাঁতে আত্মসমর্পণ। তিনি ভার নেবেনই নেবেন। তিনি যে বাতাসের মতো, - সুগন্ধ-দুর্গন্ধ নির্বিশেষে সবারই আশ্রয়; নদীর মতো, ভালো-মন্দ সব কিছুকেই নিজের ধারা স্রোতের সঙ্গে টানেন। মা'র কথায়, “পাপ-পুণ্য? পাপী-পুণ্যাত্মা? যেমন নদীর স্রোত বিষ্ঠা ও চন্দন সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে নিয়ে যায়; বাতাস দুর্গন্ধ কি বিচার করে? চন্দ্র-সূর্য সর্বত্রই আলো দেয়— এ শরীরের নিকটও সেই কথা।”

মা'র কাছে দূর-নিকট নেই, জানা-অজানা নেই। যে চায়, সে-ই পায় তাঁকে। তবে মন মুখ এক করে চাইতে হবে। চিন্তে কামনা-বাসনার এতটুকু আঁশ লেগে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। অপরদিকে নিবেদন যদি হয় খাঁটি, আন্তরিক, তবে যেখানে যা কিছু নিবেদিত হোক না কেন, তাঁরই কাছে গিয়ে পৌঁছবে। এ নিয়ে অভয়-আশ্বাস দিয়েছেন তিনি, “এ শরীরের কাছে দূর-নিকটের কোনো পার্থক্য নাই। জানা-অজানা বলিয়া কিছু নাই।” যে ঠাকুরের কাছে যে যার অন্তরের নিবেদন, এ শরীরের কাছেই সব।”

আন্তরিকভাবে সবাই আমরা শান্তি খুঁজে মরি। কিন্তু কোথায় শান্তি পেতে চাই আমরা? কেউ ধনে, কেউ পুত্রে, কেউ মান-সম্মানে। ভুলে যাই যে এগুলো সবই অনিত্য; আজ আছে, কাল নেই। এদের প্রতি মমত্ব ও লালসা আমাদের অশান্তি ও দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়। চিরশান্তি আছে মা'তে। তাঁকে পেলে সব অশান্তি দূরে যায়, সংসার-দহন আর স্পর্শ করতে পারে না, বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতেহতে এ সংসারে আসতে হয় না, কাটতে হয় না ‘Return ticket’ আর। “তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলে, সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়।” অর্থাৎ নির্ভয় নিশ্চয় নির্বন্ধ অব্যয় হওয়া যায়।

অনেকেই হাহাকার করেন, “মা তো শরীরে আমাদের মধ্যে নেই! কী করে তাঁকে মনের কথা কাকে জানাই?”..... কিন্তু মা'য়ে চিরন্তনী। এ সত্যটি যিনি বুঝবেন না, তিনি তাঁকে পেতে চান কোন্ সাহসে? মা'নিজেই বলেছেন এ-নিয়ে, “কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে তো আসা-যাওয়া নেই। তখনো যা, এখনো তা, মরা-বাঁচা আবার কী? মারা গিয়েও যে আছেই, তার মধ্যে আর কী কথা।” আর তাছাড়া মা বার বার বলেছেন, “আমি তোমাদের সবচেয়ে কাছের। তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় আমি; তোমরা তা হয়তো জানো না।”

খাঁটি কথা; মায়ার আবরণে আবৃত বলেই আমরা জানি না। আমাদের সবচেয়ে আপন যিনি, তিনি তো পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না। মা আত্মপরিচয়ে বলেছেন, তিনি পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ। অতএব, মা-কে পাওয়া মানে, পূর্ণকেই পাওয়া।

পেতে গেলে চিনতে হয়, জানতে হয়, ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। জীবনস্বভাব নিয়ে তা যে করা যায় না। তাই মা'কে জানা কঠিন হয়ে ওঠে উত্তরোত্তর। অথচ যে তাঁকে যথার্থই জানে, সে মা-ময়। মা'র কথায়, “আমি ও সে এক।” যে মাকে জানতে চেষ্টা করে, সে খানিকটা হলেও এগিয়ে; মার ভাষায়, “আমি তার নজদিগ্ (নিকটে)।” আর যে মাকে জানে না বা জানতে চেষ্টা করে না সে হতভাগ্য। মা বলেন, “আমি তার নিকট ভিক্ষুক।”

ভিক্ষুক কেন? সে সংপথে আসুক, এই ভিক্ষা চাইছেন বলে। কিন্তু ভিক্ষা তো সকলের কাছেই চেয়েছেন মা। বেশী কিছু নয়, দিনে অন্ততঃ দশ মিনিট করে সময়। কতবার বলেছেন, এই সময়টুকু যেন আমরা প্রার্থনার জন্য বরাদ্দ রাখি। এই তাঁর ভিক্ষা। কিন্তু কত জন মা'র কথা শোনেন? যারা শোনেন না, তারা মা'কে পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে নিকটে পাবার সুযোগও যে হারাচ্ছেন! দুর্বুদ্ধি ক্রমশঃই মা'র সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে।

মা'র নাম-ঠিকানা তিনি নিজেই দিয়েছেন :- “অব্যক্ত ধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম।” অর্থাৎ, মা'কে পেতে হলে অনিত্য বস্তু ছেড়ে নিত্যকে ধরতে হবে। এই নিত্যের স্থিতি অব্যক্তে। তাকে মুখে প্রকাশ করা যায় না, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শুধুমাত্র নিজেকে চিনলেই সেখানে পৌঁছান যায়। নিজের আসল পরিচয় জানা মানেই মা'র অমৃতলোকে পৌঁছে যাওয়া। সেখানে শুধুই আনন্দ, কেবলই অমৃত। আর সেই সব কিছুর আধার মা। অতএব তাঁকে পেলেই সব পাওয়ার শেষ। তাঁকে জানলেই সব জানার সমাপ্তি। এক কথায়, “মা-কে জানা মানে মা-কে পাওয়া, আর মা হয়ে যাওয়া।”



“ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ডাক্তার যেমন ফোঁড়া কেটে বিষাক্ত বস্তু বার করে রোগ নিরাময় করে — ভগবানও দুঃখ দিয়ে ধুয়ে মুছে কোলে টেনে নেন। ভগবান সমস্ত দোষ শোধন করেন — বলেন তোরা আমাকে তোদের সব মলিনতা দিয়ে দে, তার বদলে অমৃতত্ব গ্রহণ কর। ভক্তকে তিনি ব্যথা দেন, দুঃখ দেন, তার আগ্রহ আকুলতা বাড়ানোর জন্য। তার ব্যথার পূজা, চোখের জল তিনিই গ্রহণ করেন।” — শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কথামৃত

(শ্রীশ্রীমার শুভ আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে গত ১৯ শে বৈশাখ (৩রা মে, ১৯৯৯) এর পূণ্যপ্রভাতে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের ব্যবস্থাপনায় কলিকাতা টিভির চ্যানেল দুটির মাধ্যমে মায়ের বিষয়ে একটি ২৫ মিনিটের অনুষ্ঠান দেখানো হয়। ঐ সচিত্র অনুষ্ঠানে যে ধারাবাহ্যটি শোনা গিয়েছিল সেটি নিম্নে প্রদত্ত হল।)

আনন্দের মূর্ত্ত প্রতিমা তিনিই আনন্দময়ী মা। তাপিত সন্তানের আর্ন্তিতে, তাদের চিন্তে শাস্তি দিতে জগৎজননীর আনন্দময়ীরূপে এই ধরায় আগমন।। দুঃখে কষ্টে ব্যথায় সন্তান যে কেবল মায়ের কোল খোঁজে, সেখানে ব্যথা নেই শুধুই আনন্দ, সেখানে হিংসা নেই, শুধুই প্রেম, এমনই কোল পেতে জগৎজননী এলেন আমাদের দ্বারে - আমাদের মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ করতে। না এসে উপায় কি? মা-ই বলেন- “তোমরা চেয়েছো তাই পেয়েছো”।

বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ছোট একটি গ্রাম — খেওড়া। ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ৩০ শে এপ্রিল, ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৯ শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার এই খেওড়া গ্রামেই মায়ের আবির্ভাব হলো এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। মাতা মোক্ষদাসুন্দরী, পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য। মায়ের মা সখ করে শিশুকন্যার নাম রাখলেন ‘নির্মলা’। বারো বছর দশ মাস বয়সে ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে মার লৌকিক বিবাহ সম্পন্ন হলো। তাঁদের বিবাহ ছিল ঐশ্বরিক, জাগতিক সম্পর্কহীন। পরবর্তীকালে রমণীমোহন ভোলানাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বিবাহের পর মা তাঁর ভাসুরের সংসারে বছর তিনেক থাকার পর রমণীমোহনের কর্মস্থলে এলেন অষ্টগ্রামে। আগুন যেমন ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় না, তেমনই নিত্যপ্রসন্ন, কর্মনিপুণ, সদাহাস্যময়ী বধূটির সংস্পর্শে অষ্টগ্রামে যাঁরাই এসেছিলেন তাঁরাই অভিভূত হলেন। এখানে কেউ তাঁকে ডাকেন “খুশীর মা”; আবার এখানেই একদিন আত্মভোলা হরকুমার সাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করে ভবিষ্যৎ বাণী করলেন “আজ আমি আপনাকে মা বলে ডাকছি, একদিন বিশ্বজগৎ আপনাকে মা বলে ডাকবে।”

ভোলানাথের পরবর্তী কর্মস্থল বাজিতপুরে মা এলেন ১৯১৮ সালে। এখানেই মায়ের খেয়ালের সাধনার শুরু। সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও তাঁর শরীরে সমাধির ভাব দেখা যেত, পরিজনেরা অবশ্য তা বুঝতে পারতেন না। এই বাজিতপুরেই এক ঝুলনপূর্ণিমার রাতে মা নিজেকে নিজেই দীক্ষা দিলেন। ওই রাতে মাই ছিলেন গুরু, মাই শিষ্য; আর মার শ্রীমুখ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হলো ইস্টমন্ত্র।

এরপর কর্মসূত্রে ভোলানাথ মাকে নিয়ে এলেন ঢাকার নবাবের উদ্যান — শাহবাগে। পদ্মমধুর সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরের মতো এই শাহবাগেই মার চর্চুদিকে ভক্তরা জড়ো হতে লাগলেন। এখানে নিত্য তাঁর কুটিরে দেখা যায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড়, নিত্য সেখানে কীর্তনের সুর ভেসে বেড়ায়। শাহবাগে মা আর লজ্জাশীলা কুলবধু নয়। ভাবাবিষ্টা এক মাতৃমূর্ত্তি। এই শাহবাগেই তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রধান পার্শ্বদরা একে একে সমবেত হয়েছিলেন। ঢাকার সিভিল সার্জন ডাঃ শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁর কন্যা আদরিণী দেবী ও জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, পরবর্তীকালে মাতৃভক্ত-মণ্ডলীর স্বামী অখণ্ডানন্দ, গুরুপ্রিয়াদিদি ও ভাইজী নামে পরিচিত হন। আত্মসমর্পণের মূর্ত্ত প্রতীক ভাইজীর উদ্যোগেই ১৯২৯ সালে

ঢাকার রমনায় স্থাপিত হয় শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম আশ্রম। শাহবাগে অবস্থানকালে মায়ের দিব্যভাবের নানা প্রকাশ ঘটেছিল ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে। এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরেই একদিন মহাভাবময়ী মায়ের এক অনির্বচনীয় আনন্দঘন মূর্তি দেখে অভিভূত হয়ে ভাইজী মার নাম দিলেন — আনন্দময়ী মা।

তঁার ভাবাবস্থায় প্রথম থেকেই মার দৃষ্টি সকল ভেদাভেদের সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। এই শাহবাগেই ঢাকার নবাব দুহিতা প্যারীবানু ছুটে ছুটে আসতেন তঁার সকল সুখে দুঃখে মার কাছে শান্তি লাভ করতে। মাকে তিনি দেখেছিলেন ঈশ্বর — আল্লার উর্দে অবস্থিত পরমা প্রকৃতি রূপে। প্যারীবানুর আকুল প্রার্থনায় মা এলেন তঁার কলকাতার বাড়ীতে। মার উপস্থিতিতে প্যারীবানু তঁার বাড়ীতে কীর্তনের আয়োজন করলেন। এই কীর্তনেই মাকে দর্শন করতে ও গান শোনাতে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী ও কন্যা বাসন্তীদেবী ও অপর্ণা দেবী।

ভেদাভেদাতীতা মা'র উপস্থিতিতে শাহবাগে একদিন কীর্তন চলছে। মার সেদিন ভাবাবস্থা, চোখে মুখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ কীর্তনের ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে এলেন, বাগানের ফকির সাহেবের কবরের কাছে। মা কবরের সামনে অতি উচ্চ স্বরে সুস্পষ্ট উচ্চারণে আওড়াচ্ছেন কোরাণের বাণী। পাঠ করার সময় একবার উঠছেন, হাত তুলছেন। নামাজ পাঠের নিখুঁত ভঙ্গিমা গুলি দেখে ও কোরাণ পাঠ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলেন সেখানকার মৌলবী সাহেব। একটু পরে মা ফিরে এলেন কীর্তনের ঘরে। সেখানে এসে হরিরলুট দেওয়া হলে, মুসলমানটি মাকে সেদিন খাইয়ে দিলেন প্রসাদী বাতাসা। কোরাণের বাণী ও হরিনামের ধ্বনি মিলে মিশে সেখানে সৃষ্টি হলো এক অপূর্ব পরিবেশ। প্যারীবানু মাকে একদিন বলেছিলেন — “মা আপনার জন্যই আমার সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে। আপনি আমাদের বাগান ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না।” কিন্তু অধরাকে ধরবে কে? ঢাকার শত শত ভক্ত, প্যারীবানু কেউই পারলেন না মাকে ধরে রাখতে। মার পথ চলা এবার শুরু হলো। আসমুদ হিমাচল সারা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছেন অক্লান্তভাবে। একবার ঘুরতে ঘুরতে মা এসেছেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে, সঙ্গে মার পরমভক্ত শিখ ধর্মাবলম্বী সাধু সিং। মন্দিরের অভ্যন্তরে তখন গ্রন্থসাহেব পাঠচলছে। সেই পাঠ শুনতে শুনতে মা সমাধিস্থা হলেন। সাধু সিং মাকে প্রণাম করেন — “মা আমি দেখি আমাদের গ্রন্থ-সাহেবের ভেতর যা লেখা আছে, আপনার কাছ থেকেও সেই একই ভাবের কথাগুলি শুনতে পাই কী করে?” মা উত্তর দেন — “বাবা, সব ধর্মই এক ধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।”

মার পরিক্রমা পথের দুধারে সকলের মধ্যে নাম বিলিয়েছেন অকাতরে, পানী তাপীর হাত ধরে পথ নির্দেশ করেছেন, উন্নতকে আরো উন্নত হবার সঠিক পথ দেখিয়েছেন। মা আনন্দময়ী ছিলেন জগতের আনন্দযজ্ঞের ভাণ্ডারী। যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। তঁার উপস্থিতির আনন্দধারায় রাজা, মহারাজা, ধনী, নির্বন, জ্ঞানী, অজ্ঞানী শত শত অজ্ঞাতনামা সাধারণজন ভুলে যায় তাদের দুঃখ বেদনা। বিশ্বমানবিকতার মূর্ত প্রতীমা মার করুণা স্পর্শে সকলেই মনে করেন মা আমাকেই সব থেকে বেশী ভালবাসেন। যেখানেই থাকতেন সেখানেই অনবরত কীর্তন, ভজন, ধ্যান, গীতা উপনিষদ পাঠ চলতো তাঁকে ঘিরে, যেন প্রাচীন ভারতের তপোবন দৃশ্য।

সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষুদ্রতা, ভেদাভেদের উর্ধ্বে তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ শিখ খৃষ্টান সকল ধর্মাবলম্বীর মা। তিনি কারোর বিমাতা নন। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার দীপশিখাটিকে সদাই জ্বলিয়ে রেখেছেন। সুদূর পশ্চিম থেকে শত শত খৃষ্টধর্মাবলম্বী মার সঙ্গ লাভের জন্য ছুটে আসেন। যীশুর মানবপ্রেম ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার প্রগাঢ় অনুভূতির কথা শুনে তাঁদের স্বধর্মে বিশ্বাস হয়েছে দৃঢ়তর। ফরাসীভক্ত Arnaud Desjardins লিখেছেন, “Anandamayee Ma brought me closer to Christ” — ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আলেকজান্ডার লিপস্কি ভাষা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন মার নিত্য অখণ্ডরূপটি। তিনি লিখেছেন - “It does not matter whether one is monist, dualist, Moslem, Buddhist or Christian. Anandamayee Ma has the ability to attune herself to the particular religious point of view.” মার দুনিবার আকর্ষণে স্বদেশের বিলাস বৈভব প্রিয়জন ছেড়ে বহু বিদেশী ভক্ত আদর্শ সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করেছেন।

নিজেকে জানা, আপনাকে পাওয়া ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে উপবিষ্ট হয়ে ভক্তজনেরা বার্ষিক সংযম মহাব্রত পালন করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। বিংশ শতাব্দীর অধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে যারা বিরাজ করেছেন সেইসব প্রাতঃ স্মরণীয় মহাসাধকেরা বিভিন্ন সময়ে মার সম্বন্ধে তাঁদের অমূল্য মতামত প্রকাশ করে গেছেন। পরমযোগী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর শিষ্য ও মার পরমভক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন - “মা তো সাধিকা নন, ইনি নিত্যসিদ্ধা”। ভারতবিখ্যাত দেবমানব শ্রীশ্রীরামঠাকুর আনন্দময়ী মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন - “যিনি আমার প্রণামের যোগ্য তাঁকেই প্রণাম করছি। মা সাক্ষাৎ ভগবতী”। “Autobiography of a Yogi” গ্রন্থের রচয়িতা পরমহংস যোগানন্দজী মার সম্বন্ধে তাঁর বই এ লিখেছেন, “ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শন লাভ আমার আগে ঘটেনি। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে সদা জাগ্রত।” যোগীবর শ্রী অরবিন্দ তাঁর ভক্তদের বলেছেন — “যদি প্রকৃত ব্রাহ্মীস্থিতি বুঝতে চাও তবে মা আনন্দময়ীকে দেখে এসো। তিনি সর্বদা হাসি খেলার মধ্যে থেকেও সর্বদা সচ্চিদানন্দে বিহার করছেন।” শ্রী হরিবাবাজী বলেছেন, “মহাপ্রভু এবার গুপ্তভাবে এসেছেন, তিনিই মা আনন্দময়ী।” পরমসাধক সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ মাকে লিখেছেন — “বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুই ছিলি, তোর ইচ্ছা হলো বহু হবো, জন্মাবো। কোটি কোটি প্রণাম তোকে।” পরমপুরুষ শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী লিখেছেন — “শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মধ্যে যে বিভূতিযোগ ঐশ্বর্য ও মহামানবিকতার প্রকাশ হইয়াছিল তাহা ভগবানেরই এক প্রকাশের অংশ বলিয়া জানিতে হইবে।”

শুধু ভারতের সাধু মহাসন্ন্যাসীরাই নন অসংখ্য দার্শনিক, বিদ্বজ্জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, দেশনেতা, শিল্পী, সমাজসেবক শ্রদ্ধাবনত চিন্তে মার সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, জ্ঞানী জেল সিং, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, উদয়শঙ্কর, যমুনালাল বাজাজ, ইন্দিরা গান্ধী এবং আরোও অনেকে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মার কাছে আসতেন। কি দেখেছিলেন এঁরা মার মধ্যে? মাই উত্তর দিয়েছেন এ কথায় - “আমায় যে যা মনে করে আমি তাই, কমও না, বেশীও

না”। মা যেন পবিত্রতার এক স্বচ্ছ সরোবর। সূর্যালোকে কখনও হয়ে ওঠে অরুণরাঙা, আকাশের নীলে তা নীলাভ, মেঘের ছায়ায় তা শ্যাম, চাঁদের আলোয় তা রজতধারা।

মা ভাষণ দিতেন না। সাধারণ সংসারী মানুষের মনকে ছুঁয়েছেন ছোট ছোট গল্প বলে। কঠিন কথাকে ভেঙে সহজ করে তার ভেতরের শব্দের অর্থ মা নিজের মতো করে প্রকাশ করতেন। যেমন ‘বেদান্ত’ বোঝাতে মা বলেন — ভেদের অন্ত। মানুষ কে? - যার আছে মনের হুঁশ। ডাক্তার কথাটিরও এক নতুন অর্থ বুঝিয়ে দেন — ডাক তাঁর।

সংসারের ময়া মোহজালে আবদ্ধ তাঁর সন্তানদের কাছে হাত পেতে মা ভিক্ষা চাইতেন। রাজা মহারাজা, দীনাতিদীন সকলের কাছেই তাঁর একই ভিক্ষা - “প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তত দশ মিনিট ভগবানের জন্য রেখে দিও।”

১৯৮২ সালের ২৭শে আগষ্ট। মার ব্যক্ত স্বরূপ অব্যক্তে লীন হয়ে গেলেও যুগ থেকে যুগান্তরে ধ্বনিত হবে মানবজাতির জন্য রেখে যাওয়া তাঁর স্বহস্ত লিখিত মা ভৈঃ বাণী —

“হে পরমপুরুষ! জগৎ পতি পত্নী পিতা মাতা সন্তান এবং সর্বরূপে স্থিত! দেখিতেছি মায়া মোহে আবৃত। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। বিশুদ্ধ ভাব, অটল বিশ্বাস ও আকুল পিপাসা নিয়া চলিতে থাক, তোমার স্বরূপ অবশ্যই দেখিতে পাইবে।”



“হাতে কাজ করবে, মনে মনে ইষ্ট নাম জপ করবে। তাহাতে কাজও ভাল হবে আর সংসারে মঙ্গলের আশা। ধর্মকে বাদ দিয়া সংসার করিলেই দুঃখের সাগরে ডাসিতে হয়। সংসার করিলে ধর্মের সংসার করাই সকলের কর্তব্য।”

— শ্রীশ্রীমা

ভাইজীর বাণীর মনন

(চার)

— শ্রী জয় মুখার্জী

“তিনি স্বাধীন; বদ্ধ জীবভাবেই ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব। তিনি ইচ্ছা করিয়া গিছু করেন না বা বলেন না। আমাদের যার যা প্রয়োজন, তদনুযায়ী তাঁহার মহতী ইচ্ছা হইয়া থাকে।”

স্বাধীন শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র, স্ববশ; যে পরতন্ত্র পরবস নয় সে-ই স্বাধীন। জগতের দিকে তাকালে স্ববশ স্বতন্ত্র তো কিছুই চোখে পড়ে না। শাস্ত্র হয়ে এ প্রসঙ্গ নিয়ে চিন্তা করলে ভগবানের বাণী স্মরণে আসে -

‘ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্’। (গীতা ৯।১০)

‘ভূতগ্রামমিনং কৃতস্নামবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।’ (গীতা ৯।৮)

পরমপুরুষের অধীনে প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ভূত সমুদয় প্রকৃতির বশ। ভগবান আরও বলেন, - ‘সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ’, ‘প্রকৃতিং যান্তিভূতানি’ (গীতা ৩।১১) সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সমস্ত ভূত আদি প্রকৃতিগত স্বভাব অনুযায়ীই চলে।

তাহলে দেখছি সৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই প্রকৃতির তিনগুণের বশীভূত হয়েই গতিমান। এখানে কেউই স্বাধীন স্ববশ নয়, সকলেই পরতন্ত্র। মা বলেন, ‘জগৎ মানে গতি’। যেখানে গতি সেখানেই জগৎ, সেখানে বহু, যেখানে বহু সেখানেই পরস্পরের আপেক্ষিকতায় পরাধীনতা, ‘অনেজৎ’ তিনিই, একমাত্র স্বাধীন। তাঁর সেই গতিশূন্য প্রকাশের মাঝে জগৎ থাকে কেমন করে? জগৎ থাকে অব্যক্তরূপে। ‘অব্যক্তদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত (গীতা ২।২৮)।’ সৃষ্টির আগে এই রূপের জগৎ, গুণের জগৎ, অব্যক্ত হয়ে থাকে। সেখানে প্রকৃতি তার তিন গুণকে সাম্য অবস্থায় রেখে গুণাভীত হয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন। সৃষ্টির মুহূর্ত ব্রহ্মা প্রকৃতির ত্রিগুণের সাম্যকে ভঙ্গ করেন, গুণবৈষম্যের সৃষ্টি করেন। তাতেই জগৎ লীলাময় রূপে প্রকাশিত হয়। গুণবৈষম্যই জগৎলীলা। গুণসাম্য বোধই ব্রাহ্মীস্থিতি। সাম্য-বৈষম্যের লীলার পারে প্রশ্নাভীত স্থান তুরীয়। সেখানে মায়ের কথায়, ‘জানা না জানার পারে সে। ‘না’ ও ‘না’, ‘হাঁ’ ও ‘না’, ‘না’ ও ‘হাঁ’। আবার তাঁহাকে কোন ভাবেও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারেই না। পূর্ণ বলিলেও কিছু বলা হইল না” (‘মায়ের কথায় মা’ - পৃ. ৬১)।

আমরা এই স্বল্প আলোচনার মধ্যে গতির কয়েকটি রূপ দেখতে পেলাম। এক, ঈশ্বরের দৃষ্ণে তাঁর প্রকৃতি সাম্যকে ভঙ্গ করে জগৎরূপে প্রকাশের সময়ে। দ্বিতীয়, তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই স্বরূপ জীবের বিক্রম স্থিতি থেকে সমতা ফিরে পাওয়ার আকুল প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তিন, ‘অব্যক্ত নিধনান্যোব’ (গীতা ২।২৮) এর সময়ে যখন তাঁর নিজের সৃষ্টিকে তিনি নিজ অব্যক্ত রূপের মধ্যে স্বায়ত্ত্ব করে নেন।

এই তিন গতির মধ্যে আমরা এখন আছি তাঁর সৃষ্টি লীলার মাঝে। মহামায়ার মায়ার জীব এখানে স্বরূপ বিস্মৃত। আবার তাঁরই করুণায় জীব নিজের অজ্ঞাতই স্বরূপ স্থিতি ফিরে পেতে এখানে অহরহ সমস্ত সম্বন্ধ করে চলেছে। তাই জীবের মাঝে দেখা দেয় অন্তহীন ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব।

মা আছেন সদাই স্ব-স্বরূপে। সেখানে দ্বিতীয় বোধের কোনও আভাস মাত্রই নেই। কোন অভাববোধ নেই তাই অভাব পূরণের জন্য কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বও নেই। ভাইজী দুচোখ ভরে মায়ের “অসঙ্কম্ নিৰ্গম্ গুণভোক্তৃ চ” (গীতা ১৩।১৪) রূপের লীলা দর্শন করেছেন দিনের পর দিন। হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন মা কোন কিছুতেই আসক্ত নন, কোন গুণের তিনি বশ নন। আবার সকলের সব আনন্দ সব দুঃখ কষ্ট যেন তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করছে। মায়ের মধ্যে যুগপৎই এই দুইভাবেব সহজ সহাবস্থান। মা নিজে বলছেন, “এ-শরীর ত একটা ঢোল; তোরা যে তালে বাজাবি সেইরূপ আওয়াজ ত পাবি। আমি দেখতে পাই, সর্বত্রই একেরই খেলা চলছে।” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ৪৬)। ঢোল না বাজালে বাজে না। বাইরের থেকে ভাবের তরঙ্গ না ওঠালে মায়ের ‘অসঙ্কম্ নিৰ্গম্’ ভাব বিস্ময় ও ভয়ের সৃষ্টি করত। ভোলানাথের দেহরক্ষা হল মায়ের উপস্থিতিতে। ঐ সময়ে মায়ের কাছে কোন ভক্ত এসেছেন দেখা করতে। মা পাশের ঘর থেকে এসে তার সঙ্গে কথা বলছেন নিত্যদিনের মত স্বাভাবিকভাবে। সেই ভক্ত জানতেও পারেননি যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে। পরে যখন জানলেন তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক। আর মা নির্বিকার, বলছেন, “রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ঠিকভাবে জানিয়া আস এই অবস্থায় কি কি করা দরকার। শরীরের একটা পরিবর্তন মাত্র হইল। যেন একটা জিনিষ এ-ঘর থেকে ও-ঘরে রাখা হইল, তোমাদের দৃষ্টিতে। আত্মার আবার যাওয়া-আসা আছে নাকি?” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ২০)। মায়ের এই নির্বিকার প্রয়োজনশূন্য সাম্য স্থিতিতে জগৎ ব্যবহার ভাইজীর শ্রদ্ধার বোধে ধরা পড়েছিল। ভাইজী তাই আমাদের দৃষ্টির শুদ্ধির জন্য বলছেন যে মা নিজের ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোন কিছু করেন না বা বলেন না। নিত্য পূর্ণ সদাই সাম্যে স্থিত মা। এ অবস্থা মায়ের জন্মের সময় থেকেই; এ স্থিতি সাধন-লব্ধ কোন স্থিতি নয়। শাস্ত্রে বলে গর্ভাবস্থায় শিশু সজ্ঞানে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার সময় মহামায়া তার জন্মান্তরের স্মৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলেন, ঐ সময়ে তাই সব শিশুই কেঁদে ওঠে। মা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে কাঁদলেন না। তিনি স্বয়ং সূর্যব্রহ্মা মহামায়া তাঁরই বয়সপভূত শক্তি। তাই কে কাকে আবির্ভূত করবে? পরে বড় হয়ে মা বলছেন, “কাঁদব কেন? আমি ত তখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ দেখছিলাম।” এ যেন অরূপের জগৎ থেকে রূপের জগতের দর্শন। শিশুকাল থেকে দেখা গেছে মা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুই বশ নন। দিদিমা আক্ষেপ করে বলেছেন, “ক্ষিধে পেয়েছে খেতে দাও, এ কথাটাও ওর মুখ থেকে কোনদিন শুনলাম না।” যখন যা আপন খোয়ালে প্রকাশ হত। মা একবার বলছেন, “নয় বছর শোয়া কাকে বলে এ শরীর তা জানত না। কখনো সেইজন্যে হাই ও ওঠেনি। তখন শরীরে ঘামও হত না।” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ৭১)। আবার বলছেন, “এ শরীর সাধনার খেলার সময় কখনো গেলাসে করে ঢকঢক করে জল খেয়েছে কিনা সন্দেহ। বছরের পর বছর এখানে জল না খেয়ে চলেছে। তোমাদের কাছে ব্যবহার ঠিক রাখার জন্যই আজকাল এরূপ (জল খাওয়া ইত্যাদি) করা হয়। তখন না স্নান, না খাওয়া, না জল পান করা। আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। একদিন খাইতে বসিয়াছি, দেখি ভাত মুখে দিতে পারি না। ভাত মুখে উঠিতেছে

না, নীচে বসিয়া যাইতেছে। নিজের ইচ্ছাশক্তি এর মধ্যে একটুও নাই তবে বিশেষ এই যে এ জন্য কোন দুঃখ হয় না বা অন্য কোনরূপ ইচ্ছাও জাগে না। যা হইয়া যায় দেখিয়া যাইতেছি। তখন হইতে বুঝিলাম হাতে খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ৮৯) পরে ত দেখা গেছে যে মা তাঁর দিবা তনুটিকে ঠিক রাখার সমস্ত দায়িত্ব ভক্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকতেন। বলতেন, ‘তোমাদের প্রয়োজনে তোমরা শরীরটাকে দেখে শুনে ঠিক রেখ।’

জাগতিক সমস্ত প্রয়োজনের উর্ধ্ব মা। তাই সেখানে কোন সঙ্কল্প, বিকল্প, ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব উঠত না। তাঁর কাছে নিন্দা, স্তুতি, ঝাড়ু, চন্দন সব যে সমান। এ সমান বোধ তাঁর কোন বিচার করে ধৈর্য্য ধরে সমান বোধ নয়, সহজ সমবোধ। মা নিজে বলছেন, “এক ছাড়া কিছু আর আছে নাকি? দেখ কি চমৎকার, কেউ এই শরীরটাকে হয়ত নিন্দা করছে। কিন্তু কথটা কি জান? যে বলছে, যা সবই, তুমি বা হয় আমি। একমাত্র এক আত্মাই ত। আবার আমি তুমিই বা কোথায়? কোন গোলমাল নেই। এইসব কিন্তু বিচারের কথা না। সত্য প্রত্যক্ষ কিন্তু।” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ৪৫)।

তাহলে ব্যবহারের দিক থেকে মায়ের যে চলা বলা সব আমরা দেখেছি তার রূপটা কী? আসল রূপটা লীলাময়ীর লীলার মৌজ। লীলার জন্যে সেই ‘অনেজৎ’ একম্-এব-অদ্বিতীয়ম্‌ই বহু হন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হন; তিনিই দেবতা হন, তিনিই সাধু হন, ভক্ত হন, সাধারণ হন; তিনিই উদ্ভিদ, স্থাপদ, জীব হন; তিনিই মন, বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চভূতাদি তত্ত্বে প্রকাশিত হন। সব হয়ে সবার নাম রূপ গুণের আড়ালে তিনি নিজে লুকিয়ে থাকেন। আনন্দস্বরূপের অন্বেষণে জীব সঙ্কল্প করে, ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব পড়ে সে বদ্ধ হয়। জীব শিবই, বিভূই অনন্ত বিভূতিতে প্রকাশ হন। অনন্তরূপে প্রকাশ হলেও স্বরূপ বোধে তিনি একম্ অদ্বিতীয়ম্‌ রূপেই থাকেন। সাগরের বুকে অনন্ত ঢেউ, অনন্ত ফেনা; সব নিয়ে সাগর বোধ করে আমি এক। আর ঢেউগুলো তাদের জন্ম, স্থিতি, লয়, উত্থান, পতন, ক্ষুদ্রত্ব, বৃহত্ত্বের দ্বন্দ্ব সদাই দৌলুমান। ভাইজী আমাদের স্থিতিটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাই বলছেন, “বদ্ধ জীবভাবেই ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব।”

কী আশ্চর্য মহামায়ার মায়া। ঢেউ তো সাগরের থেকে স্বতন্ত্র নয়, যা দিয়ে সাগর তাই দিয়েই ঢেউ, স্বরূপত ওরা এক। তবু অঘটনঘটনপটীয়সীর মায়ায় ঢেউ নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে। আর তাতেই তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দোলা শুরু। ঢেউ যখন তার ‘অনু’ আমিকে ‘বৃহতে’র আমার মধ্যে বিলয় করতে পারবে তখনই তার মুক্তি। অগুর বৃহৎ হওয়াই তো “নিজেকে জানা”। মা বলেন, — একটা ফাঁকা মাঠ। তার মাঝে বেড়া দিয়ে একটা জায়গা ঘেরা হয়েছে। ঐ ছোট জায়গাটা বৃহৎ থেকে গুণে উপাধিত বদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে গেল। সে তখন তার গুণ ও উপাধি রক্ষায় ব্যস্ত। কালে ঐ ক্ষুদ্র গুণ ও উপাধির সংস্কার তার এত দৃঢ় হয়ে যায় যে তখন যদি কেউ এসে বলে, এস, এই বেড়া ভেঙে তোমাকে আমি বৃহত্তের সঙ্গে এক করে দিই, তখন সে কেঁদে ওঠে, বলে আমার উপাধি গেলে, গুণ গেলে রইব কি? আমি যে মরে যাব।

জীব ক্ষুদ্র ভাব, চাওয়ার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে বৃহৎকে সে যেন ভুলে যায়। তাকে তার স্বরূপ মনে করিয়ে দিলেও সে আর বৃহৎ হতে চায় না। বলে, এই তো বেশ আছি। তার বর্তমানের সুখ-দুঃখের স্থিতি থেকে উত্তরণের প্রসঙ্গকে সে ভয় পায়। উত্তরণকে সে মৃত্যু বলে মানে। উপাধির মধ্যে হয়ে থেকেই সে মুক্তি বাসনা করে। বোঝে না যত উপাধি তত শৃঙ্খল, যত বড় উপাধি তত ভারী শৃঙ্খল। সে বোঝে না যে এক একটি উপাধির বিলয় তার গুণের অহং ত্যাগ, তার উত্তরণের পথে এক একটি সোপান তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ব্রহ্ম নিরূপাধিক, তাই তিনি অসীম আনন্দময়। সেই আনন্দময়ের আনন্দের স্পর্শ পেলে উপাধির ভার, গুণের অহং ত্যাগ করেই আমাদের এগোতে হবে। এটাই পথ।

আমরা যখন আমাদের উপাধি রক্ষায় ব্যস্ত, মা তখন বলছেন, “ব্যবহারিক হিসাবে ধরতে গেলে এ-শরীর পূর্ববঙ্গের; জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ সকল কৃত্রিম উপাধি হতে আলাদা করে দেখলে জানতে পারবে, এ-শরীর তোমাদের সকলেরই পরিবারভুক্ত।” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ৪৫)। উপাধিকে মা কৃত্রিম ভাবে আরোপিত বলে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে গুহ্য সত্যটি ধরিয়ে দিলেন যে আত্মার সূত্রে সকলেরই সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক, সকলেই এক পরিবারভুক্ত, সেখানে পতঙ্গটিও বাদ পড়ে না। মায়ের কাছে এক ছাড়া দুই তো নেই-ই তাই ত মা সহজ করে বারবার বলছেন, “তারা এ-শরীরের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ।” যেখানে দুই নেই, সেখানে পূর্ণতার কারণে দ্বন্দ্বের কোন স্থান নেই, অভাবেরও কোন ভাব নেই।

তাহলে মায়ের যে চলা বলা, নির্দেশ দেওয়া, সব দেখা যেত এসবের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনের কি কোনও সম্বন্ধ ছিল না? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অস্বাকৃত বাণীরই শরণ নিতে হবে। মা বলছেন, “এ শরীরের নিজস্ব যদি কিছু বলিতে চাও ভগবৎময় সবই ইহার নিজস্ব।” মা আরও বলছেন, “আমার নিজের কিছু করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই। আগেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে বা পাইবে সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য।” (মায়ের কথায় মা - পৃ. ৪৫-৪৬)। অহেতুক কক্ষণাসিক্ত শ্রীমায়ের এ বাণী যেন গীতায় ভগবানের বাণীর অনুরণন। ভগবান বলছেন, “সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি।” (গীতা ৫।২৯) তিনি সদা সর্বকালে সর্বভূতের সুহৃদ। এ সত্য বোধে বোধ হলেই পরম শান্তি। ভাইজী আমাদের তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে মায়ের কাছে যা কিছু প্রকাশ আমরা দেখছি, আমাদের পরম বিচারে তা অনুকূল প্রতিকূল যা-ই লাগুক না কেন তা আমাদের পরম মঙ্গলের কারণ-স্বরূপ, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই আমাদের কল্যাণ। ধন্য ভাইজী, ধন্য তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, আর ঋষির অন্তর্ভূতগতের মধ্যে সামান্যতম প্রবেশের সুযোগ পেয়ে আমরাও ধন্য। জয় মা।



বরাভয়দায়িণী মা

— শ্রী বীরেন্দ্র নাথ মিত্র

আনন্দময়ী নামটি তোমার

স্বরূপ জানিনা

কেবল জ্যোতির্ময়ী রূপটি দেখি

কিছুই বুঝি না।

তোমার তরে কাঁদতে জানি

তোমার ঘরে থাকতে জানি

আমার ঘরে তোমায় আমি

আনতে জানিনা।।

তোমার ঘরে প্রদীপ জ্বালি

তোমার ঘরে আলো করি

আমার ঘর আলোকিত

করতে জানিনা।।

আমার আঁধার ঘর

আলো করি

দাও মা দীনে

চরণধূলি

আমার রুদ্ধ কপাট

যাবে খুলি

রইব তোমার

চরণ চুমি।।

দাও মা মুছে দাও মা মুছে

দণ্ড আমার

মিছে সবই

আমি আমার

জ্ঞানের প্রদীপ

দাও মা জ্বালি

পাই যেন মা

চরণ তোমার।।



মাতৃ-স্বরূপামৃত

[তৃতীয় পর্ব]

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

চিন্তা শব্দের অর্থ ধ্যান। নিরাকার ব্রহ্মময়ীর ধ্যান বড় কঠিন, তাই সাকার ছোটমেয়ের রূপের ধ্যান করা সহজ। হৃদয় মধ্যে মায়ের ধ্যান করার সময় মায়ের মূর্তিটি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হবে, কারণ হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। অন্তর্য্যাগ ইষ্ট দর্শনের প্রধান ও প্রথম অবলম্বন। জীবাত্মার আবাস স্থল হল অনাহত বা হৃদয়। অনাহত চক্রের দশদলযুক্ত পদ্মের সামান্য নীচে রয়েছে উর্ধ্বমুখ পদ্ম। এই পদ্মেই মায়ের ধ্যান হয় কুমারীকন্যা অর্থাৎ ‘ছোটবাচ্চী’ রূপে।

স্বামীজীদের সম্বোধন করে তিনি প্রকাশ করেছেন, “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ আমিইত সেই। “আমি ছাড়াই কিছুই নেই। তাই এই মেয়েটার উপর স্নেহ। কি বল, বাবা?” মা একবার বলেছেন যে তিনি ‘পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ’, আবার বলেছেন তিনি ‘ছোটমেয়ে’। শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে মা বলেছিলেন, “মাকে (অরবিন্দ আশ্রমের) বোলা, এই ছোট্ট মেয়েটা সকলের চেয়ে ছোট”। বেঙ্গলদাদা অরবিন্দ আশ্রমের মাকে এই কথা বলায় তিনি মার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া ইংরাজিতে বলেছিলেন — “সব সময়ই ছোট শিশু”। স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণভাবে। আসলে ‘ছোট মেয়ে’, ‘মেয়ে’ ‘ছোট্ট বাচ্চী’, ও ‘ছোট্ট মেয়ে’ বলে মা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন অজস্রবার — কেন এমন করেছেন? তাঁর খেয়ালই এইসব ‘ছোটমেয়ে’ ইত্যাদি শব্দগুলির প্রকাশক। ব্রহ্মের চিৎ-তপস্ বা creative consciousness থেকে বিশ্বের সৃষ্টি ‘তপসা চীযতে ব্রহ্ম’ (মুণ্ডক, ১।১।৮)। ব্রহ্মের হ্রাস বৃদ্ধি নেই, তাঁর বিস্তার হবে কোথা থেকে? মুণ্ডক আসলে বলতে চেয়েছে যে উপচয় হল জ্ঞানের উপচয় — দেশ কালের মধ্যে বিস্তার নয়। অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানে যা নিহিত ছিল, তাই অভিব্যক্ত হ’ল। কি ভাবে হ’ল? মুণ্ডক বলেছেন, ‘অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশৃম্’ (মুণ্ডক, ১।১।৭) অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্ম হতে এই বিশ্বের উৎপত্তি। অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং মা, তিনিই ব্রহ্মশক্তি, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা এবং ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। তত্ত্বের তিনি আসিতত্ত্ব — চৈতন্যময়ী রূপে ব্রহ্মের প্রকাশ তিনি, আবার প্রকাশ তত্ত্বও তিনি, — প্রকাশাত্মাও তো তিনিই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মময়ীর প্রথম বিকার খেয়াল। এই খেয়ালেই সব কিছু ঘটেছে — এই খেয়ালেই মায়ের ছোট্ট মেয়ে রূপে কৃষ্ণ অবতারের সময় আত্মপ্রকাশ ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন মুক্তি অপেক্ষা মায়া শ্রেষ্ঠ। মায়ার বহু অর্থের মধ্যে অন্যতম হল সন্তান স্নেহ — সন্তান স্নেহ সম্পাদিকা মায়াই ‘মাতৃ করুণা’। ভগবদ্বিষয়ক ‘স্নেহ’ অপবর্গ সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। মায়েকে মহামায়ায় পরিণত করাকেই মা দিব্যভাবে প্রকাশ করেন ‘ছোট্টমেয়ে’ রূপে। দেবকীনন্দিনী মা সব সময় ‘ছোট্টমেয়ে’ একানংশা। তিনি দেবকীর আত্মজা রূপেই অভেদ বিবক্ষায় ভাগবতে বর্ণিত। যোগমায়া দ্বারা মুক্ত হয়ে দেবকী একানংশাকে আত্মজা ভেবেছিলেন, তাঁর বাৎসল্য শুদ্ধ বাৎসল্য। শুদ্ধ বাৎসল্য দ্বারা মায়েকে মহামায়ায় উন্নিত করলেই শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মাতৃকৃপা সহজে লাভ হয়। তাই ‘ছোট্টমেয়ে’ কথাই সার কথা। ব্রহ্মময়ী মা শক্তি, শক্তি শ্রদ্ধের, আদরনীয়। তাঁকে দস্তভরে পবুদস্ত করা বা

অনাদর করাই হচ্ছে তামসিক ভাব, যা জীব ও জগতের বিপর্যয়ের কারণ। মা থেকে কন্যা অর্থাৎ স্বীয় কন্যা রূপে শক্তিকে ভাবলে সাধনা সার্থক হয় সহজে — কারণ মা থেকে কন্যা অধিক আদরের ধন, সান্ত্বিকভাবের মধুর প্রকাশ কন্যায়। তাই কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, ‘কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিনীম্’ অর্থাৎ কুমারী কন্যা মা’ই পরমানন্দদায়িনী। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে দেবতাদের স্তবস্তুতিতে দেবী চণ্ডিকা কন্যারূপে দেবতাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে স্বরূপ প্রকাশ করেন, ‘কন্যা রূপেন দেবনামগ্রতো দর্শনং দদৌ।’ জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের মতে কুমারী কন্যাই হলেন পরাশক্তি আদ্যাশক্তি। আদিতত্ত্ব কি? জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে ভগবতী স্বয়ং বলেছেন, “কুমারীকাহং নাথ সদা হুং কুমারিকা” অর্থাৎ হে নাথ আমি ও কুমারী তুমিও কুমারী। তাহলে তন্ত্রের শ্রুতিতে শিব ও শক্তি উভয়ে কুমারীই। তাই বলা হয় যে কুমারীতত্ত্বই আদিতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, কারণ তন্ত্র বলেছেন, “শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম”। কিন্তু এই নিরাকার ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ীকে চিন্তা করা সহজ সাধ্য নয়, সাধনলভ্যও নয়। তাই মা ‘ছোটমেয়ে’ রূপে দেবতাদের কাছে এবং মানবের কাছে আসেন। কুমারী থেকেই তাঁর জগৎ সৃষ্টি এবং কুমারীত্বই ত্রিভুবন পালন কর্মের হেতু স্বরূপ। “কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিত ত্বয়া।” (মহাভারত, বিরাটপর্ব)। আদ্যাশক্তিই ‘কুমারী কালি’। মাতৃধ্যানে পরমাশক্তি মাকে কুমারী রূপে চিন্তা করার কথা তান্ত্রিক শ্রুতিতে সর্বত্র দেখা যায়। কুলান্বব তন্ত্রে একবর্ষীয়া থেকে ষোড়শ বর্ষীয়া পর্যন্ত কন্যাকে কুমারী বলা হয়েছে। এক থেকে ষোড়শ বর্ষীয়া ‘ছোটমেয়েদের’ নামগুলি হ’ল সন্ধ্যা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, কালিকা, সুভগা, উমা, মালিনী, কুজিকা, কালঙ্কবা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, কুলনায়িকা, ক্ষেত্রজা এবং চণ্ডিকা। এইসব কুমারীগণ এক একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। তন্ত্রোক্ত কুমারীকন্যাগণের সঙ্গে মহাশক্তি একাত্মক — যে কোন কুমারীকন্যায় ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করে সাধনা করলে মায়েরই সাধনা করা হয়। তাছাড়া কুমারীকন্যা কৌমারীরূপে বা ‘বাচ্চীমেয়ে’ রূপে মায়ের একটি ধ্যানমন্ত্রও তান্ত্রিক শ্রুতিতে রয়েছে, “ওঁ কৌমারীং কুঞ্চমাভাসাং ত্রিনেত্রং শিখিসংস্কৃতাং। চতুর্ভূজাং শক্তিপাশঙ্কুশ ভয় ধারিণীম্।” কুমারী রূপের ব্যাখ্যায় দেবী পুরাণ বলেছেন, “কুমার রূপধারী চ কুমার জননী তথা। কুমার রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা।।” অর্থাৎ দেবী কুমার রূপ ধরেন, কুমারের জননী তিনি, কুমারের রিপুনাশিনী বলেই তিনি কৌমারী নামে স্মৃতা। তান্ত্রিক শ্রুতিও বলেছে, “জন্মকালে চ জননী, স্নেহকালে চ কন্যাকা”, অর্থাৎ জন্মকালে তিনি জননী, কন্যা রূপে তিনি স্নেহের পাত্রী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সপ্তশতীতে বলা হয়েছে “কৌমারী রূপ সংস্থানে নারায়ণী নমোইস্তুতে” অর্থাৎ হে কুমারী রূপ ধারিণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি। নারায়ণী বা দুর্গা যখন ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা রূপে কেন উপনিষদে বা দুর্গা সপ্তশতীতে আবির্ভূত হন তখন তিনি তাঁর ব্রহ্ম স্বরূপই ব্যক্ত করেছেন। দেবতেজঃ সমুত্থাকে দেখতে দেবগণ ব্রহ্মা সহ পৃথিবীতে আগমন এবার যেমন করেছিলেন, বহুযুগ আগেও তাঁরা এসেছিলেন। ব্রহ্মময়ীর ‘ছোটমেয়ে’ রূপই সত্ত্বঘন আনন্দের বিগ্রহ এবং তা বৃহদ্ধর্মপুরাণে অপরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে, “তস্যৈকপাত্র রুচিরে সূচরঃ বনমালিকাম্। নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিশোষ্ঠং তনুমধ্যমম্। অনাবৃতাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নববালিকাম্।।” অর্থাৎ নির্জন স্থানে বটপাত্রে একটি নগ্না তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী ছোটমেয়ে নবজাতকা ঘুমিয়ে আছেন। মা যখন তপ্তকাঞ্চন বর্ণা দ্বিভূজা হয়ে প্রকাশ হয়েছিলেন এবার মর্মে, তাঁকেও অনাবৃতাই দেখা গেছে। মা স্বয়ং বলছেন যে জন্ম গ্রহণ করে তিনি দেখছেন চালের ফাঁক দিয়ে আকাশ, আমগাছ ও নিমগাছের ডাল-পাতা। আজও একইভাবে তিনি সবকিছু দেখছেন। আর তাঁর ছোট শরীর বা ‘ছোটমেয়ের’,

শরীর একইভাবে আছে। মা বলেছেন, “এখনও যেমন তোমাদের এ শরীরটা বড়, কাপড় পরা, দেখাদেখি, বলা ব্যবহার ইত্যাদি, ঠিক সেইভাবেই এই শরীর — ঐ ছোট নেংটাই তো, ঐভাবেই সব কিছু দেখা — একই তো আছেই। এ শরীর তো তখনও যা এখনও তাই এই। আসল কথা সেখানে পরমাত্মা স্বরূপ স্বয়ং ভগবান, ঐ একই নিত্য। আর এখানে এক নব কলেবর সংঘটিত দেখিতেছিস তো — তাই প্রশ্ন।” তিনি ‘ছোটমেয়ে’ নেংটা বলে যে মহাতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সর্বসাধারণের তা বোধগম্য হবার নয়। শক্তি সাধনার সঙ্গে ‘নগ্নমেয়ে’ স্বরূপটি গভীর ভাবে জড়িত। তান্ত্রিক শ্রুতি মতে শক্তিদেবীর মূর্তি ‘ছোটমেয়ে’ রূপেই নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক থেকে ষোল পর্যন্ত মেয়েদেরই বছর গণনা করে ছোটমেয়ে বা কুমারী কন্যা বলে, তন্ত্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মাতৃদেবতার মূর্তি সব সময়ই ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব অনুযায়ী কুমারী, অবশ্য ধুমাবতী তার র্যতিক্রম। মাতৃদেবতার ধ্যানে ‘নবযৌবনসম্পন্নাং’ রূপটিও ছোটমেয়ের রূপই, কারণ তন্ত্র ষোল বৎসর পর্যন্ত কন্যার রূপকে কৌমার্য বলেছেন। তরুণী শক্তি ষোল বৎসরের রূপে পূজিতা হলেও তিনি ছোটমেয়ে এবং তরুণ শিব ষোল বৎসরের হলেও তিনি ছোটমেয়েই — কারণ উভয় মূর্তিতে রয়েছে কৌমার্য — তা হলে কৌমার্যের তাৎপর্য কি? বৈদিক শ্রুতি বলেন, ‘সোহকামরত একোইহং বহস্যাম’ — কৌমার্য রূপে কার্যব্রহ্মাই ইচ্ছা করেন একের থেকে বহু হবেন বলে। কৌমার্য সৃষ্টির কারণ ও কার্যরূপে প্রতিভাত। শৈব ও শাক্ত উভয় দর্শনই সৃষ্টির উৎস রূপে বিন্দুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শক্তি থেকে নাদের উৎপত্তি, নাদ থেকে বিন্দু। বিন্দুতে অবস্থান করেন বলে মা বিন্দুবাসিনী — বিন্দুবিলাসিনী। তিনি সৃষ্টির আদি বাক্শক্তি। পরম ব্রহ্ম রূপে তিনি অরূপা, সূক্ষ্মা এবং মস্ত্রময়ী। স্থূল শরীর ধারণ করে তিনিই আসেন ছোটমেয়ে হয়ে। তাঁকে নাদ ব্রহ্মও বলা হয়ে থাকে। তান্ত্রিকী শ্রুতি মতে এই বিন্দুই সৃজন মুহূর্তে ত্রিকোণাকৃতি ধারণ করে। বিন্দুই কৌমার্য, ত্রিকোণাকৃতি ধারণ করে কখনও শ্রীযন্ত্র, কখনও কালীযন্ত্র, কখনো বা দুর্গায়ন্ত্র। মাতৃকাশক্তি বিন্দু অখণ্ড সত্তা বা পূর্ণ। তিনি বিন্দু হয়েও বিন্দু সৃষ্টি করেন। ছোটমেয়ে আদ্যাশক্তি যখন সৃষ্টি কামনায় স্বক্রিয় তখনই একের বহুত্বের বাসনা জেগে ওঠে এবং সৃষ্টি প্রকৃতি বিকাশ লাভ করে। আসল কথা হল সৃষ্টি পূর্বে তান্ত্রিকী শ্রুতি মতে কৌমারী শ্রুতি মতে কৌমারী আদ্যাশক্তি, পুরুষ ও মূলাপ্রকৃতিতে দ্বিধাভূত হয়ে উভয়ের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করেন — তাঁদের কম্পনের জন্যই উভয়ের মধ্যে যোগ বিয়োগ ঘটে এবং এই যোগের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে সৃষ্টি প্রকৃতির লীলা হতে থাকে ফলে বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ হয়। বিন্দু থেকে জাত নাম ও রূপ মায়াজন্য হলেও অদ্বৈত বেদান্তের মত তন্ত্র অবিদ্যাজাত মনে করে না। মানুষের মন ও দেহ মায়াজন্য, তবু তাদের সাহায্যে সাধনা করে ‘ছোট মেয়ের’ পরিচয় পাওয়া যায় — যদিও ‘ছোটবাচ্চী’ নাম ও রূপের অতীত। অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাস করেও তন্ত্র বলেন যে দেহ দ্বারাই আত্মা বা মার ধারণা চিন্তে জেগে ওঠে। দেহকে মনোবৃত্তি ইত্যাদি দ্বৈতবাদ আসে, তন্ত্রের মতে এই দ্বৈতবাদ মধুর। এই যে তুমি মা — আমি ছেলে ভাব — তুমি ছেলে ভাব দ্বারা বুঝা গেলেই আর ভেদ থাকে না — তাই সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত মাকে মেয়ে রূপে বা মা রূপে চিন্তা করাই হল মূল কথা। তবে স্বমূলতত্ত্ব জানতে হলে কৌমারী রূপে বা ছোটমেয়ে রূপে মাকে জানতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

আমার জীবনে প্রথম মাতৃদর্শন

— শ্রী মুরারি মোহন দে

মাকে প্রথম কোথায় কোনদিন কিভাবে দর্শন পেয়েছি তাই নিয়ে আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। তবে এই দিনটা যে একটি বিশেষ দিন আমার জীবনে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

লোক পরম্পরা এবং পত্রিকা মারফত জানতে পারি মা কোলকাতায় এসেছেন ১৯৭৫ এর জুন মাসে। কিন্তু কিভাবে তাঁকে দর্শন করি সে বিষয়ে যত ভাবনা। কথায় বলছিলাম আমারই এক বিশেষ পরিচিত দম্পতি যাঁরা দীর্ঘ কয়েকবৎসর সরকারী চাকুরীর জন্য দেবাদুনে ছিলেন এবং তাঁরা দেবাদুনে মায়ের এক ভক্ত বিশুদ্ধার বাড়ীতে ছিলেন। তাঁদের মুখে জানলাম আমারই প্রতিবেশী শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী মায়ের অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত আছেন। আমি তখনই শ্রী সদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সাথে যোগাযোগ করি। সে দিনটা আমার বেশ মনে আছে ৮ই জুন রবিবার বিকালবেলা। আমি যাওয়াতে এবং মায়ের সম্বন্ধে জানতে চাওয়াতে তাঁরা বেশ সাগ্রহেই বললেন যে, মা গতকাল শ্রীপ্রতিভা কুন্ডু মহাশয়ের বাগানবাড়ী গোবিন্দপুরে ছিলেন কিন্তু ঠিক ঐ দিন কোথায় আছেন তাঁরা বলতে পারছেন না। তখন হঠাৎ ঐ বিকালবেলায় আমার একটা চিন্তা হল তাহলে মাকে কোথায় গেলে দেখা পাব। একথাটা নিশ্চয়ই কুন্ডু বাড়ীতে একটা ফোন করলে জানতে পারব। আমার চিন্তা অনুযায়ী আমি কুন্ডু বাড়ীতে ফোন করে জানলাম মা কোলকাতার উপকণ্ঠে ভাসা নামক জায়গায় শ্রী বিভূতি চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। ঐদিন মনে হল ছুটে চলে যাই। কিন্তু অনেকেই বললেন যে, ঐ দিনই না গিয়ে পরের দিন সোমবার গেলে ভাল হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি ঐ দিন যোধপুর পার্কে শ্রীকুন্ডুর বাড়ীর সন্নিকটে এক ঘরোয়া কালীপূজা উপলক্ষে আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম। রাত্রে ঐ কালীপূজার বাড়ীতে যোগ দিয়ে ফিরবার সময়ে কুন্ডু বাড়ী হতে ভাসা যাওয়ার মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে রাত্রে বাড়ী ফিরে এলাম। বিছানায় শুয়ে আর ঠিক ঘুম আসে না। মনে মনে শুধুই ভেবে চলেছি কাল কখন সেই জগজ্জননীর দর্শন পাব।

প্রকৃতির নিয়মে দিন চলে যায় রাত্র আসে — রাত্র চলে দিন আসে। রাত্র চলে গেল পরের দিন খুব সকালে উঠে স্নান ও কিছু প্রাতঃরাশ সেরে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুসহ ভাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যখন ভাসায় গিয়ে পৌঁছি তখন সকাল ৯টা হবে। প্রথমেই দেখি প্রচুর ভক্ত শ্রী চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে ভরে গিয়েছে। কাউকে চিনি না — জানি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। কিন্তু সত্যিই এক অপূর্ব আনন্দের দোলা দিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত এই ভেবে যে, আজ জগজ্জননীর দর্শন পাব। নীচতলায় দেখি সুমধুর কীর্তন চলছে। দ্বিতলে মহিলাভক্তের ভীড়। জানলাম যে মা তিনতলায় দীক্ষার জন্য খুবই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ভাবছি তাহলে কি হবে? এই রূপ ভাবনার মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন আমি দ্বিতলে বারান্দার একধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় এক সৌম্যমূর্তি গুরুাধারী সাধু এসে ইংরাজীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — আমি কি চাই। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম যে আমি

যা চাই তার ব্যবস্থা কি আপনি করতে পারেন। উনি মৃদু হেসে বললেন — “আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি এইমাত্র।” তখন আমি মায়ের সাথে দর্শনের অভিল্যষ তাঁর নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি তার উত্তরে বললেন যে, “দেখি আপনার জন্য কি করতে পারি”, বলে তিনি তিন তলায় চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে এসে আমাকে জানালেন যে, মা আমাকে দর্শনের অনুমতি দিয়েছেন — শুধু তাই না — অধিকন্তু আরও বলে পাঠিয়েছেন যে, তখনকার মত ফুলফল যা আছে তাই নিয়ে তিনতলায় মায়ের কাছে যেতে, আমাকে দীক্ষা দেবেন। তাঁর মুখে আমি দীক্ষার কথা শুনে ত একেবারে হতবাক। একি, এলাম জগজ্জননীর দর্শনে — আর তিনি আমাকে দর্শন ত দেবেনই অধিকন্তু দীক্ষাও দেবেন। এই ভেবে মনটা আনন্দসাগরে ডুবে গেল। সত্যের অপলাপ জীবনে জ্ঞানতঃ করি নাই। তাই সেদিনও ঐ আনন্দক্ষণের মধ্যে সত্যের অপলাপ না করে উক্ত মহান সাধুকে বললাম — দয়া করে মাকে জানানো যেন যে আমি সকালে কিছু প্রাতঃরাশ করে এসেছি। তারপরেও মা যদি মত করেন তাহলে দীক্ষা নেব।

এই বলে তাঁর পিছনে গিয়ে তিন তলায় বেঠনী পেরিয়ে উপরে উঠতেই সে কি এক অপকল্প জ্যোতি সমন্বিত মাতৃ-মূর্তি। শুভ্রবসনা — একটা ঈষৎ কাল কাঁচের রোল গোল্ড ফ্রেমের চশমা পরিহিতা মা দীক্ষা দানের পূর্বে ভক্তজনের সাথে আলাপরত। পাশে দণ্ডায়মান ঋষি বাম্বিকীর ন্যায় এক সাধু যাকে আমি পরে নির্বাণদা বলে চিনি। পাঠকরা ভাবছেন উক্ত গৈরিকবসন পরা সাধু কে — যিনি অত তাড়াতাড়িতে মায়ের সাথে যোগাযোগ করে আমাকে নিয়ে গেলেন। উনি আর কেহ নয় — হচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীভাস্করানন্দজী যাকে আমরা ‘ভাস্করদা’ বলেই জানি। তিন তলায় উঠতেই মা ইশারা করে ঘরের ভিতর বসতে ইঙ্গিত করলেন। ভিতরে বসে আছি। কাঁচের জানলার পর্দাটা সরাতেই মা পিছন ফিরে আমার অবস্থাটা জাগতিক চোখে দেখে নিলেন। ঘরের ভিতর মিনিট পাঁচেক বসার পর মা বাহিরের সবার উদ্দেশ্যে কি যেন বলে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। মনে মনে ভেবে আছি মা নিজের আসনে উপবিষ্টা হবেন। তারপরে তাঁর চরণের পানে একটা সম্ভ্রান্ত ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হবে। এখানে আমার লেখনীর ভাষা নাই। দেবলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সব জাগতিক ভাবধারার উর্দ্ধে। তাই তিনি কি করলেন সে কথা পাঠকদের বিস্তারিত জানানোর ভাষা আমার নেই। শুধু মনে হল কৃত যুগ যুগান্তর ধরে তিনি আমাকে চেয়েন, বা, জানেন! যেমন সামান্য উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে দীর্ঘ ১৪।১৫ বৎসর পরে সন্তান পাশ্চাত্য দেশ হতে নিজ দেশে ফিরে তার মায়ের সাথে দেখা হলে যেমন ভাবটা ঠিক এটাও তেমন ভাব মনে হ’ল। মা যেন সন্তানকে সব সময়ই চিনে মনে রেখেছেন। আর এদিকে অল্প সন্তান এতদিনে তার মাকে দর্শন করল। আমার বেশ মনে আছে সেই দিন ও ক্ষণের কথা। তা ৯ই জুন, ১৯৭৫ সাল সোমবার সকাল ৯-৪০মিঃ এ আমার জীবনে যুগপৎ প্রথম মাতৃদর্শন ও মনুষ্যজীবনের চরম প্রাপ্তি দীক্ষা লাভ ঘটে।

জয় মা।

“এই শরীরটার কোনও সংকল্প নেই - কোন বন্ধনও নেই। উড়া পাখী ঢুকে যায় তোমাদের আশ্রমে, বেরিয়ে যায় আবার।” — শ্রীশ্রীমা।

আমার মা আনন্দময়ী

[তিন]

— 'বিগুদা'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে — বাসন্তীপূজার সময় ভিড়ের মধ্য দিয়ে কন্যাপীঠের মেয়েদের মণ্ডপে নিয়ে যাবার সময় কন্যাপীঠের এক কুমারী শুদ্ধাদি কোমরে ক্ষমাদির হাত লাগায় সে যন্ত্রণায় “ওঃ” করে ওঠে, যা ক্ষমাদির নজর এড়ায়নি। পরে ক্ষমাদি তাকে জিজ্ঞেস করায় কিছু বলেনা আর খুব লাজুক বলে দেখাতেও চায় না। শেষে সকলের পীড়াপীড়িতে দেখাতে বাধ্য হয়। তখন দেখা গেল তার কোমরে এক জায়গায় লাল হয়ে ফুলে আছে, এত ব্যথা যে হাত দিতে দিচ্ছে না। ডাক্তার দেখে বললেন — “এক্ষুনি অস্ত্রোপচার করতে হবে আর রোগিনীর এত দুর্বল অবস্থা যে তাকে অস্ত্রান করাও চলবে না।”। সার্জ্ঞন স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে পরামর্শ করে আশ্রমেই শুদ্ধাদির ঐ অপারেশন করেন।

অপারেশনের দিন দুপুরে আমরা আশ্রমে গেলাম। দেখলাম দোতলায় একটি বড় ঘরে শুদ্ধাদিকে শোয়ানো হয়েছে। তার ইচ্ছানুসারে মাথার কাছে একটি টবে তুলসী গাছ ও তার নীচে শুদ্ধাদির স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃ প্রদত্ত গোপালকে বসানো হয়েছে। বিবেকদি শিয়রে ও ক্ষমাদি পায়ের কাছে বসে আছেন। অখণ্ডানন্দজীও সামনে রয়েছেন। দরজার বাইরে কন্যাপীঠের মেয়েরা মা-মা নাম করছে। অস্ত্রান না করেই ডাক্তার অস্ত্রোপচার করলেন। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা লাগলো। কোমরের এক পাশে বেশ অনেকটা কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সব বার করে দীর্ঘ গজ ঢুকিয়ে দিলেন অখচ আশ্চর্য্যের বিষয় শুদ্ধাদি যে গুরুতে হাত দুটো জোড় করে উপরে গোপালের দিকে চোখ রেখে শুলো এই দীর্ঘক্ষণ এত কাটা ছেঁড়ার মধ্যে টু শব্দও করলো না। অদ্ভুৎ সহ্য শক্তি অথবা গোপালের কৃপা।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে শুদ্ধাদির বাবা মা, আমার মেসোমশাই ও মাসীমা, কাশীতে এসে চিকিৎসার জন্য মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে রেখে বিশিষ্ট সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসায় কয়েকবার অস্ত্রোপচারের পর যখন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল তখন ডাক্তারের সামান্য অসাবধানতায় শুদ্ধাদি মারা যায়। যতদিন হাসপাতালে ছিল মেসোমশাই তার গেলো প্রসাদ নিয়ে গেলে তারপর অন্য কিছু খেতো। অদ্ভুৎ নিষ্ঠা ছিল।

এই শুদ্ধাদির যখন ৫।৬ বছর বয়স, পিতৃদত্ত নাম বাসন্তী, তখন আমার দিদিমা বিরাজমোহিনী দেবীর সঙ্গে বিব্রাচলে মার আশ্রমে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে ছিলেন। মায়ের দর্শন করতে বহু ভক্ত সমাগম হতো। অনেকে মার সঙ্গে একান্তে কথা বলতেন, যাকে বলা হতো মার সঙ্গে ‘প্রাইভেট’ করা। একদিন ছোট্ট মেয়ে বাসন্তী বলছে — দিদিমা, আমিও মার সঙ্গে প্রাইভেট করবো; বারবার এককথা বলায় দিদিমা ধমক দেন — চুপ কর তুই আবার কি প্রাইভেট করবি ? কিন্তু সরল বালিকা জিদ ধরে — সে মার সঙ্গে একা কথা বলবেই। অগত্যা দিদিমা তাকে মার কাছে নিয়ে গেলে একান্তে মাকে বললো সে স্বপ্নে দেখে

বেশ মোটাসোটা বাল গোপাল বসে বসে নিজের ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চুষছে। তার ঐ রকম গোপাল চাই।

ভক্তের ভগবান। তিনি কি শিশুর এই প্রাণের আবদার না রেখে পারেন ? মা দিদিমা ও বাসন্তীকে নিয়ে মির্জাপুরে স্যাকরার দোকানে গিয়ে স্বপ্নে গোপালকে যেমনভাবে দেখেছে সেইভাবে বাসন্তীকে বসতে বললেন। তাই দেখে কারিগর একে নিলেন। মা অষ্ট ধাতুর বেশ বড় সড় গোপাল বানান্বে বললেন। তারপর মূর্তি তৈরী হয়ে এলে মা বাসন্তীর সঙ্গে গোপালের যথারীতি বিয়ে দেন আর ছোট বাসন্তীকে বলে দেন কিভাবে পরম পতি গোপালের নিত্য সেবা করবে। এটা বাসন্তীর ছয় বছর বয়সের ঘটনা — আর সে মারা যায় ১৬।১৭ বছর বয়সে — আজীবন কেন দিন গোপালের সেবা না করে কিছু খেতো না। তা যতই অসুস্থ থাক না কেন।

তখন দেবাদুনে রায়পুরে কন্যাপীঠ ছিল। আমার বাবা, দিদি সাবিত্রী ও মাসতুতো দিদি বাসন্তীকে নিয়ে মার কাছে রায়পুরে যান। প্রথমে সাবিত্রী ও পরে বাসন্তী মাকে প্রণাম করে, আর তখনই মার শ্রীমুখ থেকে বেরোয় — শ্রদ্ধা, শুদ্ধা — এইভাবে মায়ের দিব্য খেয়ালে ওদের নূতন নামকরণ হলো। ওরা কন্যাপীঠে প্রায় দেড় বছর থাকে। তারপর শুদ্ধাদিকে চিকিৎসার জন্য তার বাবা নিয়ে যান আর কন্যাপীঠে তখন পড়াশুনার তেমন ব্যবস্থা না থাকায় আমার মা দিদির বাড়ীতে নিয়ে আসতে চান। কিন্তু দিদি কিছুতেই আসবে না, একরকম জোর করেই নিয়ে আসা হলো। একটি ফ্রক ও চাদর পরে বাড়ীতে এসেছিল, তাই ধুয়ে শুকিয়ে পরতো নূতন ফ্রক কিনে তা পরবে না। কন্যাপীঠের মেয়েরা ত শুদ্ধাচারে থাকে অন্যের হাতে খায় না, দিদি ও মার হাতে রান্না খাবে না, মাত্র ৮ বছর বয়স রাঁধতেও জানেনা। বিছানায় শোবে না, গায়ের চাদরটা মাটিতে পেতে শুতো। এসব দেখে মা দিদির একদিন আশ্রমে নিয়ে গেল যদি মন একটু ভাল হয়। ও আশ্রমে গিয়ে একটা ছোট ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলো, বহু ধাক্কাধাক্কিতেও দরজা খুললো না। শেষে মনঃ ক্ষুণ্ণ হয়ে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। আমরা রাতে ঘুমিয়ে আছি, মাঝরাতে খুকুনীদির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গলো। দেখি দিদির নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, বললেন — “নগেনদা, এই নিন আপনার মেয়ে” — এই বলে দিদির দিয়ে গেলেন। পরে শুনলাম খুকুনীদি রাতে আশ্রমে ফিরে সব শুনে দিদির ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন। খুকুনীদি আরো বললেন — “মা বলছেন, শ্রদ্ধা শুদ্ধাচারী হলেও গর্ভধারিণী মায়ের হাতের রান্না খেতে বাধা নেই”। সেই অবধি আশ্রমের শুদ্ধাচারী মেয়েরা নিজ নিজ গর্ভধারিণী মায়ের হাতে খেত।

দিদি বাড়ীতে পড়াশুনা করতে লাগলো। এর কিছুদিন পর হঠাৎ কয়েক ঘন্টার অসুস্থতায় আমার মা ৩৫ বছর বয়সে কাশীপ্রাপ্ত হন। বাবা বরাবরই সাধুসঙ্গ ও সংসঙ্গ প্রিয়। এজন্য কাশীতে বাবার পরিচিত বলতে রামকৃষ্ণ মিশন ও মার আশ্রমের কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং তাঁরা প্রায়ই সংপ্রসঙ্গ আলোচনার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসতেন। সংযোগ বশতঃ সেদিন আমার মায়ের অন্তিম সময়ে ৫৬ জন সাধু ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা সমন্বরে বেদপাঠ করছিলেন মনে আছে। আমার বাবা আমাদের নিয়ে নিয়মিত সন্ধ্যা কীর্তন করতেন। সেদিনও কীর্তন শেষে সন্ধ্যা সীতের বেদধবনি শুনতে

শুনতে মা সজ্ঞানে বিশ্বনাথের চরণে লীন হন। শ্রীশ্রীমা সে সময় বিক্ষাচলে ছিলেন। আমার মার অস্তিম সংবাদ শুনে মার মুখ থেকে বের হয় — “ঠিক এক বছর কাশীবাস করে কাশীপ্রাপ্তি হলো”। বাবা পরে মার ডায়েরী মিলিয়ে দেখেন মার কথাই ঠিক।

আমার মা চলে যাবার পর আমাদের পালন করবার জন্য শ্রীশ্রীমা আমার দিদিমাকে পাঠান। দিদিমা এসে আমাদের বলেছিলেন — দ্যাখ, কথায় বলে, ‘শিশুকালে মরে মা, তাদের দুঃখ ঘোচে না’, কিন্তু মনে রাখবি আদর করে কেউ এক গ্লাস জল দিলেও অবহেলা করবি না — দেখবি জীবনে স্নেহ ভালোবাসার অভাব হবে না। সত্যিই দিদিমার এই বাক্য অনুসরণ করে আমি জীবনে সকলের অকুণ্ঠ স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি — এটা মায়ের অশেষ কৃপা মনে করি। এই সময় আমার একসঙ্গে বসন্ত ও টাইফয়েড হয় ও দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। কেউ কেউ বলতো মাকে এত ভালবাসতো তার টানে বোধ হয় এও চললো। খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল। তখন একদিন দুপুরে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি — কাশীতে মার আশ্রমের জায়গায় গঙ্গার ধারে তার কাঁটার বেড়ার পাশে শ্রীশ্রীমা পায়চারী করছেন, আমি আর দিদি শ্রদ্ধা দাঁড়িয়ে আছি। হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনে এসে মা হেসে বললেন — “বন্ধু, এই ত তুমি ভালো হয়ে গেছ।” ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিকেল ৪টায় দিদি আমার জ্বর দেখবার জন্য থার্মোমিটার ঝাড়তে গিয়ে ভেঙ্গে গেল, আমি বললাম — ব্যাস্, আর জ্বর দেখতে হবে না, আমি ভাল হয়ে গেছি। জানিস্, এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম মা বলছেন, “বন্ধু, তুমি ভাল হয়ে গেছ”। এর পর সত্যিই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম।

আমার মার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়ে যাবার পর শ্রীশ্রীমার আদেশে তাঁর ছোট বোন হেমী মাসীমার (হেমাদ্বীপী দেবী) বড় মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে আমার বড়দার বিয়ে হয়। তখনো কন্যাপীঠের মেয়েরা আসেনি। মনে আছে বাগান থেকে দুর্বা এনে প্রদীপ জ্বালিয়ে মার সামনে বৌদির আশীর্বাদ হলো, মা সকলকে মিষ্টি দিলেন। এর মধ্যে এক মহিলা মার জন্য বড় রূপোর বাটি ভর্তি ক্ষীর করে নিয়ে এলেন। উপস্থিত সকলে রূপোর চামচ করে মার মুখে ক্ষীর দিতে লাগলেন। আমিও এগিয়ে গেলাম। খুকুনীদি বললেন — “কি তুমিও খাওয়াইবা?” আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম। মা মিষ্টি হেসে বললেন — “দে-দে অরে খাওয়াইতে দে।” আমি নির্ভয়ে বড় চামচে ক্ষীর তুলে মার মুখে দিলাম। মা হেসে বললেন — “দেখছিস্ হাতও একটু কাঁপে না।” মাকে আমার এই প্রথম খাওয়ানো। তখন আমার বয়স ১০।১১ হবে।

আমাদের বাড়ীতে প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবারে সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, কুমারী ও দরিদ্র নারায়ণ ভোজন হতো। কাশী আশ্রম হবার পর কাশীতে থাকলে দিদিমা (স্বামী মুক্তানন্দনগিরিজী), মৌনীমা, নিশিদাদু (নিশিকান্ত মিত্র), হেমীদি প্রভৃতি আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং অন্নগ্রহণ করতেন। মৌনীমা তাঁর সাধনার অঙ্গ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কিছুদিন মেঝে পরিষ্কার করে সেখানেই ভাত, ডাল, তরকারী খেতেন। আবার কিছুদিন গামছা পেতে তার উপরও ভাত খেতে দেখেছি। সেই সময় নিশিদাদু আমাদের মার গল্প শোনাতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার কিছুই মনে নেই।

ছোটবেলায় খুব চঞ্চল ও দুট্টু ছিলাম। ঘরে বসে মেয়েলী কাজ করতে একদম ভাল লাগতো না। ভাইদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানো, কুস্তি করা, সাঁতার কাটা, নৌকা বাওয়া, দৌড় বাঁপ করতেই ভাল লাগতো। অবশ্য ভাল না লাগলেও দিদিমা কাঁথা সেলাই, ন্যাকড়ার পুতুল বানানো ইত্যাদি অনেক কাজ শিখিয়েছিলেন। সব সময় হাসা আমার স্বভাব ছিল, মুদ্রাদোষও বলা যায়। এজন্য বড়দের কাছে বকুনীও কম খাইনি। সবই করছি কিন্তু মার অভাব যেন ভুলতে পারতাম না। প্রায় রোজই গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশ্রমে যেতাম। শ্রীশ্রীমা তখন প্রায়ই কাশীতে থাকতেন। আশ্রমে গেলে মা বলে ডাকতে পারি এজন্য খুব ভাল লাগতো। আমার পুরুষালী স্বভাবের জন্য আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে দিদিমা আমাকে কন্যাপীঠে ভর্তি করার কথা খুকুনীদিকে বলেন।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৯ সনে আমি সানন্দে কন্যাপীঠে যোগদান করি। তখন আমি স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি এবং ক্লাসে প্রথম ৩ জনের মধ্যে ছিলাম। কন্যাপীঠে তখন পড়াশুনার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় আমার বাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মায়ের আকর্ষণ আমাকে টেনে আনে। বাড়ীতে আমার নাম ছিল গায়ত্রী। কন্যাপীঠে গায়ত্রী নামে আর একটি মেয়ে থাকায় বড় গঙ্গাদি (গঙ্গাদেবী, পঞ্চতীর্থ) মাকে বলেন। মা আমার নাম দেন ‘শুদ্ধা’। আমার দিদিমা আশ্রমে এসে জানতে পারেন যে মা আমার নূতন নাম দিয়েছেন ‘শুদ্ধা’। শুনেই দিদিমার চোখে জল আসে। বলেন, একবার মা শুদ্ধা নাম দিলেন সে অকালে চলে গেল আবার শুদ্ধা? এই কথা শুনে গঙ্গাদি মাকে জানানেন। তখন মা কন্যাপীঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলেন, হাততালি বাজিয়ে বললেন — তোমরা যাই বল শুদ্ধা আমি ছাড়ছি না, বেশ ত আগে একটা ‘বি’ লাগিয়ে নেও — বিশুদ্ধা — বিশুদ্ধা। হয়ে গেলাম বিশুদ্ধা। দুট্টু ছিলাম বলে ক্ষমাদি রেণুদিরা আদর করে বলতেন — ‘বিচ্ছু’। বিমলাদি (স্বামী দয়ানন্দজী) ডাকতেন ‘বিশু’।

বৃন্দাবনে দাদাভাই তখন খুব অসুস্থ। বিমলাদি, রেণুদি, গিনিদি ও আমি তাঁর সেবায় আছি। একদিন বিমলাদি আমাকে ‘বিশু, বিশু’ বলে ডাকছেন শুনে মা বলছেন তোমাদের বুঝি সুন্দর নামটা মুখে উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করে না? ২।৩ বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথা বলছেন, বিমলাদি ঘরের বাইরে ছাদে কাজ করছিলেন, মার কথা শুনে পাচ্ছেন না দেখে দাদাভাই বললেন — “এই বিমলা, শুনতাছস্ না মা কি কয়? বিশুদ্ধা ডাকতে পারস্ না?”

কলকাতায় চিকিৎসার জন্য মা পাঠিয়েছেন। পেটে ব্যথা, হ্যারিংটন নাসিং হোমে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমি ও তারা গেছি। ডাক্তার সত্য বোস আমাদের নাম জিজ্ঞেস করায় বললাম — শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কে দিয়েছিলেন? বললাম — মা! শুনে বললেন — আপনি বুঝি আনন্দময়ী মায়ের favourite (প্রিয়)? আপনাকে এত সুন্দর নাম দিয়েছেন, কই অন্যকে (তারা কে) ত দেননি? সত্যি কথা বলতে কি একথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো। মার প্রিয় কে না হতে চায়? ডাঃ বোসের এই কথাটা মাকেও বলেছি, শুনে মা দারুণ মিষ্টি হেসেছেন।

(ক্রমশঃ)

“শ্রীমাকে কিছু দিতে পারছি না”

— শ্রীমতী সঙ্কিতা সেনগুপ্তা

শ্রীমায়ের সুন্দর মধুর বাণীগুলি,
 আমি কেমন করে যাই ভুলি।
 কত সুন্দর শিক্ষা,
 কত মনোরম দীক্ষা।
 আচানক্ করে উঠি চিৎকার,
 বলি, এটা আমার, ওটা তোমার।
 কত ভাগবৎ, কত চন্দী, কত গীতা পাঠ,
 তবু ছাড়তে পারছি না নিজের ঠাট্ বাট্।
 কত নাম, কত গান, কত ধ্যান,
 তবু হলো না আমার জ্ঞান।
 কত যজ্ঞ,
 আজো আমি অজ্ঞ।
 কত শত ঢোল,
 কিন্তু মাগো, পান্টাতে পারলাম না আমার ভোল।
 কত শিক্ষা দিয়েছিলে —
 বলেছিলে —
 সব দিতে,
 সব পেতে।
 কত দিয়েছো অভয়,
 শুধু চেয়েছিলে দশ মিনিট সময়,
 সংসার সমুদ্রের মাঝে —
 তাও দিতে পারিনি সময় করে।
 ভাইজীর দ্বাদশবাণী,
 এ-তো সোনার খনি।
 মাগো, সোনাতো তুলতে পারছি না,
 আমার নাই ‘সমচিন্ততা’, না আছে ‘সহনশীলতা’।
 মায়ের হাসি খিল্ খিল্,
 আজো কারো প্রতি মন হলো না ‘শ্রদ্ধাশীল’।
 গুরুপ্রিয়াদিদির অমূল্য বই,
 তাও মনে রাখি কই।

মায়ের কত লীলা খেলা,
 সাধু মহাত্মা, রাজা মহারাজার মেলা,
 দেশে দেশে বিচরণ —,
 জ্ঞানীগুণীদের সাথে মধুর আচরণ।
 অমূল্য দাদার 'আনন্দময়ী প্রসঙ্গ',
 এও তো বিরাট সংসঙ্গ।
 কিন্তু মাগো, আমি তো তোমায় কিছু দিতে পারছি না।
 আমার কিছুই হচ্ছে না।
 শুধু মনে এইটুকু সান্ত্বনা, তোমার একটি লক্ষ্য আছে আমাদের প্রতি,
 সকলের সাথে হয়তো আমরা হবে, তোমার শ্রীচরণে সদৃগতি।
 “মাগো,
 আবার তুমি এসো।”



“সকলের সঙ্গে সত্যকথা বলবে। গুপ্ত কথা, গোপন ও মিথ্যা ব্যবহারে চুরি
 করা হয়। তাহাতে কিন্তু মনকে কলুষিত করে, দুঃখের সাগরে ভাসায়। সত্যবদ্ধ
 ও পবিত্র জীবন আনন্দ ও পরম সুখের অনুকূল।” — শ্রীশ্রীমা

আশ্রম-সংবাদ

কনখল

কনখলে শ্রীশ্রী মায়ের পূতচরণতল চিহ্নিত আনন্দজ্যোতিঃপীঠের পাদমূলে আশ্রম-প্রাঙ্গণ সারা বছরই উৎসব-মালার নানা বিচিত্র শোভা সুরভিতে সুশোভিত-সুরভিত পরিলক্ষিত হয়।

শ্রী শ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রী পি. পি. মাধবজী স্বীয় ধর্মপত্নীর স্মৃতিতে ১৮ই জুন হতে ২৫শে জুন শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন করেন। প্রাতঃস্মরণীয় ভাগবত সম্রাট স্বামী অখন্ডানন্দজীর প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মচারী শ্রী গিরীশানন্দজীর সুললিত ভাগবতী ব্যাখ্যা শ্রবণ করে সকলে মুগ্ধ হন।

পুনর্ব্বার একমাসের মধ্যেই আবার আশ্রম ভাগবতী কথায় মুখরিত হয়ে ওঠে। পূর্ব্বোক্ত বক্তাই এবারেও ভাগবত পাঠ করেন। এবারে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্রী বি. কে. শাহ (ভাইয়া) ও শ্রীমতী লীলাবনের পুণ্য স্মৃতিতে ১৭ই জুলাই হতে ২৪শে জুলাই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ সাড়স্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই গরিমাময় অনুষ্ঠানের সংযোজনায় ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভাইয়ার কন্যা ও জামাতা, শ্রীমতী সুনয়না ও শ্রী মহেন্দ্র মেহতা এবং পুত্রগণ শ্রী সুধীর শাহ ও শ্রী সঞ্জয় শাহ ও তাঁদের ধর্মপত্নীরা শ্রীমতী পঞ্চজাবেন ও শ্রীমতী কুন্তীবেন প্রভৃতি। এই ভাগবত উপলক্ষ্যে অনেক মাতৃভক্ত আশ্রমবাসী ও ব্রহ্মচারীগণ কনখল আশ্রমে সমবেত হয়েছিলেন। কাশী হতে কন্যাপীঠের কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীরাও এই উপলক্ষ্যে কনখল গিয়েছিলেন।

পূজনীয় ব্রহ্মচারী গিরীশানন্দজীর ভাবগম্ভীর মধুর কণ্ঠের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে রসরাজ ব্রজরাজের লীলা মধুরামৃত পান করে সকলে পুলকিত হন। বিশেষতঃ মধুবন্দাবনে রাসবিহারীর মহারাসের মধুরিমা আনন্দনে শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দরের প্রিয় পরিকর উদ্ধব-গোপী-সংবাদে প্রেমভক্তি অমিয় সুধারসের প্লাবনে সকলে পূর্ণরূপে আপ্ত হন। ভাগবতের শেষের দিন অপূর্ব্ব ভাবময় পরিবেশে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতা ও ব্রহ্মচারিণী গুণীতা আশ্রমের পক্ষ হতে পূজনীয় ব্রহ্মচারী গিরীশানন্দজীকে সশ্রদ্ধ প্রণামাজলি অর্পণ করে কৃতজ্ঞতা জানান ও বি. কে. শাহর পরিবারজনদের এই অনবদ্য অনুষ্ঠানের জন্য অভিনন্দন জানান। এই অনুষ্ঠানে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মায়ের অশেষ কৃপা অনুভূত হয়। স্বামী পূর্ণানন্দজী ও ব্রহ্মচারিণী গোপালপ্রিয়া ও অন্যান্য মাতৃভক্তদের অক্লান্ত পরিশ্রম অবশ্যই প্রশংসনীয়।

গুরুপূর্ণিমার পুণ্যপর্বে গত ২৮শে জুলাই গিরিজীর মন্দিরে শ্রী শ্রী গিরিজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধুভাণ্ডারা যথোচিত ভাবে সম্পন্ন হয়। আনন্দ জ্যোতিঃপীঠে শ্রী শ্রী মায়ের পূজা ও শ্রী শংকরাচার্যের পুরোভাগে শ্রীপদ্মনাভের পূজা হয়। গুরু পূর্ণিমার পূজার আয়োজক ছিলেন শ্রী প্যাটেল পরিবার।

পূজনীয় গিরিজীর তিরোধান তিথিতে ১৮ই আগস্ট গিরিজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধুভাণ্ডারা আয়োজিত হয়।

ঝুলনদ্বাদশীতে ভাইজীর তিরোধান তিথিতে ২৩শে আগস্ট ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও ২৬শে আগস্ট ঝুলনপূর্ণিমার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২রা সেপ্টেম্বর শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শরতের সুনির্মল শাস্ত্র স্বচ্ছ সুসমায় দেবীর আগমনে সারা দেশ মায়ের আরাধনায় মেতে

ওঠে! কনখলেও মায়ের আশ্রমে আগামী দিনে ১৪ই অক্টোবর হতে ২০শে অক্টোবর শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা, ২৪শে অক্টোবর শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজা এবং ৭ই নভেম্বর শ্রী শ্রী শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

বারাণসী

সোমার্দ্ধধারী ত্রিপুরারি নিখিল ভুবনপালনকারী শিবশঙ্করের প্রিয়নগরী বারাণসীতে মায়ের আশ্রমে গত ২৮শে জুলাই গুরুপূর্ণিমার পুণ্যময় লগ্নে গুরুপূজা অর্চনায়, বন্দনা, কীর্তনগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গিরিজীর মন্দির। আনন্দজ্যোতি মন্দিরে শ্রী শ্রী মায়ের পূজায় কন্যাপীঠের কন্যাদের কণ্ঠে উদঘোষিত হয় পবিত্র বেদের মন্ত্র। এই উপলক্ষ্যে সাধুভাণ্ডারাও সংযোজিত হয়।

১৮ই আগস্ট শ্রী শ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথিতে গিরিজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু সেবা উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রাবণের শ্যামল শোভার অপূর্ব শ্যামলিমায় সর্বত্রই শ্যামসুন্দরের ঝুলনোৎসবের বাহার দেখা যায়। কন্যাপীঠে ঠাকুর ঘরে গত ২২শে আগস্ট একাদশী হতে সুসজ্জিত ঝুলনায় ঠাকুরদের বসানো হয়। ঝুলন পূর্ণিমার রাতে শ্রী শ্রী মায়ের ও ঠাকুরদের বিশেষ পূজা হয়। ঝুলন একাদশী হতে ঝুলনপূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর শ্রী গোপালজীর মন্দিরে গোপালজীকে ঝুলানো হয়। গোপালজীর বিশেষপূজা ও কীর্তন সম্পাদিত হয়। এবারে কলকাতা হতে ব্রহ্মচারিণী বিম্বদ্বা এসে শ্রীগোপালজীও অন্যান্য ঠাকুরদের অঙ্গরাগ করেন। ঝুলনদ্বাদশীর দিন ভাইজীর তিরোধান তিথিতে ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধুভাণ্ডারা হয়। ঝুলন পূর্ণিমার দিন ২৬শে আগস্ট রাত্রিতে শ্রী শ্রী মায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষ্যে ধ্যান ও কীর্তন সুসম্পন্ন হয়। ঝুলনোৎসবে প্রতিদিন রাত্রিতে কন্যাপীঠের কন্যারা হলঘরে লীলাভিরাম শ্রীভগবানের লীলাভিনয় করে হর্বোন্মাসে উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই প্রথা শ্রী শ্রী মায়ের সময় হতেই চলে আসছে।

শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর আনন্দময় পরিবেশে ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শ্রী শ্রী গোপালজীর অভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে পূজা পরিদর্শনে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। কন্যাপীঠের ঠাকুরঘরে মায়ের বিশেষ পূজা ও হলঘরে পুতুল দিয়ে ভগবানের নানা লীলাভিরাম প্রদর্শিত হয়। পরদিন গোপালজীর সামনে সানন্দে নন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সাড়ম্ববে কন্যাপীঠের সংস্কৃত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব সংস্কৃত বিভাগাধ্যক্ষ মাননীয় ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এবং মুখ্য অতিথি ছিলেন জগদগুরু রামানন্দাচার্য স্বামী শ্রী রামনরেশাচার্য মহারাজ। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন অধ্যাপক রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী, ডঃ সুধাংশুশেখর শাস্ত্রী, ডঃ রেবতী রমণ পাড়ে, ডঃ গঙ্গাধর পাণ্ডা প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ। এই উপলক্ষ্যে কন্যাপীঠের কন্যারা সংস্কৃত ভাষাতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। কাশীর বহুগণ্যমান্য পণ্ডিতেরা এই সমারোহে যোগদান করে উৎসবটিকে সার্থক করে তোলেন। স্বামী রামনরেশাচার্যজী বলেন মনকে সুসংস্কৃত করাই হল সংস্কৃতদিবস পরিপালনের সার্থকতা।

বিশ্ববিশ্রুত মনীষী মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ১১৩ তম জন্মদিবস গত ৮ই সেপ্টেম্বর আশ্রমে অতি সুষ্ঠুভাবে পরিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কাশীর বহু মাননীয় পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। এই সভাতে সভাপতি ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডঃ রামমূর্তি শর্মা। মুখ্য অতিথি ছিলেন কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব কুলপতি শ্রী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও দ্বারভাঙ্গা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বকূলপতি ডঃ রামকরণ শর্মাজী। সম্মানিত অতিথি ছিলেন জগদগুরু রামানন্দাচার্য্য স্বামী শ্রী রামনরেশাচার্য্য মহারাজ। কন্যাপীঠের কন্যাদের শঙ্খধ্বনি ও বেদপাঠের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের চিত্রে অভ্যাগতেরা মাল্যার্ণণ করেন। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশনে ছিলেন ডঃ কুমারী প্রণতি ঘোষাল। উদ্ঘাটন ভাষণ দেন ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের চরণে শ্রদ্ধার্থ্য্য নিবেদনে ছিলেন ডঃ রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, ডঃ সুধাংশুশেখর শাস্ত্রী, ডঃ রেবতী রমণ পাণ্ডে, শ্রীমতী বেটিনা বমার, পণ্ডিত শ্রবর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, ডঃ মনুদেব ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডঃ কমলেশ বা, ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী প্রভৃতি। ধন্যবাদজ্ঞাপনে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী জগদীশ্বর পাল। সমাপ্তি সংগীতের সঙ্গে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর হতে ২৩ শে সেপ্টেম্বর আশ্রমে শ্রীমদ্ ভাগবত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিদ্যা, ধর্ম বিজ্ঞান সংকলন ধর্মগম বিভাগাধ্যক্ষ ডঃ কমলেশ বা সুললিত ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন।

শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদের তিরোধান তিথিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর গুরুপ্রিয়াদিদের ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়। ভাদ্র শুক্লা নবমী তিথি ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ ধ্যান হয়।

পুণা

সাঁজানো গুছানো স্বচ্ছ সুন্দর জলবায়ুর জন্য বিশেষ বিখ্যাত পুণা শহরে অবস্থিত মায়ের আশ্রমটি এবার গ্রীষ্মকালে কন্যাপীঠের ছোট-ছোট কন্যাদের সানন্দ ক্রীড়াকৌতুকে, নানাবিধ আলাপনে, ভজনকীর্তন - গানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এবারের গ্রীষ্মাবকাশে কন্যাপীঠের প্রায় ৩৩জন কন্যারা কাশী হতে ৪ঠা জুন পুণা আশ্রমে এসে পৌঁছায়। কন্যাদের অবস্থানকালে পুণা আশ্রমের শোভা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়েছিল। আশ্রমে নবনির্মিত শিবমন্দিরে মেয়েদের প্রতিদিন প্রাতে শিবপূজা, আরতি, স্তোত্রপাঠ ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে বেদপাঠ শ্রবণ করে মাতৃভক্তরা মুগ্ধ হয়েছেন। সংসঙ্গে প্রচুর ভক্ত সমাগম হত।

গত ২৮শে জুলাই পুণা আশ্রমে মোরভির রাজপরিবারের সৌজন্যে “গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব” সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রাতে শ্রী গুরুপূজা, ভজন কীর্তন ও অপরাহ্নে প্রসাদবিতরণ করা হয়।

দিল্লী

দিল্লীতে কালকাজীস্থিত অপূর্বনয়নাভিরাম মায়ের আশ্রমে ২৮ শে জুলাই গুরুপূর্ণিমার পুণা পর্বে প্রাতে গুরুপূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ভক্তিমূলক সংগীত প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। ভোগারতির পর মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লী আশ্রমে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে মাতৃচালিশা ও প্রতিমাসের শেষ শনিবারে হনুমান চালিশা আয়োজিত হয়।

রাজগীর

ভগবান বুদ্ধের অতিপ্রিয় নগর, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে বহুচর্চিত, কলা ও কৃষ্টিতে সুসমৃদ্ধ নগর রাজগীরে মায়ের আশ্রমে গুরুপূর্ণিমার মহনীয় মহোৎসব সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয়।

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে বিগত দিনে শ্রী শ্রী মায়ের শুভ জন্মশতাব্দীবর্ষ হতে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে আশ্রমে রাজগীরবাসী জনতার কল্যাণের জন্য “নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য সেবা” প্রকল্প সঞ্চালিত হয়ে আসছে। নালন্দা মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ শ্রীমতী কৃষ্ণা সিন্হা নিঃশুল্ক সেবা অর্পণ করে আসছেন। আশ্রমের এই চিকিৎসা সেবায় বহু রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। ওষুধ ইত্যাদি কিছু দানে উপলব্ধ হয় এবং অবশিষ্ট আশ্রমের পক্ষ হতে ক্রয় করা হয়। এই সেবাকাজে বছরে প্রায় ১১ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

রাঁচী

রাঁচীতে সুপ্রাচীন তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পীঠস্থানে শক্তি আরাধনার সুবিদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অবস্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে মা কালীর অধিষ্ঠানে গুরুপূর্ণিমার পুণ্যময় লক্ষ্যে বৈশাখপাঁচারে শ্রী গুরু পূজা হয়।

গত ১২ই আগস্ট হতে ১৯শে আগস্ট রাঁচী আশ্রমে শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা-জ্ঞানযজ্ঞ আয়োজিত হয়। ভাগবত সাধক শ্রীমৎ নবরত ব্রহ্মচারীজী সুললিত কণ্ঠে ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত সম্মিলিত হন।

আগামী ১৫ই অক্টোবর হতে ২০শে অক্টোবর রাঁচী আশ্রমে প্রতি বছরের মত শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। ২৪শে অক্টোবর শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা ও ৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ শ্রী শ্রী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

বৃন্দাবন

রসশেখর রসরাজ রাজেশ্বরের প্রিয়ধাম বৃন্দাবনে মায়ের আশ্রমে গত ১৪ই আগস্ট হতে ২৬শে আগস্ট শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ ছলিয়াজীর বুলনোৎসব এবং ২রা সেপ্টেম্বর শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জন্মষ্টমী মহোৎসব আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষে আশ্রমে ১৪ই আগস্ট হতে ২৬শে আগস্ট রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে আগস্ট হতে ২৬শে আগস্ট শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের বুলনপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে আগস্ট ভাইজীর তিরোধান তিথি পূজা, ২৫শে ও ২৬শে আগস্ট অধিবাস সহ নাম যজ্ঞ কীর্তন, ২৬শে আগস্ট প্রাতে বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ, ভজন, কীর্তন, শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের ও শ্রী শ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে আগস্ট সাধুসেবা। ২রা সেপ্টেম্বর শ্রী শ্রী জন্মষ্টমীর পূজা ও ১৮ই সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমোড়া

প্রকৃতিদেবীর অপূর্ব আভরণে মণ্ডিত আলমোড়াতে মায়ের আশ্রমে গত ২৩শে আগস্ট বুলন দ্বাদশীর দিন শ্রদ্ধেয় ভাইজীর পুণ্যতিথি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ২২শে আগস্ট ভাইজীর সমাধিতে রুদ্রাভিষেক, কুষ্ঠ রোগীদের সেবা এবং বিকালে ভাইজী ও মাতৃ প্রসঙ্গ চর্চা; পরদিন ২৩শে আগস্ট শিবার্চনা, মাতৃপূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত ভাবে সুন্দরকাণ্ড পাঠ ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আলমোড়ার এই অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভারে সুসজ্জিত মায়ের আশ্রমে এসে মাতৃ ভক্তরা স্বর্গীয় আনন্দলাভ করেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহারাজ

দক্ষিণেশ্বরস্থিত বিশেষ-প্রসিদ্ধ সাধনার কেন্দ্রস্থল আদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহারাজ গত ১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ আদ্যাপীঠের আশ্রমে মহাপ্রয়াণ করেন।

পূজণীয় মহারাজ আদর্শ ব্রহ্মচারীর জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন। কর্মঠতা ছিল তাঁর মধ্যে অপরিসীম। এত বিশাল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে করতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে অহংভাব লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হত না। সহজ, সরল, সদাপ্রসন্ন বালকের মত স্বভাব ছিল তাঁর। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একান্ত আপনজনকে হারালাম। একনিষ্ঠ সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর উর্দ্ধলোক গমনে সাধকসমাজের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় একটি যবনিকাপাত ঘটল। এই অপূরণীয় ক্ষতির পূরণ করা কখনো সম্ভব নয়।

শ্রদ্ধেয় মহারাজের শ্রী শ্রী মায়ের চরণে অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ভক্তপরিকরের সঙ্গে তিনি অনেকবার নৈমিষারণ্যে এসে মায়ের আশ্রমে একান্তবাস করেন। নৈমিষারণ্যের শান্ত পবিত্র পরিবেশ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। বারাণসী আশ্রমেও তিনি একাধিকবার এসেছেন।

আজ আমরা তাঁর অবর্তমানে আমাদের একজন বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীকে হারালাম। তাঁর চরণে আমরা সাদরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

শ্রী শ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

বৈদ্যনাথধামের অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সুযোগ্য প্রিয় শিষ্য, অগণিত ভক্ত শিষ্যগণের হৃদয়ে শ্রীগুরুরূপে অধিষ্ঠিত প্রাণপুরুষ শ্রী মোহনানন্দজী মহারাজ প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে গত ২৯শে আগস্ট আমেরিকাতে মহাপ্রয়াণ করেন। শ্রী মহারাজ শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর অন্যতম শিষ্য মায়ের পুরাতন ভক্ত গুরু সন্ন্যাসী শ্রী প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয় ছিলেন। শ্রীশ্রী মা যখন ১৯২৬ সনে বৈদ্যনাথ ধামে শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে প্রথম যান, তখন হতেই কিশোর মোহনানন্দজী মাতৃসান্নিধ্যে আসেন। এরপর মহারাজ যখন আশ্রমের প্রধান হন, তখন তিনি মাকে বছবার সাদর আহ্বান করে দেওঘর আশ্রমে নিয়ে যান। তিনি নিজেও বছবার মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে এসে মায়ের সাথে মিলিত হন। শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর ও অত্যন্ত নিকট।

প্রায় প্রতিবছরই তিনি অল্পপূর্ণা পূজার সময় কাশীতে শিবালস্থিত তাঁর আশ্রমে আসতেন। সেই সময়ে মায়ের আশ্রমেও অনেকবার বাসন্তীপূজার নবমীর দিন এসে দেবী দর্শন করতেন ও ভক্তদের কৃপাপ্রসাদ বিতরণ করে ধন্য করতেন। এবছরও তিনি কাশীতে এসেছিলেন, কিন্তু শরীর বিশেষ সুস্থ না থাকায় মায়ের আশ্রমে আসতে পারেন নি।

তাঁর মহাপ্রয়াণে ভারতের অধ্যাত্মগগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মহনীয় স্থান চিরতরে রিক্ত হল। আমরা তাঁর চরণে ভক্তিন্বচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।



শোক-সংবাদ

১. শ্রী সত্যব্রক্ষচারী

একাদশীর পূণ্যাতিথিতে পূণাতে শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রমে গত ২৪শে জুন, আশ্রমের পুরাতন ব্রক্ষচারী সত্য মরদেহ ত্যাগ করে স্বীয় সাধনোচিত ধামে গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পূণা আশ্রমের মন্দিরের সেবায়ত ছিলেন। তার আগে তিনি দেবাদুন কল্যাণবনের মন্দিরেও ছিলেন। ইদানীং বার্দ্ধক্যবশতঃ কয়েকবছর তিনি অসুস্থ ছিলেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি কাশীতেও মায়ের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তারপর পূণাতে ফিরে আসেন। মাতৃচরণে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

২. শ্রী অজিত কুমার বিশ্বাস

কৃষ্ণনগরবাসী শ্রী শ্রী মায়ের একনিষ্ঠ সেবক মাতৃগতপ্রাণ শ্রী অজিত কুমার বিশ্বাস গত ২৫শে জুন শ্রী শ্রী মায়ের শ্রী পাদপদ্মে লীন হয়েছেন। কনখলের ও কাশী আশ্রমে দিদিমার মূর্তি তাঁরই হাতের তৈরী। দিদিমার মূর্তি তৈরীর সময় শ্রী শ্রী মা স্বয়ং কৃষ্ণনগরে তাঁর গৃহপ্রাপ্তনে গিয়েছিলেন। শ্রী শ্রী মায়ের চরণ ধুলিপূত সেই পবিত্রস্থলে অজিতবাবু একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছিলেন। আমরা আজ মায়ের চরণে প্রয়াত আত্মার শান্তিকামনা করি এবং তাঁর পরিবারজনের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৩. কুমারী সাবিত্রী মিত্র

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের একনিষ্ঠ সেবিকা কুমারী সাবিত্রী মিত্র (ক্ষমাদি) গত ১লা জুলাই স্বীয় হনুমানঘাটস্থিত আবাসে চিরতরে মাতৃকোড়ে শায়িত হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে কন্যাপীঠে সেদিন শোকসভা করা হয়।

শ্রী শ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ডাক্তার, মেজর গিরীন্দ্র কৃষ্ণ মিত্রের কন্যা কুমারী সাবিত্রী কৈশোরেই শ্রী শ্রী মায়ের অনুপম আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বিশেষ দশকে মায়ের চরণে নিজ জীবন অর্পণ করেন। কন্যাপীঠের বর্তমান রূপরেখা রূপায়িত করায় ক্ষমাদির অবদান অবিস্মরণীয়। কন্যাপীঠের ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রথম ২৫ বছরের ক্ষমাদির অনুপম সেবার অমর গাথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে।

যদিও লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁর প্রয়াণে এক মহাজীবনের অন্ত হয়েছে, তবু সেই মহাজীবনের অন্তঃহৃদয়ের দীপশিখায় যারা আলোকিত হয়েছেন, তারা এই মহনীয় আদর্শের জ্যোতিঃপ্রভাকে নিজেদের জীবন পথের আলোকসুপ্ত মনে করে চিরদিন এই মহাজীবনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবে। তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করি।

৪. রাজমাতা কমলেন্দুমতী শাহ

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রথম সভাপতি টিহরী গাড়োয়ালের রাজমাতা কমলেন্দুমতী শাহ গত ১৫ই জুলাই দেবাদুনে স্বীয় আবাসভবনে মায়ের চরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। তাঁর বয়স প্রায় ৯৬ বছরেরও অধিক হয়েছিল।

তিরিশের দশকে বাঘাটনরেশ শ্রী দুর্গাসিংহজী “যোগীভাই”র মাধ্যমে তিনি শ্রী শ্রী মায়ের চরণপ্রাপ্তে এসে উপনীত হন। পারিবারিক সূত্রে তিনি যোগীভাইয়ের ভগিনী ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর স্বামী টিহরী মহারাজ নরেন্দ্রশাহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যোগীভাইয়ের আগেই মাতৃদর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। তাই তিনি শোকদুঃখহরণের অন্যতমস্থান শ্রী শ্রী মায়ের ত্রিতাপহরণ চরণতলে নিয়ে আসেন নিজের সদ্যবিধবা শোকসন্তপ্ত এই ভগিনীকে।

শ্রী শ্রী মায়ের দর্শন করে তিনি পরম সান্ত্বনালাভ করেন, চিরনির্ভরযোগ্য আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মায়ের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মা তাঁকে আদরে নাম দিয়েছিলেন “আনন্দপ্রিয়া”। আনন্দপ্রিয়াজী অতি ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। হাষিকেশ হতে ২০ কি.মি. উপরে গঙ্গার তটে যেখানে টিহরী রাজপরিবারের প্রাচীন মহল ছিল, সেখানে তিনি শ্রী শ্রী মায়ের জন্য একটি ভবন নির্মান করান। গঙ্গার তীরে এই স্থানটি অতি রমণীয় এবং নির্জন। শ্রী শ্রী মায়ের এখানে আগমনের পর এই স্থানের নাম হয় “আনন্দ কাশী”। শ্রী শ্রী মা আনন্দ কাশীতে বহুবার এসেছেন। এখানেই শ্রী শ্রী মা সূক্ষ্ম টিহরী রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের দেখেছিলেন। শ্রী শ্রী মায়ের নির্দেশে এখানে একটি সুরম্য শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা তিনি মায়েরই পবিত্র উপস্থিতিতে করান।

আনন্দপ্রিয়াজী অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। সংগঠনী ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৫০ সনে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ গড়ে ওঠে এবং একটি সুসম্বন্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনরূপে চতুর্দিকে খ্যাতি লাভ করে। তাঁর আর্থিক অনুদানে সর্বপ্রথম রোগরূপী জনজনাদর্শনের সেবার জন্য কাশীতে “আনন্দময়ী করুণা” নামক প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়। কন্যাপীঠের জন্য “মা আনন্দময়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান” এর সূত্রপাতও তিনিই করেন।

রাজমাতা আনন্দপ্রিয়াজীর ব্যক্তিত্ব আদর্শময় ছিল। তিনি যোগাভ্যাসে নিপুণা ছিলেন। শ্রী শ্রী মায়ের নির্দেশে তিনি আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীদেরও যোগাসন শেখান।

তিনি নারী সমাজের আদর্শ ছিলেন। টিহরী গাড়োয়ালে স্থানে স্থানে তাঁর সেবাকাঁজের বিভিন্ন ইতিহাস অমর হয়ে থাকবে। বিশেষতঃ মহিলাদের শিক্ষা এবং বিকাশের জন্য তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন। দেবাদুনে “মহারাজা নরেন্দ্র শাহ ট্রাস্ট” এর স্থাপনাও এই মহৎ কাজেরই একটি নিদর্শন।

আনন্দপ্রিয়াজী শ্রী শ্রী মাকে সর্বপ্রথম একটি নূতন বিলাতী গাড়ী অর্পণ করেন। মায়ের নির্দেশে তিনি নিজেও মায়ের সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছেন ও মায়ের বিভিন্ন আশ্রমের উৎসব আদিতে যোগদান করেছেন। টিহরী রাজমাতা আনন্দপ্রিয়াজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের অন্যান্য বহু রাজপরিবার মায়ের চরণে এসে সমবেত হন।

শ্রী শ্রী মায়ের শ্রেষ্ঠ লীলা পরিকরদের মধ্যে আনন্দপ্রিয়াজী অন্যতম। শুধু অন্যতমই নন, অনন্য রূপে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

৫. ডঃ নীরজনাথ দাশগুপ্ত

অতি পুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী গঙ্গাচরণ দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ নীরজনাথ দাশগুপ্ত (মানিকদা) দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৫ই আগস্ট কলকাতার হাজরা রোডে, তাঁদের নিজস্ব বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ডঃ দাশগুপ্তের সহোদর ডঃ গোপাল দাশগুপ্ত কয়েকবছর পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন। এই পরিবার শ্রী শ্রী মায়ের বিশেষ-কৃপাপ্রাপ্ত। পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় বৃহস্পতিবারের বিশেষ সংসঙ্গ — ‘মৌনমিলনী’র আরম্ভ হয় হাজরা রোডের বাড়ীতে এই পরিবারের সৌজন্যে।

অধ্যাপক নীরজ দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন এবং জীব পদার্থ বিদ্যার গবেষণা ও শিক্ষায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি ডঃ মেঘনাদ সাহার ছাত্র ছিলেন। তিনি অনেক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন। শ্রী শ্রী মায়ের একজন কৃতী সন্তানকে আমরা হারালাম। আমরা শ্রী নীরজনাথের সন্তপ্তা স্ত্রী (গৌরী-দিদি) ও পরিবারের সকলকে আমাদের সমবেদনা জানাই। প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা মাতৃক্রোড়ে চির শান্তিলাভ করুক।



“চব্বিশ ঘণ্টা রয়েছে সাধন ভজনের জন্য। ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই বিশেষ ভাবে থাকা কর্তব্য। মানুষ মাত্রেরই মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা প্রধান রাখা। যতটুকু সংসারের সেবায় সময় দেওয়া হয়, আর বাকী সময় ভগবৎ চিন্তায় রাখা কর্তব্য। জপ, ধ্যান, সদগ্রন্থাদি পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, আত্ম নিবেদন, তাঁর জন্যই তাঁকে চাওয়া ও কাঁদা। সংসঙ্গ অনুকূল হ’লে চেষ্টা করা; না হলে সদভাবের বাঁধ সর্বক্ষণ হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা।”

— শ্রীশ্রীমা

with best compliments from :

"কাজে কল্যাণ লাভ । কাজে কল্যাণ লাভ ।"
 "কাজে কল্যাণ লাভ । কাজে কল্যাণ লাভ ।"
 "কাজে কল্যাণ লাভ । কাজে কল্যাণ লাভ ।"
 "কাজে কল্যাণ লাভ । কাজে কল্যাণ লাভ ।"

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
 সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
 তাহলেই কর্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURERS OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD
 EXPORTERS & IMPORTERS
 15/3, METALI SUBHAS ROAD
 CALCUTTA - 700 001

D.WREN GROUP OF COMPANIES.

Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD.

25, SWALLOW LANE,

CALCUTTA - 700 001

FACTORY: DUMDUM & BARODA

BARODA CITY OFFICE-

D. WREN INTERNATIONAL LIMITED,

ALKAPURI, BARODA - 390007

with best compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কৰ্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কৰ্ম করবে
তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

—শ্রী শ্রী মা

A.R. Dewanjee & Co.

MANUFACTURES OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD
EXPORTERS & IMPORTERS
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA - 700 001

Phone : 220-9739

Off.: 220-4746

Fax : 220-8472

Factory: 477-9239

Resi: 473-3157

শুভ কামনা সহিত :

"যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে নেবে পূর্ণাঙ্গীণ রূপে
চেষ্টা করা দরকার।"

— শ্রী শ্রী মা

দি এশিয়াটিক অস্সিজেন এন্ড অ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড

৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন : ২২০ ৪২৪৭/২২০ ৪২৫৯/২২০ ৪৪৮৭

with best compliments from :

"शुभमति दिये कर्म करे कर्मের ভিতর দিয়েই
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা।"

—শ্রী শ্রী মা

ORISSA AIR PRODUCTS LTD.

Head Office : 8, B.B.D. Bag East

CALCUTTA - 700 001

Regd Office : Gundichapada

Dhenkane : 759 013

Phones : 220-4347/220-4259

"ভবি চাক্ষুশী নৃত্যাত মা"
AT THE LOTUS FEET OF MA

with best compliments from :

Amrita Bastiasaya

157-C Rashbehari Avenue
Ballygunge, Calcutta - 700 029
Phone : 464-2312

i

2nd Floor of Quality Tower,
n and Roodways Gardens
and School Uniform.
WE HAVE NO OTHER BRANCH

Kalipada Dutta

**35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta-700 005**

with best compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

—শ্রী শ্রী মা

SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY

87/5, Block E, New Alipore

Calcutta - 700 053

Phone : 478-3545

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

with best compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C Rashbehari Avenue

Ballygunje, Calcutta - 700 029

Phone : 464-2217

Suppliers of Quality Sarees,
Woollen and Readymade Garments
and School Uniforms.

WE HAVE NO OTHER BRANCH

"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।

আমি তোমার, তুমি আমার।

আমি তোমার, তুমি আমার।

আমি তোমার, তুমি আমার।।"

—শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

- শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত ক্যাসেট "আনন্দ সংগীত" নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ—

- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
- মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

With Best Compliments from

"Try to grasp the significance of 'all is His', and you will immediately feel free from all burdens."

— Ma Anandamayee

p

RISHI GASES (P) LTD

**Head Office : 8, B.B.D. Bag East
CALCUTTA-700 001**

Phones : 220-4247/4259

Factory : Industrial Estate

P.O. Tifra

Bilaspur - 495223 (M.P.)

Phones : 4233, 4675

with best compliments from

Khadim's

Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD. 29A, Rabindra Sarani, Calcutta - 700 073
Phone : 237-8220, 237-0806, 237-5226, 236-4639, 236-6063, 236-2318
Fax : 033-215-3387

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

● Branch Ashrams ●

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110 019 (Tel : 684 0365)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411 007, (Tel : 327 835)
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752 001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803 116, Bihar (Tel : 5362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834 001, Bihar (Tel : 312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731 233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249 193, U.P.
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221 001, U.P.
(Tel : 310054 + 311794)
23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231 307,
(Tel : 05442-64343)
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan. Mathura-281 121, U.P. (Tel : 442024)
- IN BANGLADESH :
1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

**REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97**



